রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

(বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্রের" প্রতিবাদ।)

বঙ্গের সুবিখ্যাত দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীনবকুমার দত্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা;

৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-প্রচার কার্য্যালয়।

১৩১৭।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ক্ষুদ্র কথা।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "কৃষ্ণচরিত্র" নামধেয় যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহা যখন আমি প্রথম পাঠ করি, তখন আমার পঠদ্দশা। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা কতক রূপকে পূর্ণ, কতক অসত্য কাহিনী, এবং রাধা বলিয়া কেহ কখনও ছিলেন না,—রাধা কেহই নহেন, রাধার নাম-গন্ধ কোন শাস্ত্রগ্রন্থে নাই, এই সকল কথা পাঠ করিয়া মনে একরূপ বিপন্নতা আশ্রয় করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল,—হিন্দু কি তবে এতদিন এসকল তত্ত্ব অনবগত ছিলেন,—এতদিন কি তবে হিন্দু অশাস্ত্রীয় এক উপন্যাস-কাহিনী-সম্ভূতা দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন,—এতদিন কি তবে কৃষ্ণচরিত্রের এক ঘোর কালিমা আদর্শ করিয়া আপন আপন চরিত্র দূষিত করিয়া আসিতেছেন? তখন হইতে মনে এই বিষয়ের একটা অনুসন্দিৎসাবৃত্তি জাগিয়া পড়ে, এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "আর্য্য-প্রতিভা" নামক সংবাদপত্রে ঐ সম্বন্ধে তখনকার সাধ্যমত কিছু লিখি ও সাধারণকে বঙ্কিমবাবুর মতামত সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাও করি।

তারপর এই দীর্ঘ দিবস অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় নাই। সেই অনুসন্ধানের ফলে আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—ভগবানের কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য এক মধুর ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং জৈবী গতির অধঃস্রোত নিবারণ করিয়া ঊর্দ্ধস্রোত প্রদান করা। ত্রিতাপতপ্ত জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রদান করা। সেই উদ্দেশ্য সাধন-পথে রাধা তাঁহার চির সহচারিণী,—রাধা ভিন্ন কৃষ্ণের সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—‘রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।’

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, রাধা নাম কোন শাস্ত্রগ্রন্থে নাই। আমি কিন্তু দেখিতে পাইয়াছি, হিন্দুর তন্ত্রে মন্ত্রে পুরাণে ইতিহাসে রাধা নাম চিরাঙ্কিত। হিন্দু, মন্দিরে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্যায় করেন নাই,—উহা অশাস্ত্রীয় নহে, শাস্ত্রীয়। তাহা এই গ্রন্থে দেখাইয়াছি, এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলার যে মহান্ উদ্দেশ্য আছে, তাহারও বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

কিন্তু একথা স্বীকার্য্য যে, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা মাদৃশ ভক্তিহীন মানবের সাধ্যাতীত। হয় ত কোন সুধী ব্যক্তি এ গ্রন্থ পাঠে অনেক বিষয়ের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্টি করিবেন। তবে ভরসা এই যে, এই গ্রন্থ পাঠ নিষ্ফল হইবে না। এই গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে বহুবার কৃষ্ণনাম করিতে হইবে। হেলায় বা শ্রদ্ধায় একবার কৃষ্ণনাম করিলে অতি পাপীও তরিয়া যায়,—

> ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম,
> মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্।
> সকলনিগমবল্লী চিন্ময়ং সৎস্বরূপং,
> সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা॥

অতএব ভরসা করিতে পারি, এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে কৃষ্ণনাম থাকায় পাঠ নিতান্ত ব্যর্থশ্রম হইবে না।

অনন্তপুর
দোলপূর্ণিমা;
১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১১৯৮

সূচী-পত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্দেশ্য।

শিষ্য। আপনি ইতঃপূর্ব্বে অনেক স্থলে * বলিয়াছেন, রাধা-কৃষ্ণ ভাব ও প্রাণ,—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণেশ্বর ও শ্রীমতী রাধিকা মূলা প্রকৃতি। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমার কিছু জানিবার আছে।

গুরু। কি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল?

শিষ্য। আমি রাধা-কৃষ্ণ-সম্বন্ধে আপনার নিকটে ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপতঃ যাহা শুনিয়াছি এবং দুই একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধাকে মূলা প্রকৃতি বলিয়াই ধারণা করিতে পারিয়াছি এবং এ হৃদয়ের যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য—সেই যুগলরূপ ধ্যানই শ্রেয়ঃ করিয়াছি। কিন্তু আজি আমার যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের উত্থাপন করা, তাহা স্বতন্ত্র।

---

* মৎপ্রণীত রসতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনা গ্রন্থ দেখ।

গুরু। সে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য কি ?

শিষ্য। রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও প্রগাঢ় আলোচনা করা। যাহা বিশ্বাস করি, যাহা ধারণা করি, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান দৃঢ় হইতে দৃঢ়-তর করিতে চাহি। জানি না, যদি কোন অশুভ মুহূর্ত্তে কোন তার্কিকের তর্ক আমার জ্ঞানকে, আমার বিশ্বাসকে বিচলিত করিয়া দিতে পারে। তাই ইচ্ছা করিয়াছি, রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-বাদের যে সকল খুঁটিনাটি আমি অপরাপর লোকের নিকটে শ্রুত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। আপনি গুরু—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা আমার চক্ষুরুন্মীলন করুন—আমি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বিমল শোভা দর্শন করি।

গুরু। রাধাকৃষ্ণকে জানিতে হইলে সর্ব্ব প্রকারে তাঁহাদেরই শরণাগত হইতে হয়। তত্ত্বোপদেশে সে তত্ত্ব হৃদগত হয় না। কৃপা-ময়ের কৃপা ভিন্ন সে পরমপদ প্রদর্শিত হইবার নহে। চিনি না খাইলে চিনির আস্বাদ বুঝিবার উপায় নাই। কেবল তর্ক দ্বারা রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইবার নহে।

শিষ্য। তিনটি প্রধান বিষয় অবগত হইবার জন্য অদ্য ভবৎ-সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটি মত আমাদের সমাজমধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

১। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট কৃষ্ণ ঈশ্বর বলিয়া পূজিত—কিন্তু রাধা কেহই নহেন। রাধা বলিয়া কেহ ছিলেন, এমন কোনও শাস্ত্রে নাই, ইহা তাঁহাদের ধারণা।

২। আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বৈদিক ও তান্ত্রিক—তাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই স্বীকার করেন না। নিরাকার ব্রহ্ম-বাদিগণও সাকার কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেন না।

৩। অপর সম্প্রদায় বৈষ্ণব নামে পরিচিত। তাঁহারা বলেন,—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। আর রাধা তাঁহার প্রকৃতি। জীবন-হীন দেহ, আর রাধাহীন কৃষ্ণ, সমান কথা।

আমি আপনার নিকটে রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইতে বাসনা করি। যদিও আপনার নিকটে অবগত হইয়াছি যে, রাধা-কৃষ্ণ প্রকৃতি-পুরুষ, এবং তাহাই ধারণা করিয়াছি—তথাপি এ সম্বন্ধে সবিশেষ কোন আলোচনা করা হয় নাই। অতএব আপনার নিকটে আমি রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ববিষয় উত্তমরূপে অবগত হইব। তাহাতে বিরুদ্ধবাদের অনেক কথা—নাস্তিক্যবাদের অনেক কথা, আমাকে পাড়িতে হইবে, কৃপা-প্রকাশে ক্ষমা করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রয়োজন।

গুরু। রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তুমি যে প্রথম মতের কথা বলিলে, সে মতের প্রচার কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, বলিতে পারি না। কিন্তু এ মত অভ্রান্ত নহে।

শিষ্য। আমাদের দেশের সাহিত্য-সিংহ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে "কৃষ্ণচরিত্র" নামধেয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ-প্রচারের দ্বারা তিনি কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া শিক্ষিত সমাজে পরিচিত করেন, কিন্তু রাধাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস

যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ইহা তাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণ-যাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণ-গীতি, সকল মুখে কৃষ্ণ নাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলী, কাহারও গায়ে কৃষ্ণ-নামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখা পড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধে কৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে কৃষ্ণ!" বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি, বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধে কৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বব্যাপক।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ব্ব সময়ে কৃষ্ণারাধনা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতি-সাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইহাঁরা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন--ইনি বাল্যে চোর, ননী-মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত-বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্ব প্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি—অপুণ্য দূর হয়, মানুষদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্র-সঙ্গত?

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতন ধর্ম্মদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ-ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জন-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। এবং উপন্যাস-কারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি, ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপ-সংস্পর্শ-শূন্য, আদর্শ-চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও নাই, কোন দেশীয় কাব্যেও নাই।" *

গুরু। বঙ্কিমচন্দ্র একজন প্রতিভাশালী ও সাহিত্যগুরু সন্দেহ নাই। মানবচরিত্র-বিশ্লেষণে ও অঙ্কণে তাঁহার কৃতিত্ব অসীম। তাই তিনি ভগবানকে আদর্শ মানবরূপে চিত্রিত করিতে যতদূর সম্ভব কৃতিত্ব দেখাইতে হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। আমিও কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিয়াছি,—বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন, কৃষ্ণ ঈশ্বর; কেন না, তিনি আদর্শ মানব। যথা—

১। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

* শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ১—৩ পৃঃ।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেই (ধর্ম্মতত্ত্বে) যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি—

শিষ্য। জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে,—অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।

* * * *

এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্যত্ব দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।

পুনশ্চ—

"অনন্ত-প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা,—অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খৃষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ, কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই,—কোন

জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপরে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ : খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন কৌপীন-ধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইহাঁরা তা নয়। ইহাঁরা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইহাঁদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইহাঁরা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন ; কার্ম্মুক হস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত ; শক্তিমান হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম-লক্ষণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখনও মনুষ্য-ভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই।" *

এই বর্ণনায় কি বুঝিতে পারা গেল ? বুঝিতে পারা গেল,—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ মানব। অলৌকিক ক্ষমতা তাঁহার কিছুই নাই—মানবের পূর্ণতাই তাঁহাতে বিদ্যমান। কাজেই বঙ্কিমবাবু যাহা অলৌকিক, যাহা ঐশ্বরিক, যাহা মানবাতীত, যাহা মানবের জ্ঞানের বাহিরে, যাহা সর্ব্ব বিষয়ে শাস্ত্রাতীত, যাহা নূতন ও মধুর তাহা কৃষ্ণে আরোপিত করিতে পারেন নাই। যাহা শাস্ত্রপাঠে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, নয় উপন্যাসকারকৃত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা যাহা বুঝিতে পারি না, ধারণা করিতে পারি না—যাহা আমাদের মানবীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত, যাহা যোগীর যোগলব্ধ জ্ঞানের গোচরীভূত, তাহাই আমরা উপন্যাসকারের উপন্যাস বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কেবল মানবচরিত্র লইয়া বিচার

* কৃষ্ণচরিত্র ৪—৫ পৃঃ।

করিতে হইলে, কৃষ্ণ হইতে আর একজনকে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

শিষ্য। তিনি কে?

গুরু। ভীষ্ম। ভীষ্মের অনন্ত শক্তি—অতুল্য প্রতাপ, তথাপি ভীষ্ম সংযমী। ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে ত্রিজগৎ জয় করিতে পারেন, তথাপি ভীষ্ম পরের আশ্রয়ে আশ্রিত। ভীষ্ম বীরপণা দেখাইয়া সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়মধ্য হইতে পরম রূপবতী রমণী হরণ করিয়া আনিলেন—তাহা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, কিন্তু নিজে ইন্দ্রিয়জয়ী,—বিবাহে প্রয়োজন নাই, অপরকে সেই কামিনী বিলাইয়া দিলেন। ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু; পরের জন্য—ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য—ইচ্ছা করিয়া মরণে বরণ করিলেন। ভীষ্ম-চরিত্রের মত পরিপূর্ণ চরিত্র কোথায় আছে? যদি কেবল মানবচরিত্র লইয়াই ঈশ্বর নির্ণয় করা হইত, তবে ভীষ্মও অবতার বা পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইতেন।

হিন্দুশাস্ত্রের কোন গ্রন্থেই ভীষ্মকে অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। আবার যাঁহারা অবতার—যাঁহারা ঈশ্বরাংশ বা ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত, তাঁহাদের মধ্যে মানুষিক চরিত্রের স্ফুরণ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ ও কল্কি—হিন্দুশাস্ত্রমতে এই দশ অবতার। ইহার মধ্যে দুই একটি অবতারচরিত্র বাদ দিয়া, মীন, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতারগণের চরিত্রালোচনা করিলে মানবচরিত্রের স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য কোথায় মিলিবে?

অতএব ঈশ্বর-চরিত্রে মানবচরিত্রাতীত কিছু থাকাও আবশ্যক।

অন্যান্য অবতারে যাহা আছে, কৃষ্ণ-অবতারে তাহা আছে, তদ্ভিন্ন

কৃষ্ণ-অবতারে যাহা আছে, তাহা অন্ত অবতারে নাই। তাই কৃষ্ণ পূর্ণাবতার। যাহা জীবে আছে, তাহা কৃষ্ণে আছে, জীবে যাহার অনুভূতি আছে, তাহাও কৃষ্ণে আছে ; দেবতায় যাহা আছে. তাহা কৃষ্ণে আছে, দেবতায় যাহার অনুভূতি আছে, তাহাও কৃষ্ণে আছে ; যক্ষ রক্ষ ভূচর খেচর সকলের যাহা আছে. সকলে যাহার অনুভূতি আছে, তৎসমস্তই কৃষ্ণে আছে, তাই কৃষ্ণ পূর্ণ। জড় আছে, চৈতন্য আছে—প্রকৃতি-পুরুষের সাম্য-বৈষম্য আছে, তাই কৃষ্ণ পূর্ণ। কেবল মানবচরিত্রের উৎকর্ষ জন্য কৃষ্ণ পূর্ণ নহেন।

ঈশ্বরের মোটামুটি তিন অবস্থা ও দুই ভাব আছে। নিত্য, লীলা ও স্থূল. ইহাই তিন অবস্থা। রস ও ঐশ্বর্য্য, এই দুই ভাব। নিত্য অবস্থা মানবজ্ঞানের অতীত—তাহা ভাবের রাজ্য। লীলা অবস্থা সাধন-জ্ঞান-জ্ঞেয় ; ঋষিগণ সাধনবলে তাহা অবগত হইয়া শাস্ত্র-গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আর স্থূল এই বিশ্বচরাচর। স্থূলেই মানবাদি। আমরা স্থূল—স্থূলজ্ঞানে তাঁহার মানবচরিত্র বুঝিতে পারি, সাধন-বল থাকিলে লীলাও বুঝিতে পারি। সাধনজ্ঞানহীন স্থূলবুদ্ধি মানব আমরা—আমরা তাঁহার চরিত্র চিন্তা করিতে গেলে, স্থূল বিকাশ—অর্থাৎ মানবচরিত্রই বুঝিতে পারিব, অন্য অবস্থা বুঝিতে পারিব কেন ?

দ্বিতীয়, দুই ভাব—রস আর ঐশ্বর্য্য। সাধনা ব্যতীত রস বুঝিতে পারা যায় না, ঐশ্বর্য্য বুঝিতে পারা যায়। ঐশ্বর্য্য আমাদের চারিদিকে —রসে কেবল অনুভূতি আছে।

অতএব বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিয়া কৃষ্ণকে যে ভাবে দাঁড় করাইয়াছেন. তাহাতে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত সাধন-জ্ঞান-হীন বালকগণের নিকট আদর্শ পুরুষ বা ঈশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু সাধন-পথের পথিক বিষয়-বিতৃষ্ণ বৈরাগীর,—জ্ঞানযোগাবলম্বী কঠোর

তপস্বীর, ভক্তিযোগের সাধকের,—এক কথায় জন্মজন্মান্তরের কাম-কামনা-বিদগ্ধকণ্ঠ মানবের হৃদয়-সুশীতলকারী মদনমোহন বংশীবদন রসরাসবিহারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নহেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিদূরিত করিয়া, তাঁহার মানুষী মূর্ত্তি মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবল মানব নহেন, তিনি পূর্ণ ঈশ্বর।

অতএব তাঁহাকে জানিতে হইলে কেবল মানবচরিত্র আলোচনা করিলে চলিবে না। ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, জড়াজড়-স্থূলতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেন নাই। আরও গম্ভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তিনি আত্মমত প্রচারার্থ অনেকস্থলে শাস্ত্র-গ্রন্থের পাঠান্তর সংযোজনা করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। অনেক স্থলে প্রয়োজন-বোধে শাস্ত্রভাগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মূলে ভুল।

শিষ্য। আমি আপনার নিকটে সেই সমস্ত বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু যে ভুল আলোচনা করিয়াছেন, ইহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি এখন স্বর্গবাসী। আমি সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছুক নহি। তবে

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার যাহা জানিবার থাকে, বল—আমি যথা-সাধ্য উত্তর দিতেছি।

শিষ্য। তাহাই হউক। তবে বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিয়া আমার যে জ্ঞান হইয়াছে, তাহা খণ্ডনার্থ মধ্যে মধ্যে সে গ্রন্থের কথা আমাকে পাড়িতেই হইবে; অতএব অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আপনি একটু পূর্ব্বে বলিলেন,—মীন, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার মানবচরিত্রের আদর্শ কিছুই নাই, তথাপি তাঁহারা অবতার। কিন্তু বঙ্কিমবাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন—"মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাসমূলক। সেই উপ-ন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্ত্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" *

গুরু। এ সকল কথা গায়ের জোরে বলা। যে পুরাণে কৃষ্ণ-কথা আছে, সেই পুরাণে মীন, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের কথাও আছে। একটা উপন্যাস—অন্যটা আসল, আবার প্রয়োজন-মতে যেটুকুর আবশ্যক, সেইটুকু আসল—অন্যটুকু বাদ! ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। বঙ্কিমবাবু নিজেই একথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

১। "যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব।

* কৃষ্ণচরিত্র—১৭ পৃঃ।

২। যাহা অতিপ্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব।

৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয় বা অতি প্রকৃত নয়. তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার লক্ষণ দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।"

ইহাই কি বিচারের কথা? অত কথা না বলিয়া মোটের উপরে বলিলেই হইত, আমি কৃষ্ণকে আমার মনের মত করিয়া খাড়া করিতে চাহি, শাস্ত্রে যাহা আছে—তাহা মানিব না—সে সকল ব্রাহ্মণদের রচিত স্বার্থ-গাথা বলিয়া ছাড়িয়া দিব—কেহ আমাকে কিছু বলিতে পারিবে না। অথচ আমার গঠিত কৃষ্ণকে তোমরা পূজা করিও।

ফলকথা, বঙ্কিমবাবু এরূপ না বলিলেও কার্য্যতঃ তাহাই করিয়াছেন। শাস্ত্র-বাক্য যে দুই একটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাতেও নিজের মনোমত শব্দ সংযোজনা প্রভৃতি করিয়া লইয়াছেন। আসল কথা, বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণ-অবতারের সম্যক্ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই—কিন্তু তাঁহার প্রতিভাময়ী বুদ্ধিতে কৃষ্ণানুরাগের একটা জ্যোতি আসিয়া পড়িয়াছিল। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের অনুভূতি হইয়াছিল। মানবীয় বুদ্ধিবলে কৃষ্ণকে বুঝিতে গিয়াছিলেন,—তাই কৃষ্ণকে মানুষ গড়াইয়া রাখিয়াছেন। এবং সেই মানবচরিত্র গঠন করিতে গিয়া শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন।

এই জন্যই তাঁহার মূলে ভুল হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণের অবতার-গ্রহণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত বিষয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

অবতারবাদের অনেক হেতু দর্শাইয়া অবশেষে বলিয়াছেন, আসল কথাটা ভগবদ্গীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। "ধর্ম্মসংরক্ষণ" কি কেবল দুই একটা দুরাত্মা বধ করিলেই হয়? ধর্ম্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে? আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনুশীলনসাপেক্ষ এবং অনুশীলন কর্ম্মসাপেক্ষ। অতএব কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্ম পালন (duty) বলা যায়। *

তাঁহার ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ম্মগীতোক্ত কর্ম্মযোগ। কাজেই তাঁহার গঠিত আদর্শ কৃষ্ণ সম্পূর্ণ মানব। তাই তিনি শাস্ত্রবাক্যের অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" এই পদের স্থলে "ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায়" নিজে রচাইয়া বসাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক যদি যাহা প্রকৃত শাস্ত্র-বাক্য, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন—যদি "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" এই শাস্ত্র-বাক্য ঠিক রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মনোমত অনুশীলন ধর্ম্ম ও মানবকৃষ্ণকে গঠন করিতে পারিতেন না।

শিষ্য। 'ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায়' এই পদ ঠিক, কি 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' এই পদ ঠিক, তাহা নির্ব্বাচনের উপায় কি?

গুরু। উপায় শাস্ত্রদর্শন। বঙ্কিমবাবুর পুস্তক ভিন্ন আর কোন গ্রন্থে 'ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায়' পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমবাবু অনেকস্থলে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত ও অনুবাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রামাণ্যতা ও নির্ভুলতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে সিংহমহাশয়ের অনুবাদই উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সে সংস্করণেও 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' এই পাঠ আছে, এবং যে কোন পণ্ডিতের প্রচারিত সংস্করণ দেখিবে, তাহাতেই "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" এই পাঠ দেখিতে পাইবে।

শিষ্য। এমনও হইতে পারে, বঙ্কিমবাবু কোন একখানি প্রাচীন

* কৃষ্ণচরিত্র—১৩ পৃঃ।

হস্তলিখিত আসল গীতা পাইয়া থাকিবেন, যাহাতে 'ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায়' এই পাঠ আছে; এবং আমার স্মরণ হইতেছে, তিনি একস্থলে লিখিয়াছিলেন,—"সংস্কৃতানভিজ্ঞের পুস্তকেই 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, তাহা ভুল। ধর্ম্ম নূতন করিয়া আবার স্থাপন কি হইবে? ধর্ম্ম অনাদি এবং চিরকালই আছে। অতএব 'ধর্ম্ম সংরক্ষণ' এই কথাই ঠিক।" *

গুরু। ধর্ম্মসংস্থাপন কি সে কথা তোমাকে পরে বুঝাইতেছি। আগে কোন্ পাঠটা প্রকৃত, তাহা বলি শোন।

তুমি বলিতেছ, বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন—সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের প্রকাশিত গীতাতেই 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' পাঠ আছে। ইহা সত্য নহে। এযাবৎকাল যতগুলি গীতা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়' পাঠ আছে। বঙ্কিমবাবুর মতে তাহার মধ্যে এক জনও কি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি নাই? তা না থাকুক। আর এক উপায়ে কোন্ পাঠ প্রকৃত, তাহা স্থির করা যাইতে পারে। গীতার প্রাচীন টীকাকারগণ কোন্ পাঠের টীকা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই আসলের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বোধ করি, ঐ উপায়ের উপর আর কোন তর্ক খাটিতে পারিবে না।

গীতার শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা প্রামাণ্য, প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বত্র পরিচিত। দেখা যাউক, ঐ ভাষ্যে ও টীকায় কোন্ পাঠের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্য।—ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্যক্ স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি যুগে যুগে প্রতিযুগম্॥

* প্রচার, ১ম বর্ষ।

স্বামিকৃত টীকা ।—এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ ।

মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকা ।—ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ধর্ম্মস্য সম্যগধর্ম্মনিবারণেন স্থাপনং বেদমার্গপরিরক্ষণং ধর্ম্মস্থাপনম্ ।

আবারও কি বলিতে হইবে যে, বঙ্কিমবাবুর 'ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায়' পাঠ তাঁহার নিজের কথা নহে ? আরও বলিতে হয় যে, এই পাঠের রচনা করিয়া এবং 'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়' এই পাঠ পরিত্যাগ করিয়া তিনি মূলে ভুল করিয়াছেন,—কৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া মনগড়া কথার প্রচার করিয়াছেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

দর্শন-শাস্ত্র ।

গুরু । পুরাণ ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থবিরচিত গল্প-গাথা বলিয়া বাদ দেওয়া যাইতে পারে, মহাভারত-ভাগবতে প্রক্ষিপ্ত আছে বলিয়া, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া প্রয়োজনাংশ সংগ্রহ করিয়া বিরুদ্ধ-মতাংশ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে--কিন্তু এ সমুদয় করিবার পূর্ব্বে দর্শনশাস্ত্র মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য । কেন না, হিন্দুর পুরাণাদি দর্শনশাস্ত্রেরই স্থূলাংশ । যাহাদের বুদ্ধিতে দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না, গল্পে, উদাহরণে তাহাদেরই জন্য পুরাণাখ্যানের সৃষ্টি । অতএব

দর্শন পাঠ না করিলে, পুরাণাখ্যান আরব্য উপন্যাসের গল্প বলিয়াই জ্ঞান হয়। আর এক কথা; হিন্দুর শাস্ত্রোপদেশ অধিকারী ভেদে—সেই জন্য কিঞ্চিৎ আবৃত। কেন না, যাহারা অধিকারী, তাহারাই মর্ম্মগ্রহণে সক্ষম হইবে। অনধিকারী কেবল অর্থ বুঝিয়া কি করিবে—আসল বিষয় বুঝিতে পারিবে না; ইহাই তাঁহাদিগের ধারণা।

শিষ্য। আমি দুই একখানি দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু সবিশেষ কোন ধারণা করিয়া উঠিতে পারি নাই।

গুরু। কেবল দুই একখানি দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করিলেই দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥

গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, ব্যাস ও জৈমিনি এই ছয়জন ঋষির ছয়খানি মূল দর্শন-শাস্ত্র। গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাঙ্খ্য, পতঞ্জলির যোগ, ব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এবং জৈমিনির কর্ম্মমীমাংসা—এই ছয়জন ঋষির ছয়খানি দর্শন-শাস্ত্র। এই ষড়্‌দর্শনই বিখ্যাত—এমন কি, যাহারা দর্শনশাস্ত্র কখনও পাঠ করে নাই, বা পাঠ করিবার শক্তিও যাহাদের নাই, তাহারাও এই ষড়্‌দর্শনের নাম অবগত আছে।

মানুষের জ্ঞান দুই প্রকার। এক আজানিক, অপর সম্পাদ্য। আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি যাহার বিষয়, সেই জ্ঞান মানুষ অভ্যাস না করিলেও জন্মিয়া থাকে। এই জন্য তাহাকে আজানিক বা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আর শিক্ষা দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহাকেই সম্পাদ্য জ্ঞান বলে।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সম্পাদ্য জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক জ্ঞান, অপর বিজ্ঞান।

মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানকে জ্ঞান, এবং শিল্প বা শিল্পশিক্ষোপযোগী বস্তু ও বস্তুশক্তি যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাকে বিজ্ঞান বলা যায়।

শাস্ত্রমতে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই মুখ্য, অবশিষ্ট গৌণ। আত্মা কি, ঈশ্বর কি, জগৎ কি—এই মোক্ষোপযোগী প্রশ্নত্রয়ের তত্ত্ব যে জ্ঞানের বিষয়, তাহা জ্ঞান এবং তন্নির্ণায়ক শাস্ত্র জ্ঞান-শাস্ত্র। অপর যাহা গৌণ-শাস্ত্র, তাহা শিল্প বা শিল্পোপযোগী বস্তু ও বস্তু-শক্তি-নির্ণায়ক।

দর্শনশাস্ত্র জ্ঞান-শাস্ত্রের অন্তর্গত। কেন না, জ্ঞানার্থক দৃশ্‌ ধাতু-নিষ্পন্ন "দর্শন" শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ জ্ঞানের কারণ বা দ্বার। অতএব জ্ঞান-শাস্ত্র বলিলে যাহা বুঝিতে পারা যায়, দর্শনশাস্ত্র বলিলেও তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বে যে ষড়্‌দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মাত্র ছয়খানি গ্রন্থে সীমাবদ্ধ নহে। ঐ ছয়খানি মূল—এবং উহাদের রচয়িতাগণের শিষ্যোপশিষ্যগণ-বিরচিত বহু দর্শন বিদ্যমান আছে। তাহাও উক্ত নামধেয়-শাস্ত্রান্তর্গত। আবার যতগুলি বা যতপ্রকারের দর্শনশাস্ত্র আছে, তত্তাবতের মত একপ্রকার না হইলেও তৎপ্রতিপাদ্য "মুক্তি" অংশে কাহারও বিবাদ নাই। কেবল মুক্তির স্বরূপ ও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া যাহা কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য।

অতএব আত্মা কি, ঈশ্বর কি, জগৎ কি—ইহা জানাই ধর্ম্মালোচনা, এবং মুক্তি তাহার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন-সাধনজন্য আমাদিগকে দর্শনশাস্ত্রগুলি মনোযোগসহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য। আত্মা না জানিতে পারিলে, আত্মার সুখের উপায় ধর্ম্ম কি, তাহা জানিতে পারা যাইবে

না। ঈশ্বর কি, তাহা জানিতে না পারিলে, ঈশ্বরের অবতার ও ঈশ্বরের কর্ত্তব্যতা বুঝা যাইবে না। জগৎ কি, তা না বুঝিলে, ঈশ্বরের জগতে আবির্ভাবহেতু ও জগতের সহিত ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ, তাহাও জানা যাইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাঙ্খ্যদর্শন।

গুরু। এই ষড়্দর্শনের মধ্যে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রতাপ এতদ্দেশে অধিক। সাঙ্খ্যদর্শন হইতেই দ্বৈতবাদের সৃষ্টি। কেবল ভারতবর্ষে নহে—দ্বৈতবাদ সর্ব্বদেশে। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ মানবে ধারণা করিতে পারে না, অথবা ব্রহ্মের বিবর্ত্তবাদে জগৎ সৃষ্ট, কাজেই দ্বৈত। সাঙ্খ্যে এই দ্বৈতবাদ প্রচারিত।

শিষ্য। সাঙ্খ্যদর্শন নাকি ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করেন না? সাখ্য-দর্শন-প্রণেতা কপিল নাকি ঈশ্বর-নাস্তিক? *

গুরু। একথা ভ্রমাত্মক, তাহা তোমাকে পরে বলিতেছি; কিন্তু তাহা বলিবার আগে আমাদিগকে সাঙ্খ্য-শাস্ত্র-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে হইবে।

চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন চতুর্ব্ব্যূহ, সাংখ্য-শাস্ত্রও তদ্রূপ চারিটি ব্যূহে ব্যবস্থিত। ব্যূহ অর্থে সমূহ। চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন রোগ, রোগের কারণ, রোগের আরোগ্য ও ভৈষজ্য এই চারিভাগে বিভক্ত,—

---

* দ্বিতীয়, প্রধান দর্শনশাস্ত্র সাংখ্য। কপিলের সাংখ্য ঈশ্বরই স্বীকার করেন না।—কৃষ্ণচরিত্র, ১১০ পৃঃ।

সাঙ্খ্যশাস্ত্র তেমনই দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায় এই চতুর্ব্যূহে প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন মানব-দেহের রোগ ও তদারোগ্য লইয়া ব্যস্ত, সাঙ্খ্যশাস্ত্রও তদ্রূপ মানবাত্মার দুঃখ ও তদারোগ্যে যত্নবান্।

সাংখ্যশাস্ত্রে সর্ব্ব প্রথমেই আলোচিত হইয়াছে, দুঃখ কি, এবং বাস্তবিক দুঃখ বলিয়া কোন কিছু আছে কি না? কিন্তু এ বিষয়ের বিশেষ বিচার সাংখ্যশাস্ত্রে বড় নাই। কেননা, দুঃখ আছে কি না, তাহা শাস্ত্রবিচার দ্বারা বুঝিতে হয় না,—দুঃখ সর্ব্বদাই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে চেতনাশক্তির প্রতিকূল-অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে। তারপরে দুঃখ-নিবারণের কোন উপায় আছে কি না,—এ কথা লইয়া সম্যক্ আলোচনা করা হয় নাই। দুঃখ হইলে তাহা যখন মুহূর্ত্তের জন্যও উপস্থিত হয়, তখন যে তাহা একেবারে দূর হইতে পারে, একথা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহা ক্ষণিকের জন্য যায়, তাহা যে স্থায়ী ভাবেও যাইতে পারে—এ বিশ্বাস সকলেরই আছে, সুতরাং যাহা সকলে বোঝে, সকলে জানে, তাহা লইয়া আলোচনা করা সাঙ্খ্যকারের উদ্দেশ্য নহে। "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্।"—যাহা লৌকিক-প্রমাণের অগোচর, তাহা জানান বা তাহার বোধ জন্মানই শাস্ত্র। অতএব সাংখ্য যাহা বুঝাইতে উপস্থিত, তাহা অন্যের অগোচর। যাহার উপদেশ মানব কোথাও প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহার উপদেশ সাংখ্য প্রদান করিয়াছেন্।

মানুষ দুঃখ কি.তাহা জানে, দুখের নিবৃত্তি হয়,তাহাও মানুষ জানে। কেন না, দুঃখ নিবৃত্তি হয়, ইহা সকলেই অবগত আছে—তবে তাহা ক্ষণিকের জন্য। নিবৃত্তি হয়, কিন্তু আবার দুঃখ আসে। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় মানুষকে জানান।

ইহা মানবীয় জ্ঞানের অতীত—এ জ্ঞান লৌকিক নহে, অলৌকিক। সহজজ্ঞানে এ সত্য আবিষ্কৃত হয় না। ধাতুবৈষম্য-নিবন্ধন শারীর-দুঃখ হয়, সে দুঃখ নিবারণের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে শত শত উপদেশ আছে। আর বিষয়-বিশেষের অদর্শন বা অপ্রাপ্তিজন্য মানস-দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণের উপায়-স্থলে মনোজ্ঞ-স্ত্রী-পান-ভোজনাদি শত শত লৌকিক জ্ঞানের কথা, সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত প্রাসাদে বাস করিলে বৃষ্টি ঝঞ্ঝা প্রভৃতি দুঃখ নিবারণ হয়, তাহার কথা প্রভৃতি এবং গমনাগমনের জন্য বাষ্পীয় যান-বাহনাদি প্রস্তুতের উপায়, আহারাদির জন্য বিবিধ কৌশল, শত্রুধ্বংসের জন্য বিবিধ অস্ত্রপ্রস্তুত-প্রণালী, চিত্তবিনোদনের জন্য নানাবিধ কাব্য গ্রন্থ—এসকল মানবীয় জ্ঞান, এ সমুদয় মানবে প্রদান করিতে পারে। কিন্তু এ সকল লৌকিক জ্ঞানে মানবের আত্যন্তিক বা ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। মানব নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হয় না।

তবে এমন কি উপায় আছে, যাহা জানিতে পারিলে দুঃখ আর আসিতে পারে না? যাহা জানিতে পারিলে মানুষ চিরদিনের মত দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে?

সেই যে উপায় আছে, তাহাই সাঙ্খ্যকার বলিয়া দিয়াছেন। দুঃখ কি, দুঃখ কাহার, তাহা কেন হয়, দুঃখের আত্যন্তিক বা একেবারে নিবৃত্তি হয় কি না—অর্থাৎ তাহা আর কখনও হইবে না, এমন হয় কি না, যদি হয়, তবে তাহা কি উপায়ে হইতে পারে,—ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অপরাপর লৌকিক উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তির যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তদ্দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও তাহা আত্যন্তিক নহে,—সে দুঃখ ক্ষণিকের জন্য অপনোদিত হইলেও আবার আসে। এমন কি, যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও তাহা

ক্ষণিক,—কেন না, স্বর্গলাভের সময় নির্দ্ধারণ আছে। সময় ফুরাইলে আবার মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব এ সকল দুঃখনিবৃত্তির উপায় নহে—রোগ আরোগ্য হইয়া আবার হইলে তাহাকে প্রকৃত রোগারোগ্য বলে না।

সাঙ্খ্যমতে আত্যন্তিক দুঃখ মোচনের নামই মোক্ষ বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে,—মানুষ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিতেছে, অথচ তাহার স্বরূপ ও অবস্থান-স্থান জানিতেছে না। এবং দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃত উপায়ও জানিতেছে না। তাহাই বুঝাইয়া দিয়া মানুষকে কৃতার্থ করিব। কিন্তু এ জ্ঞান লৌকিক জ্ঞানের অতীত।

সাঙ্খ্য যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—যাগযজ্ঞের পূর্ণ যুগে ভগবান্ স্বয়ং অবতার গ্রহণ করিয়া সেই ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছেন। "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" বলিয়া তাই শিষ্য অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। একথা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাংখ্য নিরীশ্বর কি না?

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, সাঙ্খ্য নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন, সে কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, অলৌকিকত্ব কিছু থাকে কি না?

গুরু। সাঙ্খ্য নিরীশ্বর নহে। তবে কোন কোন সাঙ্খ্য গ্রন্থ মোটামুটিভাবে পাঠ করিলে তৎ-প্রণেতাকে ঈশ্বর-নাস্তিক বলিয়া

বুঝিতে পারা যায়। এসম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। তাহা বলিবার আগে এই অনীশ্বরবাদটা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক্।

সাঙ্খ্য-দর্শনের প্রথম গ্রন্থ কপিল মুনির প্রণীত, একথা তোমাকে আগেই বলিয়াছি। কপিল আবার একজন নহেন, মূল সাংখ্যদর্শনও একখানা নহে; দুই খানা। সুতরাং তৎসম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। আপাততঃ যে গ্রন্থখানি দৃষ্টি করিয়া কপিলের নিরীশ্বরবাদের কথা উঠিয়া থাকে, তাহার যে যে স্থানে যে যে ভাবের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কথা আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া দেখা যাউক।

সাংখ্য-প্রবচনসূত্র নামক সাংখ্যগ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে ৯২ সূত্রে আছে,—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" ১—৯২

অনুবাদ।—ঈশ্বর অসিদ্ধ।

ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,—কপিলদেব নিরীশ্বর নহেন। ঈশ্বর প্রমাণগম্য নহেন, সে জন্য তাহা লক্ষ্য-বহির্ভূত। ঈশ্বর যখন প্রামাণিক পদার্থ নহেন, তখন তাহার আবার বিচার কি? বাদীকে আপাততঃ নিরস্ত রাখাই উদ্দেশ্য। ঈশ্বর নাই এরূপ নিশ্চয় কথা বলিবার অভিপ্রায় থাকিলে, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এইরূপ না বলিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" এই রূপ স্পষ্ট কথা বলিতেন।

ইহার পরে আর তিনটি সূত্র আছে,—

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ১—৯৩

(কপিল ঈশ্বরবাদীকে বলিতেছেন;),—"তোমার অভিমত ঈশ্বর মুক্ত কি বদ্ধ? উভয় প্রকারই অসম্ভব। সুতরাং তাদৃশ ঈশ্বর অসিদ্ধ (প্রমাণপ্রাপ্য নহে।)"

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। ১—৯৪

"ঈশ্বর যদি মুক্ত, তবে সৃষ্টি-প্রযোজক রাগাদি না থাকায় স্রষ্টা নহেন। যদি তিনি বদ্ধ, তবে অস্মদাদির ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং সৃষ্টি-কার্য্যে অক্ষম।"

মুক্তাত্মনাং প্রশংসা উপাস্য সিদ্ধস্য বা। ১—৯৫

"শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের কথা আছে, তাহা মুক্তাত্মার ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা মাত্র। (মুক্তাত্মা ঋষিমণ্ডল। সিদ্ধাত্মা হরি-হর-ব্রহ্মাদি।)"

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। ১—৯৬

অধিষ্ঠাতৃত্ব=প্রকৃতিকে সৃষ্ট্যুন্মুখ বা পরিণামিত করা। "তাহা অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্তে আদি-পুরুষের সন্নিধান প্রভাবেই নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে ঈশ্বরের, সঙ্কল্পের বা চেষ্টার কোন আবশ্যক হয় না।"

এতাবতা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, কপিল ঈশ্বর মানিতেন, কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের সবিশেষ কার্য্যকারিতা স্বীকার করিতেন না। কেবল প্রকৃতিকে পরিণামিত করিয়া দেওয়া তাঁহার কার্য্য অথবা তাহা কার্য্যও নহে; আপনিই হয়।

ঐ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে কয়েক সূত্রে ঈশ্বরের কথা আছে। তাহা এই,—

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। ৫—২

"কারণ-কূটে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান থাকিলে, তাহা সফল হয়, একথা অযুক্ত। কর্ম্ম নিজ স্বভাবে ফল প্রসব করে।"

সোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ। ৫—৩

"ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা (অনুমান) করিতে গেলে তৎসঙ্গে অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। (যেমন

লৌকিক প্রভু নিজ উপকারার্থ কার্য্য করেন, তেমনি জগৎ-কর্ত্তাও নিজ উপকারার্থ জগৎ সৃজন করেন, এইরূপ বলিতে হইবে।)"

লৌকিকেশ্বরবাদিতরথা। ৫—৪

"ঈশ্বরের উপকার, ইহা স্বীকার করিলে তিনিও লৌকিক ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়া পড়েন।—অর্থাৎ তিনিও রাজাদির ন্যায় স্বার্থপর, সংসারী ও সুখদুঃখভাগী।"

পারিভাষিকো বা। ৫—৫

"সংসার সত্ত্বেও যদি ঈশ্বর-সংজ্ঞা দাও, তবে তাহা নামে ঈশ্বর। যিনি সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন, তাঁহার অন্য নাম ঈশ্বর।"

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ। ৫—৬

"রাগ ব্যতীত অধিষ্ঠাতৃত্ব (স্রষ্টৃত্ব) অসিদ্ধ। কেন না, রাগই প্রবৃত্তির প্রধান কারণ।"

তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ। ৫—৭

"রাগ থাকা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিত্য-মুক্ত নহেন।"

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। ৫—৮

"প্রকৃতির শক্তি ইচ্ছাদি, তৎসম্বন্ধাধীন তাঁহার ঈশ্বরত্ব, এরূপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অসঙ্গস্বভাবতা ভঙ্গ হইবে।"

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্। ৫—৯

"প্রকৃতির সন্নিধান থাকায় ঈশ্বরত্ব, এরূপ বলিতে গেলে সকল আত্মা ঈশ্বর না হয় কেন? এরূপ আপত্তি হইবে।"

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫—১০

"প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর অসিদ্ধ।"

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। ৫—১১

"সম্বন্ধের,—অর্থাৎ ব্যাপ্তির অভাব থাকায় ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রসর প্রাপ্ত হয় না।"

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য।

"শ্রুতি-প্রমাণে প্রকৃতি কার্য্যতা (প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব) প্রমিত হয়।"

নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য। ৫—১৩

যাঁহারা বলেন,—চেতনে জ্ঞাননাশ্য অনাদি অবিদ্যা নামে এক প্রকার শক্তি থাকে, তাহাতেই চেতনের বন্ধন (সংসার) এবং তাহারই অভাবে মোক্ষ,—তাহাদের প্রতি কপিল বলিতেছেন,—"অসঙ্গ-স্বভাব পুরুষে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অবিদ্যাশক্তির যোগ (সম্বন্ধ) অসম্ভব।"

ঈশ্বর-সম্বন্ধে কপিলের এইরূপ মত পাঠ করিয়া বুঝা যায়, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর-নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু সাংখ্যসপ্ততির ভাষ্যলেখক গৌড়পদ ভাষ্যশেষে ঈশ্বর-বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে, সাংখ্যের ঈশ্বর-নাস্তিক খ্যাতি তিরোহিত হইতে পারে।

এই স্থলে বুঝিয়া দেখিবার আর একটি কথা আছে। পতঞ্জলি প্রভৃতি যে দর্শন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাও সাংখ্য। পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে সেশ্বর সাংখ্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ইহাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রকার সন্দিহান নহেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ দিতে হইবে, ইহা যেন তাঁহাদের জানাও ছিল না। তিনি যেন সকলের জ্ঞানে নিশ্চিন্ত,—পরন্তু জীবগণ যেন তাঁহার স্বরূপ জানিয়াও জানে না, অথচ তাঁহাদের তাহা জানা

আবশ্যক, সেইটুকু বুঝাইবার জন্য যাহা বলিবার প্রয়োজন, তাহা পতঞ্জলি প্রভৃতি বলিয়াছেন।

এখন কথা এই যে, কপিল আদিসাংখ্যকার। তিনি যদি ঈশ্বর অসিদ্ধ এমন প্রমাণ করিয়া যাইতেন, তবে পরবর্ত্তী সেশ্বর সাংখ্যকারগণ ঈশ্বর আছেন, এই বিষয়ে সবিশেষ প্রমাণ দেখাইতেন।

শিষ্য। তবে কি আপনি বলেন যে, সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র আদি-গ্রন্থ নহে, এবং কপিলের লেখা নহে?

গুরু। সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র আদি-সাংখ্যগ্রন্থ নহে, তবে উহা কপিলের লেখা বটে। কিন্তু আদিকপিলের নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কপিল।

শিষ্য। কপিল কয়জন?

গুরু। চারিজনের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন বড় আধুনিক—আর তিনজন প্রাচীন। যিনি অত্যন্ত আধুনিক, তাঁহার সম্বন্ধে এদেশের লোক না হউন, বিদেশীয়গণ সাংখ্যকারের ভুলও করিয়া থাকেন।

শিষ্য। আধুনিক কপিল কে?

গুরু। ইনি গৌতম-বংশীয়। এই কপিলের নামে কপিলবাস্তু নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইহা বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে। এই কপিল কোন প্রকার সাংখ্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই।

শিষ্য। অপর তিন কপিলই সাংখ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন?

গুরু। না। কিন্তু এই তিনকে লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছে। ইহার এক কপিল ব্রহ্মার মানস-পুত্র ও আদি-বিদ্বান্—অর্থাৎ আদি-জ্ঞানী নামে পরিচিত। দ্বিতীয় কপিল অগ্নির অবতার। তৃতীয় কপিল দেবাহুতির গর্ভে ও কর্দ্দম ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথম কপিল-সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়য় যায়,—

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি
জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ। [শ্রুতিঃ।

আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্‌ জ্ঞানৈস্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্ ॥
[স্মৃতিঃ।

শ্রুতি ও স্মৃতির এই দুইটি শ্লোকদ্বারা কপিল দেবের পূর্ণজ্ঞান ও প্রাচীনতার কথা স্পষ্টতঃ অবগত হওয়া যাইতেছে। এখন কপিল ব্রহ্মার পুত্র কি না?

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সপ্তৈতে মানসাঃ পুত্রা ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ [পুরাণ।

পুরাণের এই শ্লোক দ্বারা কপিল যে ব্রহ্মার মানস-পুত্রের একজন, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। এখন ব্রহ্মার পুত্র কপিল সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন কি না?

গৌড়পদ স্বামী সাংখ্যশাস্ত্রের প্রধান ও প্রাচীনতম ভাষ্যকার। শুকদেবের শিষ্য। যথা—

নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্রপরা-

শরঞ্চ। ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দ-যোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্।

নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব এই পর্য্যন্ত পুত্রপরম্পরা বা পিতাপুত্র সম্বন্ধ। তৎপরে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ। এ অনুসারে গৌড়পদ শুকদেবের শিষ্য। গৌড়পদ দীর্ঘায়ুঃ পরম যোগী ছিলেন। গৌড়পদ সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত বেদান্ত ও সাংখ্যের অনেক পুস্তক আছে। তন্মধ্যে বেদান্তের মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্য এবং সাংখ্যসপ্ততিভাষ্য অতি প্রসিদ্ধ। এই গৌড়পদ স্বামী আদি-সাংখ্যপ্রণেতা কপিল সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম। তদ্‌যথা—সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। অন্ত ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥—ইত্যাদি।

গৌড়পদ স্বামী ব্রহ্মপুত্র কপিলকেই আসি-সাংখ্য-প্রণেতা বলিয়াছেন। এই আদি-বিদ্বান্ কপিল যে সাংখ্যগ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম "তত্ত্বসমাস" বা "দ্বাবিংশতি সূত্র।" এই গ্রন্থকে আদি-গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে অন্য কোন দর্শনের উপর কটাক্ষ করা হয় নাই। কেবল মাত্র প্রমেয় পদার্থ সূত্রিত হইয়াছে। আদি-গ্রন্থ যেরূপ নিরপেক্ষ ভাবে রচিত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা তাহাই। এই গ্রন্থে নিরীশ্বর বাদের কোন আভাসই পাঁওয়া যায় না; রবং চতুর্থ সূত্রে স্বেশ্বরবাদের কথাই আছে। অন্যান্য সাংখ্যগ্রন্থ এই আদি-সাংখ্যগ্রন্থেরই বিস্তৃতি। যথা—

অথাত্রানাদিক্লেশ-কর্ম্ম-বাসনা-সমুদ্রপতিতান্ অনাথান্ উদ্দিধীর্ষুঃ পরমকৃপালুঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানো মহর্ষির্ভগবান্ কপিলো ব্রহ্মসুতো দ্বাবিংশতিসূত্রাণ্যুপাদিক্ষ্যৎ। সূচনাৎ সূত্রমিতি হি ব্যুৎপত্তিঃ। তত এতৈঃ সমস্ততত্ত্বানাং সকলষষ্টিতন্ত্রার্থানাং সূচনং ভবতি। ততশ্চেদং সকল-সাংখ্যতীর্থমূলভূতম্। তীর্থান্তরাণি চৈতৎ প্রপঞ্চভূতা-ন্যেব। সূত্রষড়ধ্যায়ী তু বৈশ্বানরাবতারভগবৎকপিল-প্রণীতা। ইয়ঞ্চ দ্বাবিংশতিসূত্রী তস্যা অপি বীজভূতা ব্রহ্মসুতমহর্ষিভগবৎকপিলপ্রণীতেতি বৃদ্ধা বদন্তি।

মর্ম্মানুবাদ এই যে,—ক্লেশ-কর্ম্ম-বাসনা-সমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারার্থ পরম কৃপালু স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি কপিল দ্বাবিংশতি সূত্রাত্মক সাংখ্যোপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্ত্ব-সমূহের সূচনা করা হইয়াছিল, এই কারণে তাহাকে সূত্র বলা হয়। এই আদি সাংখ্য-সূত্রই অন্যান্য সাংখ্যশাস্ত্রের মূল বা বীজ। যতই সাংখ্য থাকুক, সমস্তই ঐ দ্বাবিংশতি সূত্রের বিস্তার। সূত্রষড়ধ্যায়ী সাংখ্য—যাহা এক্ষণে "সাংখ্য-প্রবচন" নামে পরিচিত, তাহা ভগবান্ অগ্নির অবতার কপিলের কৃত এবং উহাও ঐ আদি সাংখ্যের প্রপঞ্চ—অর্থাৎ ঐ দ্বাবিংশ সূত্রের বিস্তার।

ইহা দ্বারা স্থির হইতেছে যে, তত্ত্বসমাস নামক আদি সাংখ্য-গ্রন্থ ব্রহ্মার পুত্র আদি-বিদ্বান্ কপিলের রচিত এবং সাংখ্য-প্রবচন নামক সাংখ্যগ্রন্থ অগ্নির অবতার কপিলের রচিত। এই দ্বিতীয় গ্রন্থেই নিরী-শ্বরবাদের তর্ক খাটে। কিন্তু প্রথম গ্রন্থই সাংখ্যশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ।

এই আদিবিদ্বান্ ব্রহ্মার পুত্র কপিল আদি-সাংখ্যপ্রণেতা। তাঁহার

শিষ্য আসুরি ও বোঢ়ু। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য। পঞ্চশিখা-চার্য্যের শিষ্য ঈশ্বর কৃষ্ণ। ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা-গ্রন্থই এখন সমধিক আদরণীয়।

ইহাঁরা ক্রমে ক্রমে সাংখ্যমত প্রচার করেন। সাংখ্যমতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র প্রভৃতি সমস্তই পরিপূর্ণ। সাংখ্যমত গ্রহণ করেন নাই, এমন ঋষি কেহ ছিলেন না। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা-নিকগণও সাংখ্য-মতাবলম্বী।

অতএব আদিকপিলের গ্রন্থ নিরীশ্বরবাদ পূর্ণ হইলে, তন্মতাবলম্বী কেহই ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

শিষ্য। অগ্নির অবতার যে কপিলদেব সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর-নাস্তিক ?

গুরু। তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রগুলি পাঠ করিলে, আপাততঃ তাহাই মনে হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী ভাষ্যকারেরা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদী ধরিয়া লইলেও সাংখ্যশাস্ত্রে দোষ স্পর্শ করে না।

শিষ্য। এই দ্বিতীয় কপিলের কথা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় কি ?

গুরু। হাঁ, মহাভারতে অগ্নির অবতার দ্বিতীয় কপিলের কথা পাওয়া যায়। যথা—

শুক্লকৃষ্ণগতির্দ্দেবো যো বিভর্ত্তি হুতাশনম্।
অকল্মষঃ কল্মষাণাং কর্ত্তা ক্রোধাশ্রিতস্তু সঃ॥
কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাঙ্খ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ॥

শঙ্করাচার্য্য বলেন—"এই কপিল (সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র) সাংখ্য-শাস্ত্রের রচয়িতা এবং সগরসন্তানগণের দাহকর্ত্তা। *

এই কপিল সগর-বংশ ধ্বংশ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। তৃতীয় কপিল কে ?

গুরু। তৃতীয় কপিল কর্দ্দম ঋষির ঔরসে, দেবাহুতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। যথা—

এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষাণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যাপ্রায়তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ইনি নিজ জননী দেবাহুতিকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ উপদেশাবলী মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাংখ্য-মতাবলম্বী না বলিয়া বৈদান্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। অধিকন্তু তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বরের অবতার মানেন,—এমন কি, নিজেকে স্থানে স্থানে অবতার বলিয়াও মাতার নিকটে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অতএব তিনি সাংখ্যগ্রন্থের রচয়িতা নহেন।

এক্ষণে বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, সাংখ্যশাস্ত্রমাত্রই নিরীশ্বর-বাদী নহে। কেবল অগ্নির অবতার সগরবংশ-ধ্বংসকারী কপিলের সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে ঐ দোষে দুষ্ট। তাহাও সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা ঐ সকল সূত্রের অবস্থাও অর্থান্তর ঘোষণা করেন।

---

* কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্ব্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ॥ (শারীরিক ভাষ্য)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাংখ্যমত।

শিষ্য। আপনি বলিলেন,—সাংখ্যমতে ঐকান্তিক দুঃখ নিরোধের নামই মুক্তি। বাস্তবিক মনে হয়, দুঃখ নিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। দুঃখ নিবারণকল্পেই মানুষের নিরন্তর ছুটাছুটি। দুঃখ আছে, সুখ আছে—দুঃখ নিবারণ হইলে সুখ হয়, ইহাও জানা আছে,—এবং কোনও এক সময়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগ ঘটিতে পারে, এমন সম্ভাবনাও আছে—এমন অনুভব হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাহা হয়, তাহা কেহ জানে না। সাংখ্যের একথায় ভক্তি হয়, এবং মনে হয়, ইহা একটা অস্বাভাবিক তর্কজালজড়িত অদ্ভুত কথা নহে। প্রাণের অতি নিকটের কথা।

গুরু। কেবল সাংখ্যপ্রণেতা একথা বলেন নাই। সমস্ত ঋষিগণই বলিয়াছেন—দুঃখ নিবারণই মুক্তি। মহর্ষি জৈমিনিও বলেন,—

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃ পদাস্পদম্॥

"নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগই স্বর্গ এবং তাহাই মনুষ্যের সুখ-তৃষ্ণার বিশ্রাম-ভূমি। তাহাই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত।"

জৈমিনি বলেন,—এই মোক্ষ বা সুখ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিদ্বারা ফললাভ হয়, স্বর্গ হয়—কিন্তু তাহার ক্ষয় আছে। পরিমিত কাল সুখসম্ভোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু সেই পরিমিত কাল অন্তে আবার দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যাগ-যজ্ঞাদি নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের উপায় নহে।

মানবীয় উপায়ে দুঃখ নাশ হয়, কিন্তু আবার উপস্থিত হইয়া থাকে। যজ্ঞাদির দ্বারা দুঃখ বিনাশ হয়, তাহাও আবার কালে উপস্থিত হয়,—অতএব সে সকল দুঃখনাশের প্রকৃত উপায় নহে।

শিষ্য। তবে সে উপায় কি?

গুরু। সাংখ্যমতে সে উপায়—তত্ত্বজ্ঞান।

শিষ্য। তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকার?

গুরু। তত্ত্বজ্ঞানের আকার—"আমি মহৎ অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহি—ঐ সকলের কিছুই আমি নহি এবং ঐ সকল আমার নহে। আমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন—চিৎস্বরূপ। **কেবল ও ব্রহ্ম।**"

প্রাগুক্ত জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান।

শিষ্য। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি?

গুরু। সাংখ্যশাস্ত্র বলেন—এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আত্মা ও জগৎ,—এই বস্তুদ্বয়ের যথার্থরূপ অন্বেষণ করিতে হয়। আত্মা ও প্রকৃতি (জগদ্ভাবাপন্না) এতদুভয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করার নাম তত্ত্বাভ্যাস। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তত্ত্বাভ্যাস করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মনে করুন, যাহার আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই, সে কি প্রকারে তাহার তত্ত্বাভ্যাস করিবে?

গুরু। ও-পাড়ার তারাপ্রসাদকে চেন কি?

শিষ্য। আজ্ঞে চিনি বৈকি—সে একজন ভাল গায়ক।

গুরু। তাহাকে বাল্যকালে জানিতে? সে গান-বাজনার কিছুই জানিত না। প্রথমে তাহার সুর বা তালবোধ কিছুই ছিল না—অনুশীলন করিতে করিতে এখন ভাল গায়ক হইয়াছে। তেমনই

এই তত্ত্বজ্ঞানও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

সাংখ্যমতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ম আত্মা ও জগৎ এই উভয়ের বিচার করা আবশ্যক। আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আগে, জগৎসম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য। কেন না, জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে—জগতের স্বরূপ চিন্তা করিতে গেলে, আত্মার বিষয় অবগত হওয়া সহজ হইয়া পড়িবে।

এই জগতের মূল তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি। তদ্ভিন্ন আত্মতত্ত্ব এক। সমুদায়ে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টির নাম জগৎ; তাহার ব্যষ্টি—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধ-তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত,—এতন্নামে খ্যাত। আত্মা বা চেতন পুরুষ ব্যতীত এই সমুদয় বিশ্ব ঐ চব্বিশ তত্ত্বের অন্তর্গত।

আধুনিক বিজ্ঞানে এই তত্ত্বকে মৌলিক পদার্থ এবং বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ধাতু বলে। তত্ত্বশব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, যাহা যাহার যোনি বা মূল, তাহা তাহার তত্ত্ব। যথা,—ঘটের তত্ত্ব মৃত্তিকা, কুণ্ডলের তত্ত্ব স্বর্ণ ইত্যাদি।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতি।

শিষ্য। প্রকৃতি কি, তাহা বলুন?

গুরু। প্রকৃতি কি, তাহা বলা সহজ, কিন্তু ধারণা করা সহজ নহে।

শিষ্য। কেন?

গুরু। শাস্ত্র বলেন,—প্রকৃতি বুঝিবার অধিকারী না হইলে, প্রকৃতি বুঝা যায় না।

শিষ্য। সেই অধিকার কি প্রকারে লাভ করিতে হয়?

গুরু। শাস্ত্র বলেন,—আহারশুদ্ধি, ব্যবহারশুদ্ধি, ত্রিবিধ সংঘাত-শুদ্ধি, দেশ, কাল ও সৎপাত্রাদির লাভ, সংকল্প ত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রতচর্য্যা এবং গুরু-সেবা প্রভৃতিতে এই অধিকার লাভ হয়।

শিষ্য। যাহা বুঝিতে পারা যায় না,—যাহা ধারণার অতীত, তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

গুরু। আমাদের মত স্থূলবুদ্ধি মানব অনেক বিষয় বুঝিতে পারে না—তাই কি কোন বিষয়ে বিশ্বাস করিতে হইবে না। ঐ যে সুবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের ফল দেখিতেছ, একটা আনিয়া ভাঙ্গ দেখি।

শিষ্য। এই ভাঙ্গিলাম।

গুরু। উহার মধ্যে কি আছে?

শিষ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ।

গুরু। একটা বীজ ভাঙ্গ দেখি।

শিষ্য। এই ভাঙ্গিলাম।

গুরু। উহার মধ্যে কি আছে?

শিষ্য। কিছুই না।

গুরু। যদি কিছুই নাই, তবে ঐ বীজ পুঁতিলে বৃক্ষ হইত কি প্রকারে? উহার মধ্যে ঐরূপ একটি বৃহত্তর অশ্বত্থ বৃক্ষ অব্যক্ত অবস্থায় নিহিত আছে, কিন্তু তুমি দেখিতে পাইলে না। কল্য যে একখণ্ড মিছরি জলে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলে, তাহা এখনও জলমধ্যে আছে কি?

শিষ্য। না, তাহা গলিয়া গিয়াছে।

গুরু। গলিয়া কোথায় গিয়াছে? কোথাও যায় নাই—অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাবস্থায় জলেই আছে, জল খাইলেই বুঝিতে পারিবে। যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে আইসে না, তাহা নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। স্থূলচক্ষুতে অণু দেখা যায় না, সুতরাং তাহা নাই বলিতে পারিবে না—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহা দেখিতে পাইবে। অতএব অধিকারী না হইয়া প্রকৃতির অন্বেষণ করিলে তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে না বলিয়া তাহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। যে কখন দুগ্ধ দেখে নাই, দধি দেখে নাই, নবনীতও দেখে নাই—ঘৃত দেখিয়া ঘৃতের প্রকৃতি—অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান অবগত হইতে চাহিলে তাহাকে দুগ্ধতত্ত্ব অনুভব করান কঠিন হয়।

শিষ্য। প্রকৃতির স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিবার কারণ, আর আপনার উপমাটি কি ঠিক একপ্রকার হইল?

গুরু। হাঁ। দুগ্ধের পরিণতিতে দধি, দধির পরিণতিতে নবনীত, নবনীতের পরিণতিতে যেমন ঘৃত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রকৃতি এখন রূপান্তরে অবস্থান করিতেছে। এখন তাহার জগদবস্থা। আমাদের নয়নের সম্মুখে যে বিশাল বিশ্ব প্রসারিত রহিয়াছে—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদ, নদী, সাগর, ভূধর, তরু, গুল্ম, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও দেবতা প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়—এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্য, এই সপ্তলোক—সমস্তই সেই প্রকৃতি। যাহারা জীব, তাহারাও প্রকৃতি-আশ্রিত।

প্রকৃতি, জগতের মূল। জগতের বীজ, জগতের অব্যক্ত অবস্থা, এ সকল সমান কথা।

শিষ্য। একবার বলিতেছেন, আমাদের নয়নের সম্মুখে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সমস্তই প্রকৃতি, আবার বলিতেছেন, প্রকৃতি জগতের বীজ। কথাটা বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতির পরিণাম বা প্রকৃতির প্রজা।

শিষ্য। প্রজা কি?

গুরু। প্রকৃতি হইতে জন্মগ্রহণ করে। যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃতের জন্ম। যাহা জন্মে, তাহার মূল আছে—সেই মূল, প্রকৃতি। প্রকৃতি সেই মূল কারণের একটা সংজ্ঞা মাত্র। প্রকৃতির আরও কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম আছে,—প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত, জগদ্‌যোনি ও জগদ্বীজ।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি।—অর্থাৎ এই গুণত্রয় যখন সমভাবে বা অন্যূনাতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করে, তখনই তাহা প্রকৃতিপদাভিধেয় হয়। আবার যখন তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটনা হয়,—অর্থাৎ একটি প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্যটিকে অভিভূত করে, অল্পে অল্পে তখন তাহার নাশ পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ব; দ্বিতীয় পরিণামের নাম অহংতত্ব; তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু; চতুর্থ পরিণাম জগৎ।

স্থূল কথা, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদায়ের মূল স্থূলভূত। স্থূলভূতের মূল সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের মূল অহং-তত্ত্ব। অহংতত্ত্বের মূল মহত্তত্ত্ব। যাহা মহত্তত্ত্বের মূল, তাহাই প্রকৃতি।

জগতের অব্যক্তা প্রকৃতি, আর ব্যক্তাবস্থা জগৎ।

শিষ্য। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই জগতের তিনটি মাত্র অবস্থা

বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন,—পদার্থের ঘন (Solid) তরল (Liquid) এবং বাষ্পীয় (Gaseous) এই তিনটি অবস্থা আছে। যেমন অপের তিন অবস্থা,—বাষ্প, জল এবং বরফ। তবে আ'জ কা'ল কেহ কেহ ঐ অবস্থাত্রয়ের অতিরিক্ত আর একটি অবস্থা স্বীকার করেন। তাহার নাম মরুৎ (Ether)। ইহার কোন্ অবস্থা মূল প্রকৃতি?

গুরু। ইহার কোন অবস্থাই মূল প্রকৃতি নহে। এ সকল প্রকৃতির জগদ্রূপ। ইহার পরে আরও অবস্থা আছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নিকট এখনও তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যে চারি অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উপরে আর্য্যশাস্ত্র আরও সূক্ষ্মতর ব্যোমের উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রের স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও দুইটি সূক্ষ্মতর অবস্থার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে অবস্থাদ্বয়ের নাম অনুপাদক ও আদি। অতএব আর্য্য ঋষিদিগের মতে এই স্থূল জগতের (যাহার শাস্ত্রোক্ত নাম 'ভূঃ' লোক) পর পর সাতটি স্তর আছে। সেই স্তর কয়টির সূক্ষ্মতম হইতে যথাক্রমে নাম—আদি, অনুপাদক, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী। এক এক স্তরের ভূত এক একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব। এবং এক একটি তত্ত্বের গ্রহণোপযোগী আমাদের এক একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে। সেই সেই তত্ত্বের সংযোগে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে যে বিশেষ বিশেষ স্পন্দন উদ্ভূত হয়, আমরা যথাক্রমে তাহার নাম দিই—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। আদি ও অনুপাদক তত্ত্বের গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয় এখনও মনুষ্যদেহে স্ফুরিত হয় নাই; সেই জন্য তাহাদের সংযোগে যে স্পন্দন উৎপন্ন হইতে পারিত, আমাদের ভাষায় তাহাদের কোনও নাম নাই। এক এক তত্ত্বের উপাদানভূত পরমাণুর পারিভাষিক সংজ্ঞা "তন্মাত্র"।

পার্থিব পরমাণুর নাম গন্ধতন্মাত্র, জলীয় পরমাণুর নাম রসতন্মাত্র,

তৈজস পরমাণুর নাম রূপতন্মাত্র, বায়বীয় পরমাণুর নাম স্পর্শতন্মাত্র এবং আকাশীয় পরমাণুর নাম শব্দতন্মাত্র।

এই পর্য্যন্ত গেল, স্থূলজগতের কথা—ভূর্লোকের কথা। আর্য্য-ঋষিরা বলেন যে, এই ভূর্লোকের পর পর আরও ছয়টি লোক আছে। তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম। এই সপ্তলোকের প্রত্যেকেই ভৌতিক উপাদানে গঠিত; পরস্পরে কেবল স্থূল-সূক্ষ্মের তারতম্য। প্রত্যেক লোকের আবার সাতটি করিয়া স্তর আছে। ভূর্লোকে সপ্তস্তরের কথা বলিয়াছি। অপর ছয়লোকেরও এইরূপ সাতটি করিয়া স্তর আছে। ভূর্লোকের যাহা সূক্ষ্মতম স্তর—আদিতত্ত্ব, তাহাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের Protyle।—অর্থাৎ ভূর্লোকের আদি তত্ত্বই সেই জগতের চরম পরমাণু (Ultimate atom)—সেই লোকের অদ্বিতীয় মূল মহাভূত। সেই মূল ভূতের সংহননেই নিম্নের অপরাপর ছয় স্তরের উপাদান গঠিত হয়। ভূর্লোকের যে আদিতত্ত্ব (Protyle), তাহাই বিচিত্ররূপে সংহত হইয়া যথাক্রমে অনুপাদকতত্ত্ব, শব্দতন্মাত্র, (আকাশতত্ত্ব), স্পর্শতন্মাত্র (বায়ুতত্ত্ব), রূপতন্মাত্র (তেজস্‌তত্ত্ব), রসতন্মাত্র (অপ্‌তত্ত্ব) ও গন্ধতন্মাত্র (পৃথিবীতত্ত্ব) উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু Protyle ভুবর্লোকের আদিতত্ত্ব নহে। বস্তুতঃ ভূর্লোকের আদি-তত্ত্ব ভুবর্লোকের স্থূলতম স্তর (পৃথিবীতত্ত্ব) হইতেও স্থূল। ভুবর্লোকের আদিতত্ত্বের তুলনায় ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব চরম পরমাণু নহে; কিন্তু ভুবর্লোকের আদিতত্ত্বের পরমাণু-পুঞ্জের সংহননজনিত। ভুবর্লোকের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য লোক সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। এইরূপ পরস্পর বিশ্লেষণ করিয়া সত্যলোকের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদিতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই আর্য্য ঋষির কথিত মূল প্রকৃতি।

একণে তুমি বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, তোমার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ভূর্লোকের আদিতত্ত্বের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেও মূল প্রকৃতিতত্ত্বে উপস্থিত হইতে অনেক বিলম্ব।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুরুষ।

শিষ্য। সাঙ্খ্যশাস্ত্রকারগণ যে পুরুষের কথা বলিয়াছেন, সেই পুরুষ কি পদার্থ, তাহা বলুন?

গুরু। সাঙ্খ্যশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—একথা বলিলে বিষয়টা যেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পড়ে। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—হিন্দুধর্ম্মটা সম্পূর্ণ সাঙ্খ্যমতের উপরেই সংস্থাপিত। শ্রুতি বল, স্মৃতি বল, তন্ত্র বল, পুরাণ বল, সমস্তই সাঙ্খ্যমতে প্রতিষ্ঠিত। সাঙ্খ্য-প্রণেতা আদি-বিদ্বান্ * ব্রহ্মার মানস পুত্র মহর্ষি কপিল সর্ব্ব প্রথমে এই মতই প্রচার ও প্রকাশ করেন।

শিষ্য। পুরুষ কি, তাহা বলুন?

গুরু। প্রকৃতির কথা বলিবার সময় বলা হইয়াছে, প্রকৃতি বুঝিতে অধিকার চাই, পুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রকৃতি যেমন জগদবস্থায় পরিণত, পুরুষও তদ্রূপ এখন স্বরূপে অবস্থিত নহেন। পুরুষ এখন সংসারী। প্রকৃতি এখন যেপ্রকার স্থূলাস্থূল বহুবিধ আকার ধারণ করিয়াছেন, তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহুবিধ গুণের উদ্ভব হইয়াছে, পুরুষও এখন ইন্দ্রিয়-সহায়

---

* বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। অতএব আদিজ্ঞানী।

হইয়াছেন,—প্রকৃতির আলিঙ্গনে বিমোহিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন।

প্রকৃতির বাহুবন্ধন বিমুক্ত হইলে, তবে পুরুষ আপনি আপনাকে জানিতে পারেন। এই পুরুষই আত্মা নামে অভিহিত।

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।—সাঙ্খ্য।

এই পুরুষ অসঙ্গ।

জীবদেহে জড়াতিরিক্ত কিছু আছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। এই হেতু—

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ।—সাঙ্খ্য।

আত্মা না থাকার সাধন—অর্থাৎ প্রমাণ নাই। অতএব আত্মা আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। *

দেহাদিব্যতিরিক্তোহসৌ বৈচিত্র্যাৎ।—সাঙ্খ্য।

বিচিত্রতা হেতু আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত।

ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি।—সাঙ্খ্য।

আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এই সম্বন্ধি-সম্বন্ধের উল্লেখদৃষ্টে আত্মার (পুরুষের) দেহাদি ভিন্নতা অবধারিত হয়।

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ।—সাঙ্খ্য।

---

* আত্ম-নাস্তিকেরা বলেন,—যেমন গুড়-তণ্ডুল প্রভৃতির সংযোগে সুরা জন্মে, তদ্রূপ ভৌতিক সংযোগে চৈতন্য জন্মে, আত্মা নাই। একথা ভুল,—যাহা নাই, তাহা জন্মে না। ভূতসকল জড়, তাহাদের চৈতন্য নাই, তবে তাহাদের সংযোগে চৈতন্য কি প্রকারে জন্মিবে? যে সকল দ্রব্যের মাদকতাশক্তি সূক্ষ্মভাবে আছে, তাহাদের একযোগে স্থূলশক্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু যাহাদের নাই, তাহাদের যোগে হয় না। সব জিনিষে কি মদ হয়?

জড়ত্ব বিপরীত চৈতন্য আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাই জড়ের প্রকাশক। জড় তাহার প্রকাশ্য।

অতএব আত্মা বা পুরুষ জড়ের অতিরিক্ত এবং তিনিই জীবের দেহপুরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য। যিনি 'আমি', তিনিই পুরুষ বা আত্মা।

শিষ্য। এই স্থলে আমার একটি প্রশ্ন আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। অসংখ্য, অগণিত জীব বিশ্বে অবস্থিত। তাহা হইলে পুরুষও কি অসংখ্য অগণিত?

গুরু। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, চেতনা এক জড়বিপরীত, জড়ের প্রকাশক স্বতন্ত্র, অবিনাশী অনুৎপন্ন সুতরাং নির্ব্বিকার পদার্থ। এই জড়বিপরীত ও জড়ের সদাস্ফূর্ত্তিদায়ক স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য আত্মা বা পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ এবং মন প্রভৃতি তাহারই অনুবল প্রাপ্ত হইয়া চেতনাবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। এই যে চিদাত্মা, ইহার সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে;—এক বৈদান্তিক মত; অপর সাঙ্খ্যমত। সাংখ্যমতই প্রবল। কেন না, ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি সকলেরই এই মত।

বৈদান্তিক বলেন—"আত্মা এক, বহু নহে। একই আত্মা মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত। সুতরাং জীব অসংখ্য; আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহপরিচ্ছেদে নানা দেহে ভেদ প্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।"

সাংখ্যাদি বলেন,—"তাহা নহে। চিদাত্মা অসংখ্য। পরন্তু প্রত্যেক চিদাত্মা বিভু—অর্থাৎ পরিপূর্ণ বা মহান্ ব্যাপী। অথচ পরস্পর পরস্পরের অবিরোধী। যেমন গৃহে বহুল দীপ জ্বলিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করে, কেহ কাহাকে বাধা

দেয় না, সকলেরই সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি থাকে, তেমনি জীবভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মাও পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থিত আছে, অথচ কাহারও ব্যাপ্তির ব্যাঘাত নাই। একটি দীপ জ্বালিত, কি নির্ব্বাপিত করিলে, যেমন অন্য দীপ জ্বালিত বা নির্ব্বাপিত হয় না, সেইরূপ এক আত্মার বন্ধনে ও মোক্ষে আত্মান্তরের বন্ধ বা মোক্ষ হয় না। আত্মা প্রতি শরীরে বিভিন্ন, সুতরাং সুখ, দুঃখ, শোক, সন্তাপ, জন্ম, মরণ প্রভৃতি বিভিন্ন।"

সুতরাং এক আত্মা কেবল মনের দ্বারা বিভিন্ন, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

শিষ্য। আত্মা বা পুরুষ যদি বহু হয়, তবে মুক্তি কি? আমার জানা ছিল, ঈশ্বর অনন্ত সাগরবৎ, আর জীব তদুদ্ভূত বুদ্বুদের ন্যায়। বুদ্বুদ নিবিয়া গেলে মহাসাগরেই পরিণত হয়। জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম হয়।

গুরু। কথাটা তত সোজা নহে। যদি জীবের মোক্ষ হইলে জীব ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি হইতে পারিত না। বীজে বৃক্ষের ন্যায় অব্যক্তাবস্থায় জীবও ঈশ্বরে লীন থাকে, তাহা দ্বারাই পুনঃ সৃষ্টি হয়। আর আত্মা যে অবিনাশী, একথা তাহা হইলে বলা যায় না। যাহা মিলিয়া যায়, যাহার লয় হয়—তাহা অবিনাশী হইতে পারে না। ইহাই সাংখ্যবাদিগণের কথা। তাঁহারা

বলেন—আত্মাতে যে দুঃখ আছে, সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই আত্মার মুক্তি হয়। মোহ ভ্রম প্রভৃতি সমস্তই দুঃখের অন্তর্গত।

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।

সাংখ্য।

যে কোন প্রকারে হউক, তদুচ্ছেদ—অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। ফল কথা এই যে, জড়সম্বন্ধ-রহিত—অর্থাৎ কেবল হওয়াই সাংখ্যমতের মুক্তি।

শিষ্য। এই মুক্তির অবস্থা আমি অনুভব করিতে পারিলাম না।

গুরু। মুক্ত হইলে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকে, আমরা বদ্ধজীব, তাহা কি প্রকারে অনুভব করিতে পারিব? তবে শাস্ত্রকারেরা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সুপ্তিসমাধ্যোর্ব্রহ্মরূপতা।—সাংখ্য।

জীব সুপ্তিকালে ও সমাধিকালে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, সুসুপ্তি—অর্থাৎ স্বপ্নহীন নিদ্রাকালে মানুষ যখন সুখ-দুঃখাদি বর্জ্জিত থাকে,—মুক্তি হইলেও জীব সুখ-দুঃখাদি বর্জ্জিত কেবল হয়। প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তি কালে আত্মা বা পুরুষ তমসাচ্ছন্ন থাকে, মুক্ত হইলে সে আবরণ থাকে না,—তখন অসঙ্গ চিৎস্বরূপ আত্মা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিত হন,—অর্থাৎ তখন আর তাঁহাতে কোনও প্রাকৃতিক ভাব প্রতিবিম্বিত হয় না। সেই কারণে সে অবস্থা কেবল—অর্থাৎ একরূপ। একরূপ বলিয়া গুণাতীত। আত্মার স্বভাব স্বভাবতঃই আনন্দঘন, সুতরাং মুক্ত হইলে আত্মা নির্ব্বিকার ও আনন্দঘন হন। সর্ব্ব

দুঃখমোচনাত্মক কৈবল্য মোক্ষেরই নামান্তর। এই কৈবল্য বেদান্তের মুক্তি এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ।

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন,—

তেন নিবৃত্তপ্রসবমর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ॥

সাংখ্য-কারিকা।

"বিবেক জ্ঞান" উৎপন্ন হইলে, তাহার প্রভাবে প্রকৃতির প্রসবশক্তি নিবৃত্তা হয়—অর্থাৎ যে আত্মার প্রকৃতি দর্শন হয়, প্রকৃতি আর সে আত্মার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য জ্ঞানাজ্ঞান প্রসব করেন না। সুতরাং আত্মা তখন রজঃ, তমঃ, কি অন্য কোন গুণে কলুষিত হন না। কেবল বা একক হন। প্রকৃতি তখন আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না—তিনি উদাসীন ভাবে প্রকৃতি দর্শন করেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ।

শিষ্য। মুক্তি যদি ঐরূপ হয়, তবে ঈশ্বরের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ থাকে?

গুরু। কথাটা আরও পরিস্কার করিয়া বল।

শিষ্য। প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন হওয়াই যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে

ঈশ্বরের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ? ঈশ্বর থাকুন, না থাকুন, তাহাতে জীবের কিছু আসিয়া যায় না—ঈশ্বরোপাসনাতেও জীবের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুরু। ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত মুক্তি হয় না।

শিষ্য। দর্শনশাস্ত্র মতে দুঃখবর্জ্জিত বা কেবল হওয়া মুক্তি।

গুরু। এই কেবল হওয়া ঈশ্বরোপাসনার ফল।

যোগের দ্বারা যে ফললাভ হয়, তাহা ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্য প্রকৃতিরই কার্য্য। রস ঈশ্বরস্থানীয়। পূর্ণ রস, পূর্ণানন্দ বা পরিপূর্ণ চৈতন্ত ঈশ্বর; জীব তদংশ *। সূর্য্যকিরণের সহিত সূর্য্যের যেরূপ অংশাংশী ভাব, জীবের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ অংশাংশী ভাব। এই জন্ত ঈশ্বরও নিত্য, জীবও নিত্য এবং অবিনাশী। ঈশ্বরের সহিত জীবের সেব্য-সেবক, প্রভু-ভৃত্য, অথবা পতি-পত্নীর ন্যায় ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাব ব্যবস্থাপিত আছে। ঈশ্বরে জীব-প্রলয় হয় না। কিরণ যেমন সূর্য্যে ফিরিয়া যায় না, সেইরূপ জীবও ঈশ্বরে প্রলীন হয় না। কিন্তু কিরণ যেমন সূর্য্যমণ্ডলের পার্শ্ব পরিত্যাগ করে না,—মুক্ত আত্মাও তদ্রূপ ঈশ্বরের পার্ষদ হয়।

শিষ্য। আর মহাপ্রলয়ে?

গুরু। মহাপ্রলয়ে বদ্ধ আত্মার ন্যায় মুক্ত আত্মাও ঈশ্বরে অব্যক্তাবস্থায় থাকে। কিন্তু বদ্ধ আত্মার বিপাক থাকে, মুক্তাত্মা আনন্দময়।

শিষ্য। নির্ব্বাণমুক্তি কাহাকে বলে?

গুরু। বিলীন ভাবকেই নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। এতন্মতে নির্ব্বাণ মুক্তি অনাস্বাদিত মধুবৎ।—অর্থাৎ যে কখনও মধু খায় নাই, তাহার নিকট যেমন মধুর আস্বাদ একটা 'কি জানি কি,' নির্ব্বাণ বা

* তদংশা জীবসঙ্কাঃ।—রামানুজ।

নিবিয়া যাওয়া তাই। ফল কথা, যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই,—যে আত্মা অজর অমর, * তাহা নিবিয়া যাইবে কি প্রকারে?

ঈশ্বর আনন্দঘন। জীব প্রকৃতির বন্ধন ছেদন করিয়া গুণাদি বিবর্জ্জিত ও কেবল হইয়া ঈশ্বরসান্নিধ্যে সেই আনন্দোপভোগ করেন, দুঃখ তখন তাঁহার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর।

শিষ্য। ঈশ্বর কি, এ তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে না পারিলে, ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, তাহা হৃদ্গত করা কঠিন। অতএব ঈশ্বর কি, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। বদ্ধ জীব ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ নহে। কেন না, জীব যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ঈশ্বর জানিতে পারে, তবে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে। জীব জ্ঞাতা, এবং ঈশ্বর জ্ঞেয়। জ্ঞাতার জ্ঞানে যদি ঈশ্বর প্রতিভাত হন, তবে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে।

শিষ্য। তবে কি ঈশ্বর জানিতে চেষ্টা করা উচিত নহে?

---

* নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ২য় অঃ ২৩—২৪।

গুরু। উচিত অবশ্যই, কিন্তু সেই জ্ঞানোপদেশের অধিকারী হইতে হইবে।

শিষ্য। সেরূপ অধিকারী হইতে হইলে কি করিতে হয়?

গুরু। শাস্ত্র বলেন—

বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলঃ স্বান্তসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা॥—বেদান্তসার।

যথাবিহিত প্রণালীক্রমে বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত বেদার্থ-বিষয়ে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ হইয়া এই জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া,—অর্থাৎ কোন ফললাভ প্রত্যাশায় পুত্রেষ্টাদি ক্রিয়া এবং নরকাদি অনিষ্টসাধন ব্রহ্মহননাদি ক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য-নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপবিহীনতাজনিত নিতান্ত নির্ম্মলচিত্ত, শমাদি চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পন্ন, ঈদৃশ সর্ব্বসদ্‌গুণাক্রান্ত ব্যক্তিই জ্ঞানোপদেশের অধিকারী।

শিষ্য। তবে কাহারও ভাগ্যে কি সে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে না?

গুরু। কেন, বলিলাম ত, জন্মজন্মান্তরের কর্ম্ম বা সাধন-ফলে সে তত্ত্ব সহজেই জীবের জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে। তখন যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ-প্রয়োগ কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

শিষ্য। শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলেন।

গুরু। শাস্ত্র বলেন,—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

পাতঞ্জলদর্শন।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যাবন্ত সংসারী আত্মা ও যাবন্ত মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক্ বা স্বতন্ত্র—তিনি ঈশ্বর।

ইহা ঈশ্বর-সম্বন্ধে সম্যক্ কথা নহে। তবে ঈশ্বর কি, তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য না হইলে তৎপ্রতি বিশিষ্ট ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই পরমকারুণিক মহাযোগী পতঞ্জলি সেই ভাবরূপী পরমগুরু পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। ভাবুক না হইলে পতঞ্জলির ঐ অত্যল্প উপদেশ দ্বারা হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ আরূঢ় হইতে পারে না।

শিষ্য। ক্লেশ কাহাকে বলে?

গুরু। অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ,—এই পাঁচ প্রকার মনোধর্ম্মের নাম ক্লেশ।

'আমি, আমার, আমার ছেলে, আমার বাড়ী' ইত্যাদি যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহার নাম অবিদ্যা। ফলকথা, যাহা যাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা।

জীব যে বুদ্ধিকে অথবা চিত্তকে স্বরূপ চৈতন্য হইতে পৃথক্ জানে না, বুদ্ধির প্রতি বা চিত্তের প্রতি যে 'আমি' জ্ঞান আরোপিত হইয়া আছে, সেই "আমি" ও "আমার" ইত্যাকার প্রতীতির নাম অস্মিতা।

ভোগ-কামনাকে রাগ বলে।

দুঃখ না হয়, এই ইচ্ছাতে হৃদয়ে যে প্রতিঘাত-চেষ্টা হয়, তাহাকে দ্বেষ বলে। এই দ্বেষ হইতে ক্রোধাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বার বার মরণ-দুঃখ * ভোগ করায় চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার বা

* যদিও মরণ বিস্তৃতি, তথাপি যাতায়াতরূপ কষ্ট।

বাসনা সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। সেই সমস্ত বাসনার নাম স্বরস। সেই স্বারস্যের দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমুদয় জীবেরই চিত্তে সেই প্রকার ভাব—অর্থাৎ মরণ-দুঃখের ছায়াস্বরূপ বা অনুকৃতিস্বরূপ ভাব-বিশেষ নিহিত আছে। সেই দুর্লক্ষ্য বৃত্তিবিশেষের নাম অভিনিবেশ।

শিষ্য। কর্ম্ম কি?

গুরু। জীব যাহা অনুক্ষণ সম্পাদন করিতেছে। ধর্ম্মকার্য্য এবং অধর্ম্মকার্য্য উভয়ই কর্ম্ম।

শিষ্য। বিপাক কাহাকে বলে?

গুরু। কর্ম্মফল,—যাহা শরীরে সুখদুঃখাদি ভোগ নামে পরিচিত।

শিষ্য। আশয় কি?

গুরু। সংস্কার।—অর্থাৎ কর্ম্ম করার পর চিত্তে যে কৃত-কর্ম্মের ভাব আহিত হয়, তাহা সংস্কার।

এ সমুদয় জীবে আছে। ঈশ্বরে নাই। ফল কথা, "ঈশ্বর জীবের ন্যায় ক্লেশভাগী নহেন, তিনি সর্ব্বক্লেশ-বিমুক্ত। জীবের ন্যায় তাঁহার ফলভোগ হয় না। তাঁহার সুখ দুঃখ, জন্ম ও আয়ু ভোগ হয় না। তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। সংসারী আত্মা যেমন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় বাসনা নামক সংস্কারের বশীভূত—তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অচিত্ত; তন্নিমিত্ত তিনি বাসনা-রহিত। জন্য জ্ঞান ও জন্য ইচ্ছার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানের ও স্বাভাবিক ইচ্ছার তুলনা হয় না। তিনি এক, অসাধারণ, অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত ও দেহাদি রহিত আত্মা বা পরম পুরুষ।"

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজম্।* পাতঞ্জলদর্শন।

"তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ,—অর্থাৎ তাঁহাতে

* সর্ব্বজ্ঞত্বস্য যৎ বীজং জ্ঞাপকং নিরতিশয়ং জ্ঞানং তত্র তস্মিন্ ভগবতি অস্তী-

সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে। অন্য আত্মায় তাহা নাই। ফলিতার্থ এই যে,—তিনি ভক্ত সাধকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশ পান। তাঁহার স্বরূপ অন্যের বোধগম্য করাইতে হইলে, অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। সে অনুমান এইরূপ,—সকল আত্মাতেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। সকল আত্মাই কিছু না কিছু অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বুঝিতে পারে। কেহ অল্পজ্ঞ, কেহ বা তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ। আবার তাহাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আত্মাও আছে। মনে কর, যাঁহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আত্মা আর নাই, তিনিই পরমগুরু পরাৎপর পরমেশ্বর। যেমন অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু, আর বৃহত্ত্বের চরম সীমা আকাশ, সেইরূপ জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব, এবং তাহার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।"

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেননাবচ্ছেদাৎ। †

পাতঞ্জলদর্শন।

"তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তাদিগেরও গুরু—অর্থাৎ উপদেষ্টা। তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন ;—অর্থাৎ সকল কালেই তাঁহার অস্তিত্ব। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগের স্রষ্টা ও উপদেষ্টা। ব্রহ্মাদির জন্ম ও বিনাশ আছে, কিন্তু তাঁহার জন্ম ও বিনাশ নাই। তিনি অনাদি ও অনন্ত। সেই অনাদি অনন্ত আদিপিতা পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া তাঁহাকে

ত্যনুমীয়তে। যত্র নিরতিশয়ং জ্ঞানং তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বমিতি নিরতিশয়জ্ঞানবত্ত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্ব-সিদ্ধেস্তেনৈব রূপেণ তস্যানুমানমিতি দিক্। নিরতিশয়ত্বং কাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বম্।

† সঃ ভগবান্ পূর্ব্বেষাং আদ্যানাং স্রষ্টৄণাং ব্রহ্মাদীনাং অপি গুরুঃ উপদেষ্টা, যতঃ স কালেন নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ। ব্রহ্মাদীনাম্ত্বাদিমত্ত্বাদস্তি কালেনাবচ্ছেদঃ।

বেদ—অর্থাৎ সৃজন জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি সর্ব্ব-স্রষ্টা, সকলের নিয়ন্তা ও পাতা।

শিষ্য। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা বলিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছেন—প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বাদি জাত। ইহার মীমাংসা কি, তাহা আমাকে বলুন ?

গুরু। পরিণামিনী প্রকৃতিই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশ্ব-সৃষ্টির বীজ ঈশ্বর। যথা—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত! ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"হে ভারত! মহৎপ্রকৃতি গর্ব্ভাধান-স্থান, আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়। হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক * মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎপ্রকৃতি সেই মূর্ত্তিসমুদয়ের যোনি (মাতৃস্থানীয়), আমি বীজপ্রদ পিতা।"

অতএব ঈশ্বর সকলের সব, সবের সকল।

---

* সৃষ্ট পদার্থসমূহের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভাজ্য—স্থাবর ও জঙ্গম। জঙ্গমের আবার দুইভাগ—জীব ও উদ্ভিদ। ইহাদিগের যথাক্রমে ইংরাজী নাম Mineral, Vegitable, Animal। প্রত্যেক ভাগের আবার বিভাগ, উপবিভাগ, জাতি, শ্রেণী প্রভৃতি অসংখ্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সগুণ ঈশ্বর।

শিষ্য। ঈশ্বর সগুণ, কি নির্গুণ, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। ঈশ্বর সগুণ, কিন্তু তথাপি গুণাতীত, যেহেতু তিনি গুণের অধীন নহেন।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না, এবং ঐ সকল নিবৃত্তি হইলেও অভিলাষ করেন না, যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন হইয়া সুখ-দুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচলিত হন না, প্রত্যুত গুণ সকল স্বকার্য্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদায়ের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন; যিনি সমদুঃখ-সুখ,

আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্; যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন; যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই একরূপ; যিনি আত্মনিন্দা, আত্ম-প্রশংসা তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন; যিনি মান ও অপমান এবং শত্রু ও মিত্র তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন, এবং যিনি সর্ব্বত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ।"

অতএব ঈশ্বরই গুণাতীত। তিনি সগুণ হইয়াও গুণাতীত; কেননা, গুণের দ্বারা তিনি ক্রিয়াপর নহেন; গুণ তাঁহাতে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে।

শিষ্য। তবে কি নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বর পৃথক্?

গুরু। যেমন এক অগ্নি হইতে অগ্ন্যন্তর। দীপ-শলাকায় যেমন অব্যক্ত আলোক নিহিত থাকে, তাহাকে জ্বালিলেই সে যেমন আলো প্রকাশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম অব্যক্ত, এবং ঈশ্বর ব্যক্ত। কিন্তু দীপশলাকাস্থ অব্যক্ত আলোক আপনি ব্যক্ত আলোক রূপে প্রকাশ পায়,—অর্থাৎ সে জ্বলিয়া আলোক হয়, ব্রহ্ম নিত্য বস্তু, তিনি থাকেন, তাঁহা হইতে ঈশ্বর হন।

আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

মনুসংহিতা।

"বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অবস্থা, তাহা অপ্রজ্ঞাত, অপ্রতর্ক্য, অলক্ষণ (লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ হয় না) এবং বাক্য-মনের অতীত।"

সৃষ্টির অতীত সেই অবস্থাকে নির্গুণ বলা হইয়া থাকে। এই নির্গুণ, নিরাকার, বাক্য-মনের অতীত ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু—অর্থাৎ সৃষ্টি-ইচ্ছুক হইলেন, তখনই তিনি বিকারবান্ ও সগুণ হইলেন। কেন না,

ইচ্ছা হইলেই গুণ হইল, এবং যে অবস্থায় ছিলেন, তাহার বিকৃতি হইল। এই যে অবস্থা, ইহাই ঈশ্বর।—অর্থাৎ সৃষ্টির অতীত হইয়া যিনি নির্গুণ ও নিরাকার ভাবে অবস্থিত ছিলেন, সৃষ্টিকরণেচ্ছাযুক্ত হওয়াতে তিনিই সগুণ ও সাকার হইলেন, তথাপি সেই নিত্য ব্রহ্ম রহিলেন। যেহেতু তিনি নিত্য। এই অবস্থাটুকু ভাব-জ্ঞেয়। আবার নির্গুণই সগুণ হইলেন,—ইহাও ভাব-জ্ঞেয়।

যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥

মনুসংহিতা।

"যিনি পূর্ব্বে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় হইয়া অব্যক্ত ও অচিন্ত্যভাবে অবস্থিত ছিলেন, তিনিই ব্যক্তীকৃত হইয়া স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন।"

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ স পুরুষবিধঃ।—শ্রুতি।

"এই আত্মাই অগ্রে ছিলেন, তিনিই পুরুষবিধ—অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় শিরঃপাণ্যাদি অবয়ববিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইলেন।"

শিষ্য। ঈশ্বর কি আমাদের ন্যায় অবয়ব-বিশিষ্ট ?

গুরু। শাস্ত্র বলেন,—

কর্ত্তৃত্বসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য শরীরসিদ্ধিঃ স্বত এব জাতা।
ঘটস্য কর্ত্তা খলু কুম্ভকারঃ কর্ত্তা শরীরী ন চ নাশরীরী ॥

শতদূষণী।

যখন সৃষ্টিকার্য্যে কর্ত্তা পুরুষকে মানা যায়, তখন তাঁহার শরীরসিদ্ধি সহজেই উপলব্ধি হয়। তাঁহাকে সগুণ বলিয়া মানিলে, গুণের আশ্রয় না মানিলে চলিবে কেন ? লিঙ্গ-শরীর, স্থূল-শরীর বা কারণ-শরীর বলিতে পার।—আশ্রয়-স্থানকেই শরীর বলে।

পূর্ব্বাবস্থোত্তরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যুপগমাৎ।

শাঙ্করভাষ্য।

পূর্ব্বাবস্থা যদ্রূপ হয়, উত্তরাবস্থায় তদ্রূপ হইয়া থাকে। নামরূপময় জগৎ যাঁহা হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাহার নামরূপ না থাকিলে রূপময় জগৎ কি প্রকারে রূপ ধারণ করিতে পারিত?

ঈশ্বর সগুণ হইয়া প্রথমে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণে তিন বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন।

এক এব ত্রয়ো দেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।

এক দেব ঈশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

কেবল মাত্র যে, এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিকেই তিনি ধারণ করিলেন, তাহা নহে।

সোঽকাময়ত অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়।—শ্রুতি।

তিনি কামনা করিলেন,—"আমি বহু প্রজা হইব।"—তাহাতেই তিনি বহু বিগ্রহ ধারণ করিলেন।

সর্ব্বান্ পাপান্ ঔষৎ।

ভয়রতিসংযোগশ্রবণাচ্চ॥—শ্রুতি।

শরীরধারীর ন্যায় কাম-ক্রোধ-ভয় সকলই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহা কেবল সৃষ্টির রক্ষার্থ, পালনার্থ ও সংহারার্থ।

একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্যকর্ম্মপ্রবৃত্তিজঃ।

দেবাদিভেদমধ্যাস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

সেই একই দেব বাহ্যকর্ম্মসম্পাদন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে

দেবাদি আবরণে আবৃত হইলেন। এবং দেবতা হইয়া দেবতান্তরভাব গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সাধকভাবাপন্ন জীবের যাহাতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়, যাহাতে সৃষ্টের জন্মসাফল্য সম্পাদন হয়, তাহা করিলেন। তাহার জন্য—

ব্রহ্মণোরূপকল্পনাঃ। *— যমদগ্নিসংহিতা।

ব্রহ্ম আপনাকে বহুবিধ রূপে কল্পিত করিলেন।

অগ্নির্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ॥

কঠোপনিষৎ।

অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রকার সেই এক ও সর্ব্বভূতাত্মা বহির্ভাবে নানারূপ গ্রহণ করিলেন।

অতএব, ইচ্ছাময় ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি ও সৃষ্ট-পদার্থের জন্য নির্গুণ হইয়াও সগুণ হইয়াছেন, নিরাকার হইয়াও সাকার হইয়াছেন।

---

* কৃদন্ত কল্পনা শব্দের যোগে কর্ত্তৃ-কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া "ব্রহ্মণঃ" এইরূপ পদ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের রূপ কল্পনা এইরূপ না হইয়া, ব্রহ্ম আপনাকে অনেক-রূপ কল্পনা করিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য।

শিষ্য। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহা হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছি। তবে বোধ হয় ঐ মূলতত্ত্বগুলি আগে বুঝিয়া না লইলে, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে গোল হইবে বলিয়া আপনি ঐ সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিলেন?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। এক্ষণে আমার পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তর দিয়া বাধিত করুন।

আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে যে, আমি পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি, আমাদের সমাজে রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ত্রিবিধ মত প্রবর্ত্তিত আছে। বঙ্কিমবাবু প্রমুখ রাধাহীন কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেন,—তান্ত্রিক, বৈদিক ও ব্রহ্মবাদিগণ (ব্রাহ্ম) কৃষ্ণকে আদৌ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না এবং বৈষ্ণবগণ রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির উপাসক।

এক্ষণে জানিতে চাহি, কৃষ্ণ ঈশ্বর কি না?

গুরু। প্রথমে তোমার নিকটে আমি জানিতে চাহি, তুমি ঈশ্বরের অবতার-গ্রহণ বিশ্বাস কর কি না?

শিষ্য। হাঁ, আমি সে কথা বিশ্বাস করি। তবে বিধর্ম্মিগণ বিশ্বাস করিবে কি না, সন্দেহ।

গুরু। বিধর্ম্মী কাহাদিগকে বলিতেছ ?

শিষ্য। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। যথা—মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি।

গুরু। মুসলমান, খৃষ্টিয়ান বা বৌদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই ঈশ্বরের অবতার-গ্রহণ স্বীকার করিতে হয়। সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরের অবতার আছে। খৃষ্টিয়ানের যীশু, মুসলমানের মহম্মদ, বৌদ্ধের বুদ্ধ ;—এইরূপ সকল ধর্ম্মেই অবতার আছে। হিন্দুর ঈশ্বরাবতার না মানিলে, তাঁহাদের অবতারও টিকেন না।

শিষ্য। বঙ্কিমবাবুও সে কথা বলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতার গ্রহণ করেন কেন ?

গুরু। সে কথা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন। যথা—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পরমকারুণিক পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"আমি জন্ম-রহিত, অনশ্বর-স্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।"

শিষ্য। ধর্ম্মসংস্থাপন কি? ধর্ম্ম কি মধ্যে মধ্যে সংস্থাপন করিতে হয়? আর যিনি স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, তিনি দুষ্ট বিনাশ ও শিষ্ট পালনার্থ জন্মগ্রহণ করিবেন কেন?

গুরু। জন্মগ্রহণ করা না করা, তাঁহার ইচ্ছাধীন। কেন না, তিনি ইচ্ছাময়—এবং ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাদির অতীত। আমাদের মত, তাঁহাতে জন্ম-জরার ক্লেশ নাই। তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাদি লইয়া যা কথা। কিন্তু এ কথা তোমাকে আর একবার বুঝাইয়াছি *। এ স্থলে সেই কথারই পুনরুল্লেখ করা গেল।

ধর্ম্ম অনাদি, অনন্ত—তাহা চিরকালই আছে, তবে ভগবান্ যুগে যুগে আবার কিসের সংস্থাপন জন্য অবতার গ্রহণ করেন? তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন,—যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। এখন ইহার এক একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখ। ধর্ম্মের বিপ্লব কি?

শিষ্য। আমার বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, মানবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম যখন অনুষ্ঠিত না হয়, বা বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তখনই ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হয়।

গুরু। দ্বাপরের অন্ত্যযুগে—পরাশর ব্যাস শৌনকাদি ঋষিগণের আমলে—রাজসূয়-অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের কালে—দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দের রাজত্বকালে এমন কি ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা ইংরেজী শিক্ষিত কুক্কুট-মাংসভোজী এবং তদনুকারী উচ্ছৃঙ্খল ম্লেচ্ছ-দাসত্ব-উপজীবী হিন্দুসন্তানগণের যুগে

* মৎকৃত রস-তত্ত্ব ও শক্তি-সাধনা গ্রন্থে।

উপস্থিত হয় নাই? তখন যদি ভগবানকে সেই বিপ্লব নিবারণার্থ অবতার গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তবে এখনও তাঁহার আসিবার সময় হয় নাই কেন?

শিষ্য। বুঝিতে পারি না।

গুরু। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের প্রথমযুগে মানবের জন্য যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা মানবের স্বনুষ্ঠিত ছিল, মানব তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে—পূর্ণতার বিপ্লব উপস্থিত হয়; দুকূল পূর্ণ হইলে তীরভূমি ভাসাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করে। মানব সত্যযুগের সেই আদি সময় হইতে যাগ-যজ্ঞ জপ-তপ প্রভৃতি করিয়া আসিয়াছিল,—দ্বাপরের মধ্যযুগে রসের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল,—তাই ভগবান্ রসের অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। তবে সেইদিন হইতে সকল মানবই রসতত্ত্বজ্ঞ হইল না কেন?

গুরু। তাহাও কি সম্ভব? সকল মানবই কি যাগ-যজ্ঞ ধর্ম্ম করিয়া আসিয়াছিল? কয়েকটি মানব তাঁহাকে রসের জন্য আহ্বান করিয়াছিল—কেহ কেহ ঐশ্বর্য্য চাহিয়াছিল—কেহ কেহ আপন আপন কাম-কামনা কলুষরাশি বুকে করিয়া দাবদগ্ধ মৃগের ন্যায় ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিতেছিল। যাহারা রসের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছিল,—যাহারা ঐশ্বর্য্যের জন্য ডাকিয়াছিল,—তাহারা পাইয়াছিল। তিনি না আসিলে তাহা মিলিত না। তিনি সাড়া না দিলে ভক্ত যে ডাকিয়া মারা যাইত। তাই তাঁহার অবতার গ্রহণ।

শিষ্য। ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন,—'সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুদিগের বিনাশের জন্য আমার অবতার'—তবে দুষ্কৃত বা অসাধুগণ বিনাশের আগুনে পুড়িয়া মরে নাই কেন? তিনিত বলিয়াছেন,—

সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশই আমার অবতারের উদ্দেশ্য। তবে দুষ্কৃত নিধন করেন নাই কেন? তাহা যদি করিতেন, তবে হয় ত কাম-কলুষিত হৃদয় লইয়া পথহারা পথিকের মত আমরা জন্ম জন্ম ঘুরিয়া মরিতাম না। তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য সাধন কি, কংস শিশুপাল বা অঘাসুর বকাসুর প্রভৃতি দুই চারিটি রাজা বা দৈত্য নিধন করিয়াই সম্পন্ন করিয়াছিলেন? আর যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতি দুই চারি জন আত্মীয় বা আশ্রিত প্রতিপালন করিয়াই কি সাধুগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন? আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।

গুরু। অনেকেই বুঝে না। বুঝে না,—ভাবে না বলিয়াই বুঝে না; বুঝিতে চেষ্টা করে না বলিয়াই বুঝে না। ভগবান্ সে কথা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন,—'আমি না জন্মিলে লোকে আদর্শ খুঁজিয়া পায় না। আমি অনন্ত—শান্ত, মানুষ আমার আদর্শ লইয়া কাজ করিবে কি প্রকারে? তাই আত্ম-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। যখন কতকগুলি প্রাণ সমুন্নত ধর্ম্মপ্রণালীর আকাঙ্ক্ষা করে,—তখনই যে আমাকে আসিতে হয়। ডাকিলে যে আমি থাকিতে পারি না। না আসিলে তাহারা যাহা চায়, তাহা পাইবে কোথায়?' লোকের আদর্শ হইতে—লোককে শিক্ষা প্রদান করিতে,—অনন্তদেব সান্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ভক্ত শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনের নিকটে অতি মধুর, অতি ওজস্বিনী, অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় সে তত্ত্ব-কাহিনী বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ; ৩য় অঃ, ২২—২৪ শ্লোঃ।

"হে পার্থ! দেখ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই; সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। হে পার্থ! যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদয় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে। অতএব, আমি কর্ম্ম না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইবে।"

এই বর্ণসঙ্কর কর্ম্মাভাব—আর ধর্ম্মাভাব মলিনতার হেতু। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ সমাপ্ত হইলে, শিশু যদি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের পাঠ না পায়, তবে কি তাহার শিক্ষায় মলিনতা জন্মে না? জীব-সমুদয় ক্রমোন্নতিশীল। ক্রম-উন্নতি চাহে। মানুষ এক জন্মের নহে। বহুজন্ম অতীত করিয়া সে আত্মোন্নতি বা জ্ঞানোন্নতি করিয়া আসিতেছে—কঠোর জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করিয়া তাহার জ্বলিতকণ্ঠ একবিন্দু রসের জন্য আকুল হইয়াছিল, তাই ভগবান্ পূর্ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। আপনি কি তবে বলিতে চাহেন, কৃষ্ণই সেই পূর্ণাবতার?

গুরু। নিশ্চয়!

শিষ্য। যাহা আপনি বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, কৃষ্ণ এক নব-ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য দ্বাপরের অন্ত্যভাগে আমাদের এই স্থূল

জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব, যাঁহারা বলেন,—ধর্ম্ম-রক্ষার্থে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন হইল, কিন্তু যাঁহারা আদৌ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ ঈশ্বর বলেন না, তাঁহাদিগের মত খণ্ডনার্থ কিছু বলুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর কি না ?

গুরু। তুমি বোধ হয় অবগত হইতে ইচ্ছা কর যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর কি না ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। ইহা জানিতে হইলে, আমাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইবে।

শিষ্য। সেই ধর্ম্মগ্রন্থ কি কি ?

গুরু। ঋষি-প্রণীত হিন্দুর প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি।

শিষ্য। ইহার মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ অত্যন্ত আধুনিক। সাম্প্রদায়িক মত লইয়া আধুনিক অনেক গ্রন্থকার আপন আপন আরাধ্য দেবতাকে পূর্ণতম বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—ভরসা করি, সে সকল গ্রন্থ হইতে আপনি কোন মতাদি উদ্ধৃত করিবেন না। যাহা সার্ব্বভৌমিক নহে, যাহা সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে, তাহার মত উদ্ধৃত করিলে সকলে মান্য করিবে না।

গুরু। অতি সুন্দর কথা। আমি যে সকল গ্রন্থ হইতে এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের প্রমাণ করিব, সেই গ্রন্থগুলি যে ঋষিপ্রণীত ও সমাজে

অসাম্প্রদায়িক রূপে বহুল প্রচলিত, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এক্ষণে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি, শোন,—

সর্ব্বশাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে, মীন, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার সকল, কেহ কলা অবতার, কেহ অংশ অবতার—পূর্ণাবতার কেহ নহেন। পূর্ণাবতার কেবল বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ *

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১ম স্কঃ, ২৮ শ্লোঃ।

সূত মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে তাপসগণ! যে সমস্ত (মীনকূর্ম্মাদি) অবতারের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত হইল, তম্মধ্যে কেহ ঈশ্বরের অংশ, কেহ কলা ও কেহ বিভূতি। কিন্তু সর্ব্ব-শক্তির নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর।"

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবসান হইলে, যুধিষ্ঠির অগণ্য প্রাণিবধের কারণ নিজেকে ভাবিয়া এবং তজ্জনিত পাপাক্রান্ত চিন্তা করিয়া মনে মনে ব্যথিত হইলেন, এবং কি উপায়ে সেই পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য শরশয্যাগত ভীষ্ম-সমীপে গমন করি-লেন। তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণবর্গ গমন করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া শরশয্যাগত ভীষ্মদেব তাঁহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে সেই সমবেত লোকমধ্যে ব্যক্ত করিলেন যে,—

* এতে চ পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কেচিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ কেচিৎ বিভূতয়শ্চ। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ এব। যতঃ যুগে যুগে লোকং মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি। কিম্ভূতং লোকং ?—ইন্দ্রারিব্যাকুলং দৈত্যারূপক্রান্তং॥

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১ম অঃ, ৩৯ শ্লোঃ।

"এই ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) জন্মরহিত হইয়াও স্বয়ং স্বনির্ম্মিত জীব-কুলের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন। একমাত্র ভাস্কর যেরূপ প্রত্যেক দৃষ্টিতে বহুধা প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ইনিও অধিষ্ঠানবিশেষে অনেকধা প্রকাশমান হয়েন। যাহা হউক, আমি ইহাঁকে লাভ করিলাম,—ইহাঁর দর্শনে মদীয় মোহ ও ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইল।"

অনন্তর ভীষ্ম মন, বাক্য এবং দৃষ্টিদ্বারা আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসংযোগ করিয়া উপরতি প্রাপ্ত হইলেন। *

বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্ম্মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
যস্যাজ্ঞয়া সৃষ্টিবিধৌ কূর্ম্মোঽনন্তং দধাতি চ।
স চ সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং লীলয়া চেশ্বরেচ্ছয়া।
যস্যাজ্ঞয়া মহাভীতা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা॥
ধরা সা সর্ব্বশস্যাঢ্যা রত্নবাংশ্চ হিমালয়ঃ।
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ ধ্যায়তে যমহর্নিশং॥
যং ধ্যায়তে চ ভজতে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিবঃ।
সহস্রবক্ত্রো যং স্তৌতি ধ্যায়তে ভজতে সদা॥

* শ্রীমদ্ভাগবত ;—গোষ্ঠবিহারি আঢ্য কৃতানুবাদ।

স্বয়ং সরস্বতী স্তৌতি যমীশ্বরমভীপ্সিতং।
সেবন্তে পাদপদ্মঞ্চ স্বয়ং পদ্মালয়া পিতঃ॥
মায়া ভীতা চ যং স্তৌতি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
স্তুবন্তি বেদাঃ সন্ততং সাবিত্রী বেদমাতৃকা॥
সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ যোগীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ।
রাজেন্দ্রাশ্চাসুরেন্দ্রাশ্চ সুরেন্দ্রা মনবস্তথা॥
ধ্যায়ন্তে চ ভজন্তে চ ভক্তাঃ সন্তো হি সন্ততং।
কেচিদ্বদন্তি যং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনং॥
কেচিৎ প্রধানং সর্ব্বাদ্যং কেচিত্তু জ্যোতিরীশ্বরং।
কেচিত্তু সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং॥
কেচিৎ স্বেচ্ছাময়ং রূপং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং।
কেচিৎ সুরুচিরং শ্যামসুন্দরং সুমনোহরং॥
সানন্দং পরমানন্দং গোবিন্দং নন্দনন্দনং।
ভজ তাত পরং ব্রহ্ম স্মর শশ্বৎ সুরেশ্বরং॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র; ৩ অঃ, ৩৬—৪৬।

"ইন্দ্র জল দান করিতেছেন, অগ্নি দহন করিতেছেন, এবং জন্তু-মধ্যে মৃত্যু হইতেছে, এবং যে ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে সৃষ্টি-প্রক্রিয়াতে কূর্ম্ম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন। সেই পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ থাকিয়া সকলের রক্ষাবিষয়ে লীলা-বিলাস করিতেছেন, এবং তাঁহার ইচ্ছায় বসুন্ধরা মহাভীতা ও সকলের আধার হইয়াছেন। এবং সেই পৃথিবী সর্ব্বশস্য-সম্পন্না হইয়াছেন, হিমালয় রত্নবান্ হইয়াছেন, ভগবান্

বিধাতা স্বয়ং অহর্নিশি তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবও স্বয়ং যাঁহার ধ্যান ও ভজনা করিতেছেন, সহস্রবদন অনন্তও সর্ব্বদা যাঁহার ধ্যান ও ভজনা করেন। সরস্বতী দেবীও যে অভীষ্ট দেবের স্তব করেন, হে পিতঃ! পদ্মালয়া লক্ষ্মীও স্বয়ং যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন, মায়া শক্তি ভীত হইয়া যাঁহার স্তব করেন, এবং দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ও চতুর্ব্বেদ বেদমাতা সাবিত্রীও যাঁহার স্তব করেন। এবং সিদ্ধশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, সনকাদি যোগিশ্রেষ্ঠ, রাজশ্রেষ্ঠ, অসুরশ্রেষ্ঠ, সুরশ্রেষ্ঠ সকলে এবং চতুর্দ্দশ মনু—ইহাঁরা সর্ব্বদা যাঁহাকে স্তব করেন, এবং সাধুভক্তগণ নিরন্তর যাঁহার ধ্যান ও ভজনা করেন, এবং যাঁহাকে কেহ সনাতন ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—তাঁহাকে কেহ সকলের আদি, কেহ প্রধান কেহ জ্যোতির্ম্ময়, কেহ সর্ব্বরূপী এবং কেহ সর্ব্ব কারণের কারণ বলিয়া ব্যক্ত করেন। কেহ তাঁহাকে ভক্ত-জনের অনুগ্রহার্থে স্বেচ্ছাময় রূপধারী বলেন; কেহ সুরুচির শ্যামসুন্দর সুমনোরম সানন্দ পরমানন্দ গোবিন্দকে নন্দ-নন্দন কহেন। হে পিতঃ! সেই অমরকুলের অধীশ্বর, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে কায়-মনোবাক্যে স্মরণ ও ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হও।"

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতং।
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞ ষট্চক্রঞ্চাখ্যং বিভাব্য চ॥
কুণ্ডলিন্যা স্বশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরং।
সহস্রদলপদ্মস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুং॥
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌশেয় বাসসং।
সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভং॥

নারদপঞ্চরাত্র; ৩অঃ, ৭০—৭২।

"মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞানামক ষট্‌চক্র হৃদয়-মধ্যে ভাবনা করিয়া, স্বশক্তির ও কুণ্ডলিনীর সহিত সহস্রদলপদ্মস্থিত পরমাত্মার প্রভুকে হৃদয়-মধ্যে ধ্যান করিলেন। (তখন)—দ্বিভুজ এবং পীত-কৌশেয়-বস্ত্রপরিহিত, ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, সুন্দর ও বিশুদ্ধ এবং নবীন মেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয়-মধ্যে দর্শন করিলেন।"

"মহাত্মা জনার্দ্দন গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ধেনুগণের পরিত্রাণ করিলে, দেবরাজের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি তখন হৃষীকেশের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর তিনি বারিহীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গ ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক ভূলোকে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তেজঃপুঞ্জবপু গোপ-শিশু-বেশধারী নারায়ণ বিরলে গোবর্দ্ধনগিরির একদেশে শিলাতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং পন্নগাশন বৈনতেয় গরুড় অন্তর্হিত-ভাবে পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি ছায়াবিধান করিতেছে। সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছন ঘনশ্যামকায় লোকবৃত্তান্তদর্শী বাসুদেবকে দেখিয়া ইন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি মুহূর্ত্তকাল সহস্র চক্ষে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া লজ্জিত হইলেন। পরে ঐরাবত হইতে অবতীর্ণ হইয়া তৎসকাশে গমন করিলেন।

তিনি জনার্দ্দনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া সুমধুর স্বরে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো কৃষ্ণ! আমার আজ্ঞানুসারে প্রলয়-মেঘসকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, যখন তুমি অনুরাগ বশতঃ গোধনদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার বিলক্ষণ কর্ম্মগৌরব প্রকাশিত হইয়াছে। আমিও পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। স্বায়ম্ভুব যোগবলে গগনমার্গে গৃহবৎ এরূপে গোবর্দ্ধনধারণ কাহার না

বিস্ময়কর? আমার মহোৎসব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া আমি রোষবশতঃ সপ্তাহ যাবৎ এরূপ জলবর্ষণ করিয়াছি। তুমি না হইলে কি দেবতা, কি অসুর, কেহই এ বর্ষণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইত না। তুমি পরদেহ ধারণপূর্ব্বক মৎপ্রতি কুপিত হইয়াও যে, স্বীয় পূর্ণতা গোপন করিয়াছ, তাহাতে আমি পরম উপকৃত হইলাম। অধুনা দেবকার্য্য একপ্রকার সম্পন্নপ্রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, তুমি যখন নরভাবে এরূপ ক্ষমতা ধারণ করিতেছ, তখন দেবকার্য্য নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তুমি সুরবৃন্দের নেতা;—তোমাদ্বারা কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেরই সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তোমার ন্যায় ভারবহন-সামর্থ্য আর কাহারও নাই। ধাতু মধ্যে স্বর্ণ যেমন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পদ্মযোনি তোমাকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন পঙ্গুব্যক্তি দ্রুতগামীর অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ ভগবান স্বয়ম্ভূও কি বুদ্ধি, কি বয়স কিছু-তেই তোমার অনুগমনে সমর্থ নহেন। যেমন পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, এবং পক্ষীর মধ্যে গরুড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সুর-বৃন্দের মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রধান। সকলের নিম্নে পাতাললোক, তদুপরি পর্ব্বত। পর্ব্বতের উপর বসুমতী, বসুমতীর উপর মনুষ্য। মনুষ্যের উপর আকাশ, আকাশের উপর আদিত্য-লোক। সেই আদিত্য-লোকের উপর বিমানচারী সুরলোক বিদ্যমান। তুমি সেই সুরবৃন্দের ইন্দ্রত্বপদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। ঐ সুরধামের উপরে সত্য-ধাম বিরাজ করিতেছে। ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় নিবসতি করেন। উহা চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণেরও বিচরণস্থান। *সেই ধামের উপর গোলোক। সাধ্যগণ উহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। গোলোক মহা-কাশময় ও সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তোমার তপোময় গতি তাহাও অতিক্রম

করিয়াছে। এমন কি পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা তাহার অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হই নাই। পাপকর্ম্মাগণের নাগ-লোক; যাহারা কর্ম্মশীল তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র ভূলোক; যাহারা বায়ুসদৃশ অস্থির, তাহাদিগের আকাশ লোক; যাহারা শমাদিগুণে অলঙ্কৃত হইয়া সুকৃতকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের স্বর্গলোক; এবং যাহারা ব্রহ্মতপশ্চরণ-নিরত, তাহাদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয়। কিন্তু কি তপস্যা, কি অন্যান্যবিধ উপায় কিছুতেই গোলোকলাভের আশা নাই। তুমি অবতীর্ণ হওয়াতেই সেই গোলোকধাম তৎসহ ভূতলে সমাগত হইয়া অবসন্ন হইতেছিল; আবার তুমিই উপদ্রব সকল নিবারণ করিয়া তাহার রক্ষা করিলে।" *

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে—যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অর্ঘ্যদান করিবার সময় জ্ঞানপ্রবৃদ্ধ পিতামহ মহামতি ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সমস্ত দেশের রাজন্যবৃন্দ সমাগত, কাহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্যপ্রদান করা যায়? যিনি সকলের বরেণ্য, সকলের পূজনীয় ও জ্ঞানে মানে ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই প্রথমার্ঘ্য প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র।"

শান্তনু-তনয় বীর্য্যবান্ ভীষ্ম বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বৃষ্ণিকুল-সম্ভূত কৃষ্ণকে ভূমণ্ডলমধ্যে প্রধান অদ্বিতীয় বিবেচনা করিলেন; কহিলেন,—"যেমন সমুদায় জ্যোতিঃপুঞ্জমধ্যে ভাস্কর সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বান্, তদ্রূপ ইনি এই সমস্ত রাজগণের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম দ্বারা সমধিক উদ্ভাসমান প্রতীয়মান হইতেছেন। সূর্য্যহীন প্রদেশে সূর্য্যোদয় হইলে এবং নির্ব্বাত স্থানে বায়ু সঞ্চার হইলে যেরূপ হয়, কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের এই সভামন্দিরও তদ্রূপ উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত

* হরিবংশ;—বসুমতী কার্য্যালয়ের প্রকাশিত।

হইয়াছে।" অনন্তর প্রতাপবান্ সহদেব ভীষ্ম কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে সেই বৃষ্ণি-কুমারকে প্রধান অর্ঘ্যপ্রদান করিলেন।

ইহাতে এক মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের এই সম্মান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি এ জন্য ভীষ্মকে, যুধিষ্ঠিরকে ও কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। এবং ক্রোধে অধীর হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। সত্ত্বগুণাবলম্বী যুধিষ্ঠির যজ্ঞ-বিঘ্নাশঙ্কায় শিশুপালকে স্তব-বিনয় করিয়া সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলে, কুরুপিতামহ ভীষ্ম জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—

"সকল লোকমধ্যে বৃদ্ধতম কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অভিমত হয় না, এতাদৃশ ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত। রণকারি-শ্রেষ্ঠ যে ক্ষত্রিয়-পুরুষ কোন ক্ষত্রিয়কে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক বশ-বর্ত্তী করিয়া পরিত্যাগ করেন, তিনি তাহার গুরু হন। যদুনন্দনের তেজঃপ্রভাবে সংগ্রামে পরাভূত না হইয়াছেন, এই রাজসমাজে আমি এমন একজন মহীপালকেও দেখিতে পাই না। এই মহা-বাহু অচ্যুত কেবল আমাদিগেরই অর্চ্চনীয় নহেন, ইনি ত্রৈলোক্যেরও প্রধান অর্চ্চনীয়; কারণ অনেকানেক ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ সমরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছেন, এবং সমগ্র বিশ্বই ইহাঁতে সর্ব্বতোভাবে প্রতি-ষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব, বৃদ্ধবৃন্দ বিদ্যমান থাকিতেও আমি কৃষ্ণকেই অর্চ্চনা করিলাম, অপর সকলকে হে রাজন্! তদ্বিষয়ে তোমার এরূপ উক্তি করা উচিত হয় নাই, এতাদৃশ বুদ্ধি আর যেন কদাচ না হয়। আমি অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ লোকেরই উপাসনা করিয়াছি, সমাগত সেই সকল সজ্জনগণের কথাপ্রসঙ্গেই গুণরাশি শ্রীকৃষ্ণের সাধুসম্মত অনন্তগুণসমূহ শ্রবণ করিয়াছি; অপিচ, এই ধীসম্পন্ন

মহাপুরুষ জন্মাবধি যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের কীর্ত্তনও বহুবার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। অহে চেদিরাজ! সকল ভূমণ্ডলে সাধুগণ-সমর্চ্চিত সর্ব্বভূত-সুখাবহ জনার্দ্দনকে আমরা কেবল ইচ্ছানুসারে অথবা সম্বন্ধ কি উপকারের অনুরোধে অর্চ্চনা করি, এরূপ কদাচ মনে করিও না। ইহাঁর যশ, শৌর্য্য ও জয়বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিয়াই আমরা ইহাঁকে পূজা করিয়া থাকি। এই সভামধ্যে অত্যন্ত বালক হইলেও কোন ব্যক্তিকে আমরা পরীক্ষা না করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই, পরন্তু গুণবৃদ্ধ মানবগণকেও অতিক্রম করিয়া হরিই আমাদিগের মতে প্রধান অর্চ্চনীয় হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়-দিগের মধ্যে সমধিক বলশালী, বৈশ্যদিগের মধ্যে প্রচুর ধন-ধান্য-সম্পন্ন এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিই পূজনীয় হন; পরন্তু গোবিন্দের পূজ্যতা বিষয়ে বেদবেদাঙ্গ-বিজ্ঞান ও অধিক বল, এই দুইটি হেতু সমবেত হইয়াছে; কারণ, মনুষ্যলোকমধ্যে কেশব অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন? দান, দাক্ষিণ্য, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি উত্তমা বুদ্ধি, বিনতি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি ও পুষ্টি এই সমস্ত গুণাবলী কৃষ্ণেতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব হে ভূপালগণ! এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, আচার্য্য, পিতা, গুরু, অর্ঘ্যভাজন, অর্চ্চনীয় অচ্যুত যে অর্চ্চিত হইয়াছেন, ইহাতে আপনারা সকলে অনুমোদন করুন। হৃষীকেশ ঋত্বিক, গুরু, কন্যাদানে উপযুক্ত, স্নাতক, নৃপতি ও প্রিয় সমস্তই হইয়াছেন,—এই নিমিত্তই আমরা ইহাঁর অর্চ্চনা করিলাম। কৃষ্ণই সর্ব্বলোকের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ; কৃষ্ণের নিমিত্তই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ইনি অব্যক্তা প্রকৃতি, কর্ত্তা, সনাতন এবং সর্ব্বভূতের অতীত; এই নিমিত্তই অচ্যুত পূজ্যতম হইয়াছেন। বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী ও জরায়ুজাদি ভূতচতুষ্টয় সকলই

কৃষ্ণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহসমুদয়, দিঙ্মণ্ডল, বিদিক্ সমস্ত, সকলই কৃষ্ণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দঃ সকলের গায়ত্রী, মনুষ্যদিগের রাজা, নদী সমুদয়ের সাগর, নক্ষত্র-নিচয়ের চন্দ্র, জ্যোতিঃপুঞ্জের আদিত্য, পর্ব্বত-নিবহের সুমেরু, এবং বিহঙ্গগণের গরুড় মুখ-স্বরূপ, তদ্রূপ কি ঊর্দ্ধ, কি তির্য্যক্, কি অধঃ, জগতের যাবতীয় গতি নিরূপিত হইয়াছে, সেই দেবাদি সমুদয় লোকমধ্যে ভগবান্ কেশবই মুখস্বরূপ হইয়াছেন। পরন্তু, এই অবিজ্ঞ পুরুষ শিশুপাল বালকতাপ্রযুক্ত কৃষ্ণকে বোধগম্য করিতে পারে না, এই নিমিত্তই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া থাকে। যে কোন মতিমান্ মানব উৎকৃষ্ট ধর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হন, তিনি যেমন ধর্ম্মকে দৃষ্টি করেন, এই চেদিরাজ তাদৃশ দৃষ্টি করিতে পারে না। এই বালক-বৃদ্ধ-সম্বলিত মহাত্মা পার্থিবগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি কৃষ্ণকে অর্চ্চনার অযোগ্য বিবেচনা করেন, এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ইঁহার পূজা না করিয়া থাকেন? অথবা এই পূজা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া শিশুপালের যদি নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে অন্যায় পূজায় যাহা ন্যায্য হইতে পারে, এ স্বচ্ছন্দে তাহার অনুষ্ঠান করুক।" *

প্রণম্য দ্বারকানাথং গোপীজনমনোহরম্।
লিখ্যতে গৌতমং তন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্॥

গৌতমীয় তন্ত্র।

"গোপীজনমনোহারী দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সর্ব্ব-তন্ত্রোত্তম গৌতমীয় তন্ত্র লিখিতে আরম্ভ করি।"—

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবারকালে দৈবকীর গর্ভ বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইলে,

* মহাভারত ;—বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর অনুবাদ।

নির্লিপ্ত ভগবান্ কৃষ্ণ দেবকীর হৃৎপদ্মদেশে অধিষ্ঠান হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহা জানিতে পারিয়া তথায় সমাগত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন,—

জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বমনন্তোঽব্যয় এব চ।
জ্যোতিঃস্বরূপো হ্যনঘঃ সগুণো নির্গুণো মহান্॥
ভক্তানুরোধাৎ সাকারো নিরাকারো নিরঙ্কুশঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ॥
সুখদো দুঃখদো দুর্গো দুর্জ্জনান্তক এব চ।
নির্ব্ব্যূহো নিখিলাধারো নিঃশঙ্কোনিরুপদ্রবঃ॥
নিরুপাধিশ্চনির্লিপ্তো নিরীহো নিধনান্তকঃ।
আত্মারামঃ পূর্ণকামো নির্দ্দোষো নিত্য এব চ॥
সুভগো দুর্ভগো বাগ্মী দুরারাধ্যো দুরত্যয়ঃ।
বেদহেতুশ্চ বেদাশ্চ বেদাঙ্গো বেদবিদ্‌বিভুঃ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবাশ্চ প্রণেমুশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
হর্ষাশ্রুলোচনাঃ সর্ব্বে ববৃষুঃ কুসুমানি চ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ;—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

দেবগণ বলিলেন,—"তুমি জগদ্‌যোনি, অযোনি, অনন্ত ও অব্যয়; তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, অনঘ, সগুণ, নির্গুণ ও মহৎ; তুমি নিরঙ্কুশ নিরাকার, কিন্তু ভক্তের অনুরোধে সাকার হইয়া থাক। তুমি স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বেশ, সর্ব্ব ও সর্ব্বগুণাশ্রয়, তুমি সুখদ, দুঃখপ্রদ, দুরবগম্য ও দুর্জ্জনান্তক। তুমি নির্ব্ব্যূহ, নিখিল পদার্থের আধার, শঙ্কাহীন,

কোনরূপ উপদ্রব তোমাকে অভিভূত করিতে পারে না। তুমি নিরুপাধি, নির্লিপ্ত, নিরীহ ও অন্তকের অন্তক। তুমি আত্মারাম, পূর্ণকাম, নির্দ্দোষ ও নিত্য। তুমি সুভগ, দুর্ভগ, বাগ্মী, দুরারাধ্য ও দুরত্যয়। তুমি বেদকারণ, বেদস্বরূপ, বেদাঙ্গ, বেদবেত্তা ও বিভু। দেবগণ এইরূপ স্তব করত পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন এবং হর্ষাশ্রুলোচনে সকলেই পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।"

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি সর্ব্ব পুরাণে ও বেদে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল সংগ্রহ করা হইল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকৃত, ইহার প্রতিবাদ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের লক্ষণ।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, তাহা কোন লক্ষণের দ্বারা অবগত হইতে পারা যায় কি?

গুরু। হাঁ, যায়। শাস্ত্রে ঈশ্বর-লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

শিষ্য। তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। ইতঃপূর্ব্বে তোমাকে ঈশ্বরবিষয়ে যাহা বলিয়াছি, তাহাও ঈশ্বরের লক্ষণ। যথা—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥

পাতঞ্জলদর্শন।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যাবন্ত সংসারী আত্মা ও যাবন্ত মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক্ বা স্বতন্ত্র—তিনি ঈশ্বর।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥

পাতঞ্জলদর্শন।

তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ,—অর্থাৎ তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে। অন্য আত্মায় তাহা নাই।

উক্ত লক্ষণগুলি যাঁহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

ভগবানের অর্থ এই প্রকার ;—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

বশিষ্ঠ।

"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য "ভগ" শব্দ প্রতিপাদ্য। এই ষড়্বিধ গুণ সম্পূর্ণভাবে ও অপ্রতিবন্ধরূপে যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান আছে, তিনিই ভগবান্।"

প্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার পরমহংস শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী বলেন,—

এতাদৃশো ভগচ্ছব্দার্থঃ শ্রীবাসুদেব এব পর্য্যবসিত ইতি॥

প্রাগুক্তরূপ ভগবান্ শব্দার্থ শ্রীবাসুদেবেই পর্য্যবসিত, অন্য কাহাকেও নহে।

অতএব—কৃষ্ণস্তু ভগববান্ স্বয়ং।

ঈশ্বর-লক্ষণ-সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ করা হইল, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ ভাবে আছে। তাহাই তোমাকে অতঃপর বুঝাইব। কৃষ্ণচরিত্রের আদ্যোপান্ত এই লক্ষণপূর্ণ। কৃষ্ণলীলার আদ্যন্ত প্রাগুক্ত লক্ষণমাখা; তাই সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত। তাই হিন্দুর গৃহে গৃহে কৃষ্ণমন্দির, তাই হিন্দুর মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, তাই মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, তাই সকলের ধারণা - কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

শিষ্য। ভগবান্ শব্দ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যের প্রতিও ব্যবহার করিতে হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। যথা,—ভগবান্ ব্যাসদেব, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, ভগবান্ কপিলদেব ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—ভগবান্ শব্দে বাসুদেবেই পর্য্যবসিত।

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য, "ভগ" শব্দ প্রতিপাদ্য। ইহা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ও অপ্রতিবন্ধরূপে বিদ্যমান, তিনিই ভগবান্।— এই অর্থে ভগবান্ বাসুদেব—টীকাকার পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনে তাহাই বলিয়াছেন। ভগবান্ শব্দের অন্যার্থও আছে.—ভগবান্ ব্যাসদেব, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, ভগবান্ কপিলদেব প্রভৃতি যেখানে বলা হইয়াছে, সেখানে ভগবানের অন্যার্থ ই বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ শব্দের অন্য প্রকার অর্থ এইরূপ ;—

উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

প্রাণিগণের উৎপত্তি, বিনাশ, তদুভয়ের কারণ, ভবিষ্যৎ সম্পদ, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে যিনি উত্তমরূপে জানেন, তিনিই ভগবান্।"

এই জন্যই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণকেও ভগবান্ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

শিষ্য। ঐশ্বর্য্য কাহাকে বলে?

গুরু। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব, এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য।

শিষ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কি এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্যই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে?

গুরু। হাঁ,—কেবল মানবচরিত্রে সমগ্র ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান নাই, কাজেই বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণে সমগ্র ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান নাই; কিন্তু বঙ্কিমবাবু প্রক্ষিপ্ত ও উপন্যাসকার কৃত বলিয়া তাঁহার যে সকল লীলাংশ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা আছে,—তোমাকে আমি তাহাই ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

শিষ্য। আপনি বলিলেন—কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদির কথা পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক ইংরেজগণ এবং এদেশীয় ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বলেন—মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি উপন্যাস- রচয়িতাদিগের প্রক্ষিপ্ত রচনায় পূর্ণ হইয়া আছে। মহাভারত-সম্বন্ধেও সেই কথা।*

গুরু। মহাভারত-সম্বন্ধে কি কথা?

শিষ্য। মহাভারত বেনামী লেখায় পরিপূর্ণ। "যে যাহা যখন

রচিয়া 'বেশ রচিয়া ছ' মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে।" * সেই সকল "পূরিয়া দেওয়া" লেখাই প্রক্ষিপ্ত। বলা বাহুল্য, সে সকল বিষয়ের অমানুষিকী বর্ণনা, তাহাই তাঁহাদের মতে প্রক্ষিপ্ত। সুতরাং ঐশ্বর্য্যবর্ণনা যে ব্যাসাদি মূল গ্রন্থকারের লেখা নহে, ইহাই অনেকের মত।

শুরু। মহাভারতে অন্যের রচা কথা আছে, কিন্তু তাহা 'বেনামী রচা' কথা পূরিয়া দেওয়া নহে। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষেপকারীদিগের নামোল্লেখও করা হইয়াছে। যে স্থলে যে ঋষির উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই স্থলে সেই ঋষির নামও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। যেখানে সৌতির নিজের কথা চলিতেছে, সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে, "সৌতিরুবাচ" - সৌতি বলিলেন। যেখান হইতে বৈশম্পায়নী ভারত-সংহিতার আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে. "বৈশম্পায়ন উবাচ"—বৈশম্পায়ন বলিলেন। এই বৈশম্পায়নী ভারত-সংহিতাকে ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত বলিয়া আমরা গণ্য করিব। কেন না, ব্যাসদেব জনমেজয়ের সর্পসত্রে নিজে উপস্থিত থাকিয়া বৈশম্পায়নের দ্বারা বলাইয়াছিলেন। বৈশম্পায়ন যদি অন্যের 'বেনামী রচা' কথা বলিতেন, তাহা হইলে ব্যাসদেব কখনই তাহার অনুমোদন করিতেন না।

অতএব যাঁহারা বলেন যে, আপনাদের রচনা মহাভারতের মধ্যে বেনামী অবস্থায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া জনহিত-সাধন ও নিজের লেখা প্রচার করিয়া অন্য লেখকগণ ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা অভ্রান্ত নহে। কারণ, প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষেপ্তারও নামোল্লেখ

* বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" ৬১ পৃঃ।

আছে। এই নামোল্লেখ না থাকিলে প্রক্ষেপকদিগের ঐপ্রকার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতাম।

উপরে যে কথা গুলি উদ্ধৃত হইল, তাহার আলোচনা ক্রমে করা যাইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুক্রমণিকাধ্যায়।

শিষ্য। মহাভারতে যে অনেক বেনামী প্রক্ষিপ্ত আছে, তাহা গণিয়া-গাথিয়া স্থির করা হইয়াছে। বেনামী প্রক্ষিপ্তবাদিগণের মতে—"প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না। পর্ব্ব-সংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ—অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্দ্ধশতশ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা লিখিয়াছেন।

ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিক্যাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাং॥

এক্ষণে বর্ত্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশী পাওয়া যায়।" *

গুরু। কথা ঠিক নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বেনামি-প্রক্ষিপ্ত নাই।

---

* বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" ৫৩ পৃঃ।

প্রচলিত মহাভারতের আদিপর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা অনুক্রমণিকাধ্যায় দেখিতে পাই। এই অধ্যায়ের কতকটা বৈশম্পায়নের উক্তি, অথবা প্রকৃত মহাভারতের অন্তর্গত এবং কতকটা সৌতির উক্তি। সৌতি কে, তাহা বোধ হয় তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। তিনিই জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নোক্ত ভারতসংহিতা শুনিয়া আসিয়া নৈমিষারণ্যবাসী শৌনক প্রভৃতি মুনিদিগকে শ্রবণ করাইতেছেন এবং আনুষঙ্গিক প্রশ্নানুযায়ী দু'একটি অতিরিক্ত বিষয়ও বলিতেছেন।

এখন কথা এই যে, আসল মহাভারত শুনাইতে গিয়া সৌতির কথা গুলি তাহাতে অতিরিক্ত থাকিবে বৈ কি। সেগুলি মহাভারতের শ্লোকের মধ্যে গণিয়া লইলে কাজেই শ্লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। তুমি যদি আমার নিকট দুর্গেশনন্দিনী বইখানির গল্প কর, এবং আমি তোমাকে মধ্যে মধ্যে বিদ্যাদিগ্‌গজ, আয়েসা, তিলোত্তমার কথা জিজ্ঞাসা করি—আর অপর একজন লোক যদি তোমার আমার উত্তর প্রত্যুত্তর সহ বঙ্কিমী দুর্গেশনন্দিনীর সমস্ত অংশ লিখিয়া রাখে, তবে কি আসল দুর্গেশনন্দিনীর চেয়ে লেখা কিছু বেশী হয় না?

মহাভারতাদি গ্রন্থেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। তখন মুখে মুখে গ্রন্থ প্রচার হইত—লিখিয়া প্রচার হইত না। অধিকন্তু কেবল যে সে বলিয়া গেলেই গ্রন্থ কেহ শুনিত না। তিনি কোথা হইতে কাহার মুখে কিরূপভাবে শুনিয়াছেন, কে বলিয়াছে, কে শুনিয়াছে—সব বলিতে হইত। কাজেই ক্রমে ক্রমে শ্লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইত। তারপরে যখন লিপিবিদ্যা প্রচারিত হইল, তখন সেই সমস্ত লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। সৌতি যেরূপ ভাবে ও যে প্রকারে, মহাভারত বলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া এখনকার প্রচলিত মহাভারত; কাজেই ব্যাসবিরচিত মহাভারত হইতে বেশী শ্লোক থাকিবে। তাহাতে

বেনামী করিয়া কেহ কেহ আপন লেখা মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে না।

এই অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের প্রথম ১০৭ শ্লোক উগ্রশ্রবা-সৌতির উক্তি—ইহা স্পষ্টই উল্লেখিত হইয়াছে। ১০৭ শ্লোকে সৌতি বলিতেছেন যে,—"বৈশম্পায়ন যে লক্ষ শ্লোকময়ী ভারত-সংহিতা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।" ইহার পরে ১০৮ শ্লোক হইতে ২৪৮ শ্লোক পর্য্যন্ত বৈশম্পায়নোক্ত (অথবা ব্যাস-বিরচিত) ভারত-সংহিতার কথা বলা হইল। ২৪৮ শ্লোকের পর হইতে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আবার সৌতির উক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ২৭১ শ্লোকের মধ্যে ১৪১ শ্লোক প্রকৃত মহাভারতের এবং অবশিষ্ট ১৩০ শ্লোক সৌতির উক্তি।

তুমি পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের যে শ্লোক উল্লেখ করিয়াছ,—অর্থাৎ

তেতোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাং॥

তাহাতে ঠিক দেড়শত—অর্থাৎ গোণাগুন্তি ১৫০ এমন বুঝায় না। 'অধ্যর্দ্ধশত' একথার অর্থ শ'দেড়েক অথবা ন্যূনাধিক দেড়শত হইবে, এমনই বুঝায়। যদি একশত এবং পঞ্চাশ এমন কোন বিশেষ উল্লেখ, থাকিত, তাহা হইলে খাটি ১৫০ বুঝিতে পারা যাইত। অতএব ১৪১ শ্লোকই ঐ অধ্যর্দ্ধশত বা শ'দেড়েক শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা।

এক্ষণে দেখা গেল, শ'দেড়েক ব্যাস-বিরচিত আসল শ্লোক আর ১৩০ শ্লোক সৌতির উক্তি, ইহাতে বেনামি-প্রক্ষিপ্ত বা পূরিয়া দেওয়া কিছুই নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিলাম যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে "যাহা যে ভাল রচিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, তাহাই সে মহাভারতে মধ্যে পূরিয়া দেয় নাই।" এক্ষণে আরও কথা আছে।

গুরু। সে কথা কি?

শিষ্য। পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায়কে মহাভারতের সূচীপত্র বা Table Conteuts বলা যাইতে পারে। মহাভারতের যে সকল বিষয় আছে, পর্ব্বসংগ্রগাধ্যায়ে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে . কিন্তু "পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই।"—এইরূপ শোনা যায়। *

গুরু। হাঁ, প্রায় সমস্ত পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় সৌতির উক্তি। কিন্তু সৌতি উহা মহাভারতের সূচীপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বলেন নাই, মহাভারতে কোন্ কোন্ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই বলিবার জন্য ঐ কথা পাড়িয়া ছিলেন।

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আমি ঐ সম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়াছি যে—অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তিক পর্ব্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই

---

* বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" ৫৩ পৃঃ।

মহাভারত উগ্রশ্রবা ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায় সমস্ত (অবশ্য অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১৫০ শ্লোক ভিন্ন) প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্ব্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়।" *

গুরু। না, তাহা নহে। যখন উগ্রশ্রবা ঋষিদিগকে মহাভারত শুনাইতেছিলেন, তখন ইহাতে প্রক্ষিপ্ত যুটিয়াছে, মহাভারত পাঠ করিলে এরূপ বুঝা যায় না বা বুঝিবার কোন কারণও নাই। আর প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাই নিবারণের জন্যও কেহ এই পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় লিখিয়া,তাহা নিষারণকল্পে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সে কথাও ঠিক নহে। পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় সমস্তই সৌতির উক্তি। সৌতি বলিতেছেন—"হে শৌনক! আমি আপনার যজ্ঞে যে উৎকৃষ্ট আখ্যান বলিতেছি, ব্যাস-শিষ্য ধীমান্ বৈশম্পায়ন তাহা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিস্তাররূপে কহিয়াছিলেন।" † সৌতি এইরূপ বলিয়া তারপরে ঋষি গণের সাক্ষাতে বলিতেছেন যে,—সেই বৈশম্পায়নোক্ত মহাভারতের কত পর্ব্ব, কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক এবং কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায়ের মধ্যে "বৈশম্পায়ন উবাচ"—বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এমন কথা নাই, সুতরাং বুঝিয়া লইতে হইবে, ইহা ব্যাস-বিচরিত বা বৈশম্পায়নোক্ত মহাভারত নহে, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সৌতির

* কৃষ্ণ-চরিত্র ৫৪ পৃঃ।

† মহাভারত; আদিপর্ব্ব, ২ অঃ ৬৩ শ্লোঃ।

উক্তি। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার পূর্ব্বে যে মহাভারতে অনেক প্রক্ষিপ্ত আসিয়া যুটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? যে বিষয় বলা হইবে, পূর্ব্বে বক্তা তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস দিতেছেন মাত্র; ইহাতে প্রক্ষিপ্তাংশ আর না আসিয়া যুটিতে পারে বা অনেক যুটিয়া গিয়াছিল—এমন সিদ্ধান্ত করিবার কি আছে, তাহা আমি কোন প্রকারেই বুঝিতে পারি না। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সৌতি বলিয়াছেন—সৌতিরই উক্তি; সুতরাং ইহাতে বেনামি-প্রক্ষিপ্ত কখনই যুটে নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়।

শিষ্য। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত কথায় আমি যাহা বলিয়াছি তাহার একটি বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয় নাই।

গুরু। কোন্ বিষয়ের?

শিষ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—"অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তীকপর্ব্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি, মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন।" ইহাতে একটা সন্দেহ হয়। সন্দেহ এই হয় যে,—পাঁচজনে যখন পাঁচ কথা বলে, তখন প্রক্ষিপ্ত যুটিয়াছিল; নতুবা যে স্থান হইতে আরম্ভ তাহা সকলেই জানিত।

গুরু। জানিবে না কেন? পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক এই তিন পর্ব্বাধ্যায়ও প্রকৃত মহাভারতের অন্তর্গত নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে আছে—

মন্ত্রাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥

"কেহ বা 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' এই মন্ত্র হইতে, কেহ কেহ বা আস্তীকপর্ব্ব হইতে, কেহ কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে ভারত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।"

এখন কথা এই যে,—উপরিচর রাজার উপাখ্যানের কথা যখন সকলের শেষে উক্ত হইয়াছে, তখন অন্ততঃ সকলেই উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে ভারত অধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন ;—অর্থাৎ সৌতির সময়ে কেহ "নারায়ণং নমস্কৃত্য" হইতে, কেহ আস্তীকপর্ব্ব হইতে, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে ভারত অধ্যয়ন করিতেন,—ইহাতে বুঝা যাইতেছে। উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে যে, ভারত আরম্ভ হইল, ইহা সকলেই স্বীকার করিত। তারপরে আর কেহই আরম্ভ বাকি বলিয়া জ্ঞান করিত না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার পূর্ব্বভাগ বেনামি-প্রক্ষিপ্ত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতেই প্রকৃত মহাভারতের আরম্ভ, বিবেচনা করা যাইতে পারে। বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যান এই উপাখ্যান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। এই উপাখ্যানের দুই অধ্যায় পূর্ব্ব হইতে বৈশম্পায়নের উক্তি আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, উক্ত দুই অধ্যায় তাঁহার নিজের উক্তি—ব্যাস-রচিত ভারত-সংহিতার অন্তর্গত নহে। একটিতে (ভারত-সূত্রাধ্যায়ে) তিনি কতকটা অনুক্রমণিকার ন্যায় মহাভারতের ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; অপরটিতে (ভারত-প্রশংসাধ্যায়ে) মহাভারত অধ্যয়ন, শ্রবণ প্রভৃতির প্রশংসা করা হইয়াছে।

পৌষ্য পৌলোম ও আস্তীক এই তিন পর্ব্বাধ্যায় যে বৈশম্পায়নোক্ত মহাভারতের অন্তর্গত নহে, তাহার আরও প্রমাণ আছে।

আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে শৌনকপ্রমুখ ঋষিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সৌতি বলিতেছেন—

ইতিহাসমিমাং বিপ্রাঃ পুরাণং পরিচক্ষতে।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্তং নৈমিষারণ্যবাসিষু॥
পূর্ব্বং প্রচোদিতঃ সুতঃ পিতা মে লোমহর্ষণঃ।
শিষ্যো ব্যাসস্য মেধাবী ব্রাহ্মণেম্বিদমুক্তবান্॥
তস্মাদহমুপশ্রুত্য প্রবক্ষ্যামি যথাতথং।

(আদি, ১৩ অঃ, ৬।৭।৮)

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ যে, এই ইতিহাসকে (আস্তীকোপাখ্যান) পুরাণ বলিয়া জানিবে। ইহা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে সৌতি-পিতা লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সেই কথাই তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। সৌতি তাহাই শুনিয়া এখন শৌনক প্রভৃতি ঋষিদিগের নিকট পুনরায় বলিতেছেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই আস্তীকোপাখ্যান জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে।

শিষ্য। পৌলোম-পর্ব্বাধ্যায়ের বিষয় বলুন।

গুরু। পৌলোম-পর্ব্বাধ্যায়ও বৈশম্পায়নোক্ত নহে। পৌলোম পর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে শৌনক সৌতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তোমার পিতা সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও কি সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ?"

সৌতি তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—"বৈশম্পায়ন প্রভৃতি দ্বিজবরেরা এবং আমার পিতা যে সকল বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ আমি আমার পিতার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছি।" * এই কথার পরে শৌনকের প্রশ্নানুযায়ী সৌতি তাঁহার অধীত পুরাণ হইতে পৌলোম-কথা বলিলেন, কাজেই পৌলোম পর্ব্বাধ্যায় বৈশম্পায়নোক্ত ভারত-আখ্যানের অন্তর্গত নহে। কিন্তু বেনামি-প্রক্ষিপ্ত নহে,—উহা সৌতির উক্তি।

শিষ্য। পৌষ্যপর্ব্বাধ্যায় সম্বন্ধেও কি ঐ কথা লেখা আছে?

গুরু। পৌষ্যপর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে যদিও লেখা নাই যে, সৌতি এই উপ্যাখ্যান কোথা হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহারই উক্তি—বৈশম্পায়নের ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে;—আরম্ভেই লেখা আছে, "সৌতিরুবাচ"—সৌতি বলিলেন।

শিষ্য। এ পর্য্যন্ত মহাভারতের বিষয় যাহা বলিলেন, তাহাতে এইরূপ বুঝিতে পারিলাম যে, মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত আছে, কিন্তু সে প্রক্ষিপ্ত কেহ চুরি করিয়া আপন 'রচাকথা' মহাভারতে পূরিয়া দেয় নাই। ভারত-কথা বলিবার সময় সৌতির উক্তিগুলিও মহাভারতের সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে। অন্ততঃ যাহা প্রক্ষিপ্ত, তাহা তাৎকালিক অন্য কোন প্রসিদ্ধ ঋষি-প্রণীত।

গুরু। হাঁ, আমি ঐরূপই বলিয়াছি, এবং সে কথার প্রমাণাভাব নহে।

শিষ্য। এ সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা আছে।

গুরু। কি?

* মহাভারত আদিপর্ব্ব ৫ অঃ

শিষ্য। যখন প্রক্ষিপ্তাংশ ব্যাস-রচিত নহে, তখন উহা অন্তসময়ে লিখিত,—অতএব, উহা প্রামাণ্য বলিয়া না ধরিলেও চলে ?

গুরু। ঐ অংশগুলি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মহাভারতাংশের কোন ক্ষতিও হয় না। কিন্তু এ স্থলে একটি কথা এই আছে যে,—উক্ত তিন পর্ব্বাধ্যায় বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে; কিন্তু তাই বলিয়া যে, সেগুলি ব্যাসদেব রচিত নহে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

উক্ত উদ্ধৃত অংশগুলিতে বুঝিতে পারা যায়, ঐ সকল বিষয়ও ব্যাস কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্তং" এবং বৈশম্পায়ন-প্রমুখ দ্বিজবরেরা এবং আমার পিতা যে সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন।" বৈশম্পায়ন এবং সৌতি-পিতা উভয়েই প্রসিদ্ধ ব্যাস-শিষ্য। যখন সৌতি বলিতেছেন, আমার পিতা ও বৈশম্পায়ন ব্যাসের নিকট এই বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—তখন ইহাও ব্যাস-বিরচিত। কিন্তু বৈশম্পায়ন বোধ হয়, অপ্রয়োজন জ্ঞানে সর্পসত্রে জনমেজয়ের নিকট উহা বলেন নাই।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে সৌতি বলিতেছেন—বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের আদিতে পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক এই তিন পর্ব্ব আছে। অতএব সৌতির সময়েও এই তিন পর্ব্ব ছিল, এবং ইহা ব্যাস-বিরচিত ও মহাভারতের পূর্ব্বভাগ Prologue স্বরূপে ব্যবহার হইত। কিন্তু বৈশম্পায়ন সর্পসত্রে ইহা বলেন নাই—অতএব, ইহা বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সৌতির মহাভারত অধ্যয়ন।

শিষ্য। সৌতি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের মুখে ভারতাখ্যান শ্রবণ করিয়া আসিয়া শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলেন,—ইহাই জানি। তবে যাহা বৈশম্পায়ন বলেন নাই, তাহা সৌতি জানিতে পারিলেন কি প্রকারে?

গুরু। সৌতি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের মুখে শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। এ কথা বঙ্কিমবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবা সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়নসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।" * এখন বুঝিতে হইবে, যে কথা বৈশম্পায়ন বলেন নাই, অথচ সৌতির জানা ছিল, এমন কথা ঋষিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তিনি বলিয়াছেন।

শিষ্য। ইহাতে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

গুরু। কি কি?

শিষ্য। এক, বৈশম্পায়ন স্বয়ং ব্যাসদেবের শিষ্য; তিনি যাহা জানেন না, অপরের তাহা জানিবার সম্ভব কোথায়? দ্বিতীয়, ব্যাসবিরচিত বিষয় না হইলে, তাহাকে প্রামাণিক কথা বলিয়াও ধরা যাইতে পারে না।

গুরু। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সৌতি তাঁহার পিতা লোমহর্ষণের নিকটে মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সৌতি-পিতা লোমহর্ষণ

---

* কৃষ্ণচরিত্র; ৬৪ পৃঃ

ব্যাসদেবের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। লোমহর্ষণ ব্যাসদেবের নিকট মহাভারত শিক্ষা করিয়া পুরাণবিৎ স্বীয়পুত্র সৌতিকে তাহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

এইরূপ অনুমান করিবার পক্ষে আরও হেতু আছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত আছে, জনমেজয়ের সর্পসত্রের বহুপূর্ব্বে ব্যাসদেব লক্ষ শ্লোক মহাভারত রচনা করিয়া এই মনুষ্যলোকে প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং জানিতে পারা গেল যে, বৈশম্পায়ন, শুকদেব, লোমহর্ষণ প্রভৃতি ব্যাস-শিষ্যগণ সর্পযজ্ঞের বহু পূর্ব্বেই মহাভারত শিক্ষা করিয়াছিলেন। সৌতির পিতা যখন মহাভারতপাঠ পূর্ব্বেই করিয়াছেন, তখন পিতার নিকটে সৌতিও ইহা পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন, বুঝিতে পারা যায়। আর সর্পসত্রের পূর্ব্বে এবং সময়ে মহাভারত অধ্যয়ন যে খুব প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা মহাভারত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে ;—

মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ॥

মহাভারত ; আদি, অনুক্রং, ১০২ ॥

অধীয়তে—অধ্যয়ন করেন। বিপ্রগণ কেহ মন্ত্র হইতে, কেহ আস্তীক পর্ব্বাধ্যায় হইতে, কেহ উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারত সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেন।—ইহাতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, তখন বিপ্রগণের মধ্যে মহাভারত অধ্যয়ন অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। যদিও এ কথা সৌতির, কিন্তু সৌতি ব্যাসের সমকালিক মানুষ। ব্যাসদেব সর্পসত্রে বৈশম্পায়ন দ্বারা

ভারতাখ্যান পাঠ করান, নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যদি সৌতির জানা বিষয় ব্যাসের অনুমোদিত না হইত, বা বুঝিতেন, আমি যাহা পূর্ব্বে অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহা অন্য লোকের নিকটে—তাহা হইলে, তাঁহার পূর্ব্বাধীত বিষয় সকল পরিত্যাগও করিতে পারিতেন।

অতএব, সৌতি যাহা বলিয়াছেন, বাজে কথা নয়। তাহাও ব্যাস-বিরচিত বিষয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোক-সংখ্যা।

শিষ্য। যদি মহাভারতে বেনামি-প্রক্ষিপ্ত না থাকিবে, তবে সৌতি তাঁহার পিতার নিকটে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত অধ্যয়ন করিয়া, আবার সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকটে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত শ্রবণ করিয়া সৌতি শৌনকাদির নিকটে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। "সৌতিরুবাচ"—যাহা সৌতি বলিলেন—তাহা ভিন্নও প্রচলিত মহাভারতের সহিত সেই পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায়োক্ত শ্লোক-সংখ্যা মিলে না কেন? অতএব, বোধ হইতেছে, তৎপরে মহাভারতের মধ্যে বেনামি-প্রক্ষিপ্ত কিছু প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

গুরু। না, প্রক্ষিপ্ত-প্রবেশ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। বৈশম্পায়ন সর্পসত্রে ভারতাখ্যানের পূর্ব্বে যদি পর্ব্বসংগ্রহের কোন কথা উল্লেখ করিতেন, অথবা বলিবার কালে যদি তিনি শ্লোক গণিয়া গণিয়া

বলিতেন, তাহা হইলেও বা অতিরিক্ত শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা অন্যায় হইত না। কিন্তু বৈশম্পায়ন সেরূপ কিছু করেন নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সৌতি সর্পসত্রে ভারতাখ্যান শুনিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার নিকট তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সৌতিই যখন পর্ব্ব-সংগ্রহ প্রভৃতি বলিতেছেন, তখন ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, বৈশম্পায়ন কৃত ভারতাখ্যানের পূর্ব্বেই ব্যাস-শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পর্ব্ব-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রস্তুত এবং মহাভারতের সঙ্গে তাহার পূর্ব্বভাগরূপে পৌষ্য, পৌলোম প্রভৃতি উপাখ্যান সংযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু উহাও ব্যাসরচিত, নয় অনুমোদিত।

আমার মনে হয় যে, সৌতি সর্পসত্রে বৈশম্পায়নকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব অবধি তাঁহার পিতার নিকট যাহা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই শৌনক প্রভৃতিকে বলিয়াছেন এবং বৈশম্পায়নের উক্তি হইতে বৈশম্পায়নেরই কথায় শুনাইয়াছেন। সুতরাং পর্ব্বসংগ্রহ রচিত হইবার পরেই যদি ব্যাসদেব তাঁহার মহা-ভারতের শ্লোক-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করেন, তবে সর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়-মধ্যে তাঁহার উল্লেখ কি প্রকারে থাকিবে? আমার বিশ্বাস যে, ব্যাসদেবই এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াছেন। কাজেই প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যার সহিত পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোক-সংখ্যার মিল নাই; এবং কাজেই আমরা কোন পর্ব্বে পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা অপেক্ষা অতিরিক্ত শ্লোক দেখিলে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ফুঁয়ে উড়াইতে চেষ্টা করিব কি প্রকারে? অথবা কোন পর্ব্বে পর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা হইতে কম শ্লোক দেখিলে লিপিকর-প্রমাদ ঘটিয়াছে বলিয়া নূতন বিষয়ে কল্পনা করিবই বা কি প্রকারে?

শিষ্য। ব্যাসদেব কি মধ্যে মধ্যে শ্লোক রচনা করিয়া মহাভারতে

সংযোজনা করিতেন? অথবা রচিত শ্লোকের মধ্য হইতে কতক কতক বাদ দিয়া দিতেন?

গুরু। হাঁ, ঐরূপই করিতেন। এক্ষণে এতদ্বিষয়ে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ব্যাসদেব একবারেই তাঁহার মহাভারত এমনভাবে রচিয়াছিলেন কি না, যে, তাঁহাকে ইহাতে দ্বিতীয়বার হস্তার্পণ করিতে হয় নাই, অথবা তিনি মহাভারতকে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিয়াছেন। যদি তিনি মহাভারতকে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিয়া থাকেন, তবে আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমান খুব থাকিত বলিয়াই বোধ হয়। এখনও দেখা যায়, গ্রন্থকারগণ সংস্করণে সংস্করণে তাঁহাদিগের স্বরচিত গ্রন্থকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া থাকেন। অতঃপর আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, ব্যাসদেব মহাভারতকে একবারে কি ক্রমে ক্রমে সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহাভারতের সংস্করণ।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, প্রচলিত মহাভারতে যে, পর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা অপেক্ষা প্রচলিত মহাভারতে যে, অল্প বা অধিক সংখ্যক শ্লোক দেখা যায়, সেগুলিও ব্যাসদেব-বিরচিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ?

গুরু। সাধারণের বিশ্বাস কিরূপ?

শিষ্য। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ব্যাসদেব একেবারেই সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

গুরু। সে বিশ্বাস সত্য নহে। কেন নহে, তাহার প্রমাণ দেখাইব।

শিষ্য। কি প্রমাণ?

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যখন কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল,—যখন কুরুপাণ্ডবের বিশাল অনীকিনী ব্যূহিত হইয়া সমরার্থ দণ্ডায়মান,—এক কথায় যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য হইয়াছিল, তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—"আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমার পুত্রগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছি, তুমিও তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়াছ কিন্তু তাহারা যখন শুনিল না,—তখন তাহাদিগের পতন নিশ্চয়; ইহা আমি দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি শোকাভিভূত হইও না, আমি এই কুরু-পাণ্ডব সকলের কীর্ত্তি বিখ্যাত করিয়া দিব।" * যাহার কীর্ত্তি থাকে, তাহার ভৌতিক দেহ বিনষ্ট হইলেও সে অমর। ব্যাসদেব তাহাদের কীর্ত্তি বিখ্যাত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অমর করিবেন,—বলিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসম্বন্ধীয় ইতিহাস প্রণয়ন করিবেন বলিয়া ব্যাসদেবের তখন হইতেই ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তখনও লেখা হয় নাই—তখন যুদ্ধসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ ঘটনাও ঘটে নাই।

তার পরে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বিশাল দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, বীর-গণের ধনুর্জ্যা-নিস্বনে তরবারি পরিচালনে, সৈন্যগণের কোলাহলে, হস্ত্যশ্বের ধ্বনিতে, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র ভারত-বীর কুরুক্ষেত্র-সমরে নিধন প্রাপ্ত হইল। সহস্র সহস্র রমণী পতিহারা পুত্রহারা হইল,—ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের অবসান হইয়া গেল।

* মহাভারত; ভীষ্ম—২ অ, ১৩।

যুদ্ধের অবসানকালে ব্যাসদেব সামান্য কয়েকটি শ্লোকদ্বারা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধেতিহাস রচনা করিয়া স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। স্বর্গারোহণ পর্ব্বে একথা সৌতি বলিয়াছেন। যথা—

মহর্ষির্ভগবান্ ব্যাসঃ কৃত্বেমাং সংহিতাং পুরা।
শ্লোকৈশ্চতুর্ভির্ধর্ম্মাত্মা পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকং॥

মহাভারত; স্বর্গারো, ৫ম, ৫৫।

ইহার ভাবার্থ এই যে,—পূর্ব্বে মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসদেব 'গোটা-চারেক' শ্লোক দ্বারা—(গোণাগুন্তি চারিটি নহে) অর্থাৎ অতি অল্প সংখ্যক শ্লোকের দ্বারা ভারত- সংহিতা রচনা করিয়া স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে যেমন "অধ্যর্দ্ধ শতং" অর্থে 'শ'দেড়েক' বলা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও "শ্লোকৈশ্চতুর্ভিঃ" অর্থে চলিতভাষায় 'গোটা চারেক' বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকচতুষ্টয়ী ভারতসংহিতাই ভবিষ্যৎ মহা-ভারতের সর্ব্ব প্রথম সংস্করণ হইল।

ইহাকে মহাভারতের প্রথম সংস্করণ বলা যায়।

শিষ্য। এই 'গোটাচারেক' শ্লোক লিখিয়া ব্যাসদেব মহাভারতের সূচনা করিয়াছিলেন, ইহা বোধ হয়, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধবিষয়ক স্মারক-লিপি?

গুরু। হাঁ, তাহাই। তদনন্তর অবসরমতে এই মহাভারতকে বিস্তৃত আকারে রচনা করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি লিখিতে হইবে। তখন তিনি সুলেখক গণেশকে আহ্বান করিলেন। গণেশ আগমন করিলে ব্যাসদেব বলিলেন—"তুমি আমার মনঃকল্পিত ভার-

তের লেখক হও, আমি মুখে বলিয়া যাইব।" * গণেশ ব্যাসদেবের অনুরোধে লিখিতে স্বীকৃত হইলেন। *

তখন ব্যাসদেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং গণেশ লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে একাদিক্রমে ন্যূনাধিক ২৪০০০ শ্লোক লিখাইয়া লইয়া মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর বা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিলেন। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সৌতি বলিতেছেন—

চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারত সংহিতাং।
উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবন্তারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

মহাভারত ; আদি, ১অ, ১০১।

ব্যাসদেব উপাখ্যান ভাগ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক দ্বারা ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা সেই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকেই ভারত বলিয়া থাকেন।

"উপাখ্যানৈর্বিনা"—অর্থাৎ "উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করিয়া" এই বিশেষণ প্রদত্ত হওয়ায় স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, এই "চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রী ভারত সংহিতাও" প্রথম স্তরের ন্যায় কিন্তু তাহা অপেক্ষা কিছু বিস্তৃত বটে। ইহা সমগ্র মহাভারতের একটি আভাস (out line) মাত্র। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাসদেব কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে ভারতসংহিতায় যাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, গণেশের দ্বারা তাহারই বিস্তৃত খসড়া প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। উপাখ্যান বিনা কেবল ঘটনাগুলি লিখিয়া লইলেন। লিপিবিদ্যাটা তখন প্রায় প্রচলিত ছিল না। সেরূপ প্রচলিত থাকিলে গণেশকে ডাকিয়া আনিতে হইত না। গণেশ এই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী ভারতাখ্যান

* মহাভারত ; আদি, ১অ, ৭৭।

লিখিয়া গেলে, ব্যাসদেব পুনরায় তাহা সাজাইয়া গুজাইয়া লয়েন। তথন উপাখ্যান, অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা যাহা লিখিতে হয়, তাহাই লিখিলেন। ইহাও বোধ হয় জানা যায় যে, যখন তাড়াতাড়ি কোন রচনা অন্য দ্বারা লেখাইয়া লইতে হয়, তখন তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। তৎপরে নিজে নিজে তাহা দুই একবার পাঠ করিয়া যেখানে যে অলঙ্কারাদি ও উপাখ্যানাদি সাজে তদ্দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

এস্থলে ও 'চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রী' বলিতে গোণাগুন্তি চব্বিশ হাজার নহে,—হাজার চব্বিশেক বুঝিয়া লইতে হইবে।

এই দ্বিতীয় স্তরের বা দ্বিতীয় সংস্করণের ভারতাখ্যান লেখাইয়া লইয়া ব্যাসদেব তাহাতে অনেক নূতন নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া তৃতীয় স্তরের বা তৃতীয় সংস্করণের ভারতাখ্যান রচনা করেন। এইরূপে ভারতাখ্যান গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়, বা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শিষ্য। ভাল, এস্থলে একটি কথা বলিতে চাহি।

গুরু। সে কথা কি?

শিষ্য। ব্যাসদেব একাদিক্রমে চব্বিশ হাজার শ্লোক বলিয়া গেলেন—কথাটা কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করেন না।

গুরু। বিশ্বাস না করিবার কারণ কি? ব্যাসদেব সাধারণ মনুষ্য নহেন। যোগ-বল-শালী অনন্ত শক্তিধর। ব্যাসদেবের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতে না পারিলেও সে দিনকার একজন কবির কথা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইংলণ্ডীয় কবি শেলিকে অবগত আছেন। শেলির কবিতা না পড়িয়াছেন ইংরাজী-ভাষাজ্ঞ এমন লোক নাই। সেই পাশ্চাত্য কবি শেলির রচনাপ্রণালী অবলোকন করিলে ব্যাসদেবের রচনা অমানুষিকী বা অসম্ভব বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না। শেলি বলেন—

"তিনি যখন কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিতেন, তখন তাঁহার মনে এত অধিক ভাব-প্রবাহ ও কবিতা আসিয়া পড়িত যে, তিনি সেই সকল সম্পূর্ণভাবে লিখিতে পারিতেন না। ইহা সত্ত্বেও তিনি চারি পাঁচশত শ্লোকযুক্ত এক একটি কবিতা—মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া লিখিয়া যাই-তেন, পাছে লেখার অভাবে তাঁহার কবিতা-স্রোতের অন্তরায় ঘটে।" এইজন্য ব্যাসদেব ক্ষিপ্রহস্ত গণেশকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং গণেশকে পাইয়া আনন্দিত মনে কবিতার উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন। এতদবস্থায় ব্যাসের ২৪০০০ শ্লোক রচনা অসম্ভব বিবেচনা করা যায় না। একটি শ্লোক রচনা করিতে আমাদের দশ ঘণ্টা কাটিয়া যায় বলিয়া শেলির পাঁচশত শ্লোক একাদিক্রমে লেখার কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। আবার শেলি হাজার শ্লোক, একাদিক্রমে দুই হাজার শ্লোক রচিতে পারেন না বলিয়া, ব্যাসদেব ২৪০০০ শ্লোক একাদিক্রমে রচিতে পারেন না, তাহারই বা কারণ কি? বাবার উপরে বাবা ত আছেনই।

শিষ্য। ব্যাসদেব এই ২৪০০০ শ্লোকময়ী ভারতসংহিতা রচনা করিয়া তৎপরে কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে বাসনা হয়।

গুরু। তিনি ঐ রচিত ভারতসংহিতা নিজ পুত্রকে শিক্ষা দেন এবং তৎপরে অন্যান্য উপযুক্ত শিষ্যগণকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। তারপরে তাহাতে উপাখ্যান ও অলঙ্কারাদির সমাবেশ করেন। এই চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রী শ্লোকময়ী ভারতাখ্যানই মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ।

শিষ্য। আর উপাখ্যানযুক্ত ভারতসংহিতাই বোধ হয় তৃতীয় সংস্করণের মহাভারত?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কিন্তু কেহ বলেন—উহা ব্যাসদেবের রচনা নহে। "তৃতীয়

স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যখন যাহা রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে।"*

গুরু। সে ভুল কথা। উহাও ব্যাসদেবের বিরচিত এবং ব্যাসদেব এইবার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া খাটিয়া খুটিয়া মহাভারত সম্পন্ন করেন। এবার সেই চব্বিশ হাজার শ্লোককে ভিত্তি করিয়া লক্ষ শ্লোকযুক্ত মহাভারত রচনা করিলেন। সর্পসত্রে যখন ব্যাসের সম্মুখে বসিয়া বৈশম্পায়ন ভারতসংহিতা বলিতেছিলেন, তখন, তিনি এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, লক্ষ শ্লোকযুক্ত মহাভারত ব্যাসদেব রচনা করিয়াছেন। যথা—

ইদং শতসহস্রং হি শ্লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
সত্যবত্যাত্মজেনেহ ব্যাখ্যাতমমিতৌজসা ॥

মহাভারত ; আদি. ৬২ অ, ১৪।

অমিত-তেজস্বী সত্যবতী নন্দন এই শত সহস্র (লক্ষ) শ্লোক-বিশিষ্ট ভারত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কি প্রকারে ব্যাসদেব চব্বিশ হাজার শ্লোককে ভিত্তি করিয়া লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহা বৈশম্পায়ন ব্যাসদেবেরই সম্মুখে বলিয়াছেন, যথা—

ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্লব্ধকামং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ ॥
তপোনিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণা।

মহাভারত ; আদি, ৬২ অ, ৪০০—১।

* বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র ; ৬১ পৃঃ।

ত্রিভির্ব্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতং॥

মহাভারত ; আদি, ৬২ অ, ৫০।

উপর্য্যুক্ত শ্লোকত্রয়ের ভাব এই যে,—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসর 'সতত উদ্যোগী থাকিয়া' এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন।

'সদোত্থায়ী বা নিত্যোত্থিত'—সতত উদ্যোগী থাকিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাসদেব নিরলস থাকিয়া এবং সতত উদ্যোগী হইয়া মহাভারত সম্পন্ন করেন। অতএব ঐরূপ স্পষ্ট কথা প্রকাশ থাকিতে কি প্রকারে বলা যায় যে, অন্যলোকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর লিখিয়াছে ?

আরও কথা এই যে বৈশম্পায়ন ব্যাসশিষ্য,—তিনি ব্যাসের নিকটেই মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছেন, আবার জনমেজয়ের সর্পসত্রে ব্যাসের সম্মুখে বসিয়া তিনিই মহাভারত বলিতেছেন,—সুতরাং বৈশ-ম্পায়ন অন্যের রচ্য বিষয় কি করিয়া বলিতেন ? এখনকার প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়নেরই সেই সর্পসত্রে বলা মহাভারত।

শিষ্য। আর একটি বিষয় অবগত হইতে পারিলেই এতৎ সম্বন্ধে আমার সমস্ত জানা হয়।

গুরু। সে বিষয়টি কি ?

শিষ্য। পর্ব্বসংগ্রহে মহাভারতের কোন্ সংস্করণের কথা লিখিত হইয়াছে ?

গুরু। এই তৃতীয় সংস্করণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। সৌতি সর্পসত্রে এই তৃতীয় সংস্করণ মহাভারত শুনিয়া আসিয়াছিলেন, এবং ইতঃপূর্ব্বে সম্ভবত এই সংস্করণই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—কাজেই

তিনি পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই তৃতীয় সংস্করণেরই বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আর অনুক্রমণিকাধ্যায়ে যাহা ব্যাসবর্ণিত, তাহাতে দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ আছে।

শিষ্য। কেন, ব্যাসদেব দ্বিতীয় সংস্করণের সূচীপত্র অনুক্রমণিকায় যাহা গ্রথিত করিয়াছিলেন, তৃতীয় সংস্করণ রচিয়া সে সংস্করণের সূচীপত্র তুলিয়া দিয়া তৃতীয় সংস্করণের সূচীপত্র বসাইয়া দিলেন না কেন?

গুরু। ইহাতে বোধ হয় তোমার এমত সন্দেহ হইতেছে যে, যখন অনুক্রমণিকাধ্যায়ের সূচীর সহিত লক্ষ শ্লোকময়ী ভারতসংহিতার মিল নাই এবং ব্যাসদেব অনুক্রমণিকায় তাহাদের উল্লেখ করেন নাই, তখন উহা তাঁহার লেখা নাও হইতে পারে।

শিষ্য। আজ্ঞে, সে সন্দেহ সহজেই হয়।

গুরু। তোমাকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, মহাভারতের শেষ পর্ব্ব—স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—এই শেষ পর্ব্বের দুই তিন পর্ব্ব পূর্ব্বে অশ্বমেধ পর্ব্ব। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এই অশ্বমেধের বিষয় কিছুই লেখা-নাই—কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। অতএব ইহা কি ব্যাসের লেখা নয় বলিয়া বিবেচনা কর?

শিষ্য। যদি বলি, উহাও তৃতীয় স্তরের?

গুরু। এই পর্ব্ব লইয়াই মণিপুরের ইতিহাস—মণিপুরের রাজবংশ—তাহাও কি অপলাপ করিতে চাহ? আরও বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,—

> বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
> সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্॥

প্রভুর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথকৃত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতা॥

মহাভারত ; আদি, ৬৩ অ, ৮৫—৮৬।

অর্থাৎ ব্যাসদেব, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব এবং বৈশম্পায়নকে বেদ ও মহাভারত শিখাইয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা প্রকাশ করিলেন। আশ্বলায়ন গৃহসূত্রেও আছে যে, জৈমিনি ভারতকার এবং বৈশম্পায়ন ভারতকার। বেবর (weber) সাহেব জৈমিনি-মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব দেখিয়াছেন ;—আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। *

তবেই দেখা যাইতেছে যে, জৈমিনি এবং বৈশম্পায়ন উভয়েই ব্যাসদেবের নিকটে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে, তাঁহারা উভয়েই কি প্রকারে সাধারণভাবে অশ্বমেধ পর্ব্ব বলিতে বা রচনা করিতে পারিতেন ?

অতএব এই সকল আলোচনা করিয়া স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই মহাভারতের তৃতীয় স্তর রচনা করিয়াছিলেন, উহা বেশ রচাইয়াছি বলিয়া অন্য লোকে পূরিয়া দেয় নাই।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, মহাভারত প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া উহার কোন অংশ গ্রহণ করিলে, সমস্ত অংশ লইয়াই বিচার করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় অংশ লইয়া অন্য সকল বাদ দিলে চলিবে না।

---

* বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র ; ৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিবংশ।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন,আমি যে সকল গ্রন্থ হইতে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের কথা বলিব, তাহা যে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থ তাহা বলিয়া দিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি. হরিবংশ কি প্রামাণিক গ্রন্থ?

গুরু। এ কথা জিজ্ঞাসা কেন? মহাভারত যেমন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বিরচিত এবং সর্ব্বত্র অতি গ্রাহ্য গ্রন্থ, হরিবংশও তাহাই।

শিষ্য। অনেকে বলেন, হরিবংশ ব্যাসকৃত নহে। ব্যাসের নাম দিয়া মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া উহা অন্য কোন একজন লেখক প্রচার করিয়াছেন।

গুরু। কি পরিতাপ! কি দুর্দ্দিন! হিন্দুর সকল গ্রন্থই জাল-জুয়াচুরিতে পরিপূর্ণ। লোকের আর কাজ ছিল না, গ্রন্থ লিখিয়া লিখিয়া কেবলই ব্যাসের লেখায় প্রক্ষিপ্ত করিত! এমন বুদ্ধির বালাই লইয়া মরি। তখন এদেশে শাস্ত্র গ্রন্থের বহুল প্রচার ছিল, তখন ব্রাহ্মণ মাত্রেই তপস্বী ও বিদ্বান্ ছিলেন,—তখন আমাদের মত রাম শ্যাম বিজ্ঞাপনের জোরে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইতে পারিত না—তখন সকলকে মুখে মুখে গ্রন্থপাঠ শিক্ষা করিতে হইত, তখন সদ্ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও কথা কেহ উপদেশস্বরূপ গ্রহণ করিত না,—আর তখনই যত জাল গ্রন্থের প্রচার হইয়া গেল! এরূপ হইলে, সেই জালিয়ৎ রচয়িতাকে রাজা দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেন, সমাজের লোক তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতেন, এবং তাহার

সেই জাল রচনা আসল পুস্তক হইতে বাহির করিয়া সর্ব্বভুকের উদরে নিক্ষিপ্ত হইত।

ঐ সকল নব্য শিক্ষিতের কথার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া, এক ঝক্‌মারি। সে সকল যুক্তি—সে সকল তর্ক—অদ্ভুত। তাহার কোন মূল নাই, কোন হেতু নাই;—কেবল গায়ের জোরে শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকের মনে এক ভ্রান্ত ধারণার বীজ বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। ইহারা দেশের শত্রু কি মিত্র, তাহা ভগবানই জানেন—কিন্তু হায়! একে সাধারণের উদরান্নের জন্য শাস্ত্রচর্চ্চা করিবার সময় নাই, তাহার উপর আবার যে নয়নে শাস্ত্র-পাঠ করিতে হয়, তাহাতে গরল মাখাইয়া দেওয়া হইতেছে। সংসারের পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা যুড়াইবার জন্য যে দুই এক মুহূর্ত্ত ঋষির পদচ্ছায়ায় শান্তিলাভ করা যাইবে,—এখন তাহারও আর উপায় থাকিতেছে না। সন্দেহ হইবে, ইহা বাস্তবিক সেই ঋষির পদচ্ছায়া কি অন্য কোন অজ্ঞাত-কুল-শীলের পদচ্ছায়া। যেমন ভক্তির ধন পিতা-মাতাকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে গিয়া 'ইঁহারা আমার পিতা মাতা কি না' এইরূপ সন্দেহ হইলে মনে দারুণ কষ্টের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ শাস্ত্র পাঠ করিতে গিয়াও হইতেছে। সকলে শাস্ত্র-গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিতে পারেন না,—সকলের ক্ষমতায় কিছু শাস্ত্র-রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন সম্ভবপর নহে,—সকলে কিছু সমগ্র শাস্ত্র দর্শন ও আলোচনা করিয়া তাহার তত্ত্বরহস্য উদ্ভেদ করিতে সক্ষম হন না;—তাঁহাদের হৃদয়ে দুইটা বাজে কথা বলিয়া, মনোমত দুই একটা খণ্ড বচন উদ্ধৃত করিয়া যদি শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহ ঘটনা করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে কি সমাজে কুফল ফলেনা? এই জন্যই সাধারণ ইংরাজী পড়া ও ইংরাজী ভাবাপন্ন অনেক অল্প অল্প বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এখনকার লেখকগণের লিখনভঙ্গী

অদ্ভুত—অর্থশূন্য। তাঁহারা বেদকে অভ্রান্ত বলিবেন, পরন্তু উহার অর্থে সংশয় প্রকাশ করিবেন ; পুরাণকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবেন কিন্তু উহা ব্যাসরচিত নহে বলিয়া প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিবেন ; মনুকে ভক্তি করিবেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচার আহার-বিহারের অন্তরায় কতকগুলি নিয়ম তাহাতে বিধিবদ্ধ থাকায়.সেগুলি আধুনিক রচা বলিয়া বাদ দিতে চেষ্টিত হইবেন ; মহাভারত ইতিহাস ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মান্য করিবেন, কিন্তু নিজ মতবিরুদ্ধ অংশগুলি উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিবেন। তাঁহাদের মত এই যে, ব্যাস বলিয়া কেহ ছিলেন কি না, অথবা একটি পণ্ডিতসমাজকে ব্যাস বলিত, কি ব্যাস মানুষের উপাধি ছিল,তাহারই স্থিরতা নাই ! এ সকল যুক্তি বলাই অসামান্য। ইহার কোন উত্তর নাই, যুক্তি নাই। সুতরাং এখন এতৎসম্বন্ধে তোমাকে কি বুঝাইব বল ? তবে এস্থলে তোমাকে একটি কথা বলিব এই যে, হরিবংশ আধুনিক কবির লিখিত আধুনিক গ্রন্থ নহে। উহা ব্যাসদেব-বিরচিত হরিবংশ-কাহিনী। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণই একরূপ প্রধান নায়ক—আদ্যন্তই প্রায় তাঁহার কথাতে পরিপূর্ণ। কিন্তু কোথাও তাঁহার জন্ম-পরিচর্য্যাদির ধারাবাহি বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ বিষয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য মহাভারতকার সত্যবতী-নন্দন ব্যাসদেব এই হরিবংশের রচনা করেন। সৌতি এই হরিবংশের কথা মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহ-পর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন ;—যথা—

অষ্টাদশৈব সূক্তানি পর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
খিলেষু হরিবংশশ্চ ভবিষ্যশ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশশ্লোকশতানি চ।
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা ॥

অতএব, ইহা যে ব্যাসবিরচিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

শিষ্য। কেহ কেহ বলেন, "হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশপর্ব্বের অল্পকালবর্ত্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষ্ণুপর্ব্ব তাহাতে অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" * আর আপনি মহাভারতের পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায়ের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন, তাহাতে হরিবংশ এবং ভবিষ্যপর্ব্বের কথা আছে,—বিষ্ণুপর্ব্বের কোন কথাই নাই। ইহাতে বিষ্ণুপর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই জ্ঞান হয়।

গুরু। হরিবংশে তিনটি পর্ব্ব আছে—হরিবংশপর্ব্ব, বিষ্ণুপর্ব্ব ও ভবিষ্যপর্ব্ব। বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল হইতে আর লীলার সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশপর্ব্বে যদুকুলের কথা প্রভৃতি আছে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইবেন, শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে অনেক স্তবগাথা শুনাইলেন— আর ভবিষ্যপর্ব্বে সর্পসত্রকারী জনমেজয়ের কথা ও তাঁহার বংশাবলীর কথা আছে। এখন আদি গ্রন্থকার হরিবংশপর্ব্বে ভগবান্ মর্ত্ত্যধামে দেবকী-গর্ভে আবির্ভূত হইবেন, এই বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে ভবিষ্যপর্ব্বে জনমেজয়ের কথা লিখিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য হইল না। কেন না, বিষ্ণুপর্ব্ব তখন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের বংশ-কথা ও তাঁহার লীলা-কথা লিখিতে গিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বিষয় লিখিয়া এবং তিনি দেবকীগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন, লিখিয়াই —একেবারে জনমেজয়ের কথা পাড়িয়া বসিলেন? তারপরে অপর একজন "বেশ রচিয়াছি" বুঝিয়া আপন রচা বিষয় হরিবংশের মধ্যে পূরিয়া দিলেন? এ সকল কথার কোন মূল্য নাই। তবে আমি যে

* বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র ;—৯৮ পৃঃ।

শ্লোক তোমাকে শুনাইয়াছি—উহাতে যে হরিবংশপর্ব্ব ও ভবিষ্যপর্ব্বের কথা আছে এবং বিষ্ণুপর্ব্বের নাম উল্লেখ নাই তাহার কারণ আছে। হরিবংশের প্রথম পর্ব্ব হরিবংশপর্ব্ব, মধ্যপর্ব্ব বিষ্ণুপর্ব্ব এবং অন্ত্য পর্ব্ব ভবিষ্যপর্ব্ব। আদি ও অন্তের কথা বলিলে মধ্য উহ্য থাকে। যেমন বৈশাখ হইতে আশ্বিনমাস, রবি হইতে বৃহস্পতিবার; ইত্যাদি। যদিও ইহাতে 'হইতে' পদ সন্নিবিষ্ট আছে. কিন্তু বঙ্গভাষায় ঐরূপ থাকে। ফল কথা, আদি ও অন্ত্যপদের উল্লেখ থাকিলে, মধ্য পদ ধরিয়া লইবে না, এমন কথা বুঝিবার কোন কারণই নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পুরাণ-গ্রন্থ।

শিষ্য। আপনি ইতঃপূর্ব্বে নারদ পঞ্চরাত্রের কয়েকটি শ্লোক পড়িয়া শুনাইয়াছেন;—নারদ পঞ্চরাত্র কি প্রামাণিক গ্রন্থ?

গুরু। হাঁ, নারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থ খানি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেই সবিশেষ মান্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রকার ও হলায়ুধ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ নারদ পঞ্চরাত্রের বচন সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং উহার বচন প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, নারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থ হিন্দু-সমাজে এবং হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ-নিচয়ের মধ্যে সমধিক প্রামাণিক গ্রন্থ, সন্দেহ নাই।

শিষ্য। এখন পুরাণ-সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। পুরাণসম্বন্ধে কি শুনিতে চাহ?

শিষ্য। পুরাণের মতে আমাদের দেশে ধর্ম্ম, কর্ম্ম সমুদয় প্রচলিত—আমরা দেবদেবীর পূজা করি, ব্রতনিয়ম করি, শ্রাদ্ধতর্পণ করি,—ফল কথা যাহা কিছু ধর্ম্মকার্য্য করি, তাহার অধিকাংশই পৌরাণিক। সেই পুরাণসম্বন্ধে আমার অনেক কথা শুনিতে ইচ্ছা আছে।

গুরু। অন্যান্য কথা সময়ে শুনিও—এক্ষণে কেবল রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক, তাহাই বল।

শিষ্য। পুরাণ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য কথা আছে অনেক। পুরাণ কয় খানি?

গুরু। পুরাণ আঠার খানি। তদ্ভিন্ন উপপুরাণ অনেক আছে।

শিষ্য। আঠার খানি পুরাণের নাম কি?

গুরু। আঠার খানি পুরাণের নাম ও শ্লোকসংখ্যা বলিতেছি শোন,—

> পুরাণসংখ্যাসম্ভূতিমস্য বাচ্য প্রয়োজনে।
> দানং দানস্য মাহাত্ম্যং পাঠাদেস্তু নিবোধত॥
> ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
> শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং।
> দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি।
> মার্কণ্ডং নব বাহ্নঞ্চ * দশপঞ্চচতুঃশতম্॥
> চতুর্দ্দশ ভবিষ্যং স্যাৎ তথা পঞ্চশতানি বৈ।
> দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশৈব তু॥

---

* অগ্নিপুরাণম্।

চতুর্ব্বিংশতি বারাহমেকাশীতি সহস্রকম্।
স্কান্দং শতং তথাচৈকং বামনং দশকার্ত্তিতম্॥
কৌর্ম্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্ত্ব চতুর্দ্দশং।
একোনবিংশং সৌপর্ণং * ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু॥

অতএব, প্রাগুক্ত আঠার খানি পুরাণকেই পুরাণ নামে অভিহিত করা হয়, ইহা ব্যতীত অন্যান্য সমস্তই উপপুরাণ।

শিষ্য। এই পুরাণগুলির প্রণেতা কে?

গুরু। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস পুরাণ সকলের প্রণেতা বলিয়া জানি।

শিষ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই সকল পুরাণের বয়স এক সময়ে নহে। এমন কি হাজার বৎসর অগ্র পশ্চাতেও ইহাদের বয়স নির্ণীত হইয়াছে। †

গুরু। যে দেশে পুরাণ সকলের জন্ম, যে দেশের লোক পৌরাণিক যুগ হইতে পুরাণের পূজা ও পৌরাণিকমতে ক্রিয়া-কলাপ করিয়া আসিতেছে,—যে দেশের লোকের মুখে মুখে পৌরাণিক গাথা গীত হয়, সে দেশের লোক পুরাণের বিষয় যাহা অবগত আছে, তাহা সত্য নহে;—আর কয়েক দিনের জ্ঞানশালী ইয়ুরোপের লোক পুরাণসম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহাই সত্য, এমন কথা ইংরেজী পাঠে বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ বুঝিতে পারে না। উইলসন সাহেব বলেন, কোন পুরাণই সহস্র বৎসরের উপরে লিখিত হয় নাই। কিন্তু একটা কথা বলিলেই এ মত কৈ অভিভ্রান্ত, তাহা বুঝিতে পারিবে। কালি-

* গরুড়পুরাণম্।

† উইলসন সাহেব ঐরূপই লিখিয়াছেন

দাস বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ ৫৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনু শোভিত মেঘের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুর গোপবেশ নাই—বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। অথচ পুরাণভিন্ন গোপবেশের বর্ণনা কিছুতেই নাই,—এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় কি, যদি হাজার বৎসরের অধিক কোন পুরাণেরই বয়স না হয়, তবে কালিদাস বিষ্ণুর গোপ-বেশের বর্ণনা কিসে পাঠ করিলেন ? শাস্ত্রে ব্যাসদেববিরচিত অষ্টাদশ পুরাণ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। অতএব, আমার বিশ্বাস, অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসেরই বিরচিত।

শিষ্য। আমাদের দেশের লোকেও বলেন যে, আঠারখানি পুরা-ণই ব্যাসের রচিত নহে। কারণ, আঠারখানি পুরাণের আঠার রকম ভাষা। একজনের হাতের লেখা যেমন একই রকমের, তদ্রূপ রচনা-ভঙ্গীও একই প্রকারের হইয়া থাকে।

গুরু। ইহাতেও কিঞ্চিৎ বিচার আছে।

শিষ্য। কি ?

গুরু। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, পৌরাণিকযুগে লিপি বিস্তার বড় প্রচলন ছিল না। মুখে মুখে গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হইত। এমন হইতে পারে, ব্যাসদেব যে বিষয় বলিয়া দিতেন, তাঁহার শিষ্য-গণ তাহার ভাষা ও অলঙ্কার প্রভৃতির অঙ্গরাগ করিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন। পুরাণ অর্থে পুরাতন। অতএব, ব্যাসবিরচিত সেই পুরাতন বিষয় তাঁহার শিষ্যেরা নূতন করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতেন।

শিষ্য। ব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ পুরাণ, ইহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে ?

গুরু। আছে বৈ কি।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, ব্যাস কাহারও নাম নহে, উপাধি। এমনও হইতে পারে—বিভিন্ন কালের বিবিধ ব্যক্তি যিনিই যখন পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তিনিই তখন ব্যাস নামধারণ করিয়াছেন। এক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের রচিত বা কথিত সমস্ত পুরাণ নহে।

গুরু। না, আঠারখানি পুরাণই এক ব্যাসের লেখা। শাস্ত্রে আছে ;—

অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমতুলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্॥

সত্যবতীসুত ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া তৎপরে ভারতাখ্যান বা মহাভারত রচনা করেন। ব্যাস পুরাণরচয়িতার উপাধি নহে। সত্যবতীসুত ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া তৎপরে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, একথার স্পষ্টতর শাস্ত্রীয় বচন তোমাকে শুনাইয়াছি। ঐ রচনাটি মৎস্যপুরাণের। অতএব পুরাণ মাত্র করিয়া ব্যাসের নামোপচার করেন নাই বা ব্যাস উপাধিধারী বহুলোকের লেখা নহে। আমি শুনিয়াছি, বর্ত্তমান কালের অনেকে বিভিন্ন পুরাণে একই প্রকার ও এক ভাবের বর্ণনা পাঠ করিয়া অনুমান করেন, উহা এক গ্রন্থকারের লেখা, অন্যে অপহরণ করিয়া লইয়াছেন—এমন কি, এক পুরাণে, এক বিষয়ের বর্ণনা আছে, অপর পুরাণের সেই বর্ণনা ঠিক এই ভাষায় এক কথায় লিখিত হইয়াছে। এক গ্রন্থকার এক বিষয়ক পুনরুল্লেখের সময় তাঁহার পূর্ব্বকার লিখিত বিষয়টি তুলিয়া অন্য গ্রন্থে সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন—নূতন রচনা করিবার প্রয়োজন বুঝেন নাই। ইহাতে একজনের বিরচিত গ্রন্থ যে আঠারখানি গ্রন্থ, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

শিষ্য। অনেকে বলেন,—আঠারখানি পুরাণ যদি এক জনেরই লেখা হইত, তবে একই বিষয় দুই তিনখানি গ্রন্থে লিখিবার প্রয়োজন হইত না। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কথাই আলোচিত হইত। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত এতগুলি পুরাণে কৃষ্ণকথার—কৃষ্ণলীলার আলোচনা কেন হইবে? একখানিতে কৃষ্ণকথা থাক, অন্যখানিতে অন্য বিষয় থাক—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহারা বলেন, একজন গ্রন্থকার, গ্রন্থ লিখিতে হইলে, ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ই লিখিয়া থাকেন।

গুরু। পুরাণ জিনিষটা কি, হিন্দু ভাবে তাহা জানা থাকিলে, কেবল ঐ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আঠারখানি পুরাণের আঠারজন লেখক স্থির করা চলিত না। পুরাণ কল্পের ইতিহাস। এক এক কল্পের ইতিহাসকে এক একখানি পুরাণ বলে। ব্রহ্মার এক এক দিনের নাম এক এক কল্প।

পুরাণ অর্থে পুরাতন। পুরাণ কথা, অর্থাৎ অতীত ঘটনাবলী—কতক সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অপরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে, কতক নারদের কাছে, কতক পরাশরের কাছে, সংগ্রহ করিয়া ব্যাসদেব পুরাণগুলি প্রণয়ন করেন। কিন্তু সকল কল্পেই ধর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ পৃথক্—তাই রচনা বিষয়ও কিঞ্চিৎ পৃথক্। তবে কৃষ্ণকথাদি সর্ব্বত্রই একরূপ—কাজেই একই রচনা, ভিন্ন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যে যে কল্পে কৃষ্ণলীলা আছে, সেই সেই কল্পের পুরাণেই তাহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, অন্য পুরাণে নাই।

শিষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতকে অনেকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, দেবীভাগবতই অষ্টাদশপুরাণের মধ্যে একখানি পুরাণ,—শ্রীমদ্ভাগবত নহে। শিবপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের প্রত্যেকের নাম

সকল যোগরূঢ়ার্থে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে ;—

ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং তত্র বিদ্যতে।

তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং ন তু দেবীপুরাণকম্॥

তারপরে শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের যখন টীকা করেন, তখন দেবী-ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণ নহে, ইহা লইয়া বিচার বিতর্ক করেন, এবং বৈষ্ণব ও শাক্তগণের মধ্যে ইহা লইয়া অনেক বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছে এবং অনেক পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছে। অতএব এই সকলের আলোচনা করিলে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, দেবী-ভাগবত কি শ্রীমদ্ভাগবত কোন্‌খানি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত, তাহা স্থির করা দুর্ঘট। অধিকন্তু অনেকে বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত আদৌ ব্যাসদেবের বিরচিত নহে। উহা বোপদেব-বিরচিত। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক।

গুরু। একথা হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন না। ইহা নিতান্তই অগ্রাহ্য মত। মহাপুরাণান্তর্গত পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে ;—

অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বাং সত্যবতীসুতঃ।

নাপ্তবান্ মনসা তোষং ভারতেনাপি ভামিনি।

চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্॥

হে ভামিনি! সত্যবতীনন্দন ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত নামক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াও যখন অন্তরে আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগবত সংহিতা রচনা করিলেন।

এই বচনটিতে কোন কোন গ্রন্থে 'অষ্টাদশপুরাণানি'র স্থলে 'দশ সপ্ত পুরাণানি' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে অন্যান্য

পুরাণের সহিত মতবিরোধ ঘটে। এখন শাক্তেরা বলেন. ব্যাসদেব পূর্ব্বে যে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন, এবং তদন্তর্গত যে ভাগবত পুরাণ, তাহা দেবীভাগবত, এবং পরে বিষ্ণুভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই। বৈষ্ণবেরা বলেন,—না, তাহাই বিষ্ণুভাগবত। ইহা লইয়া বিবাদ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত যে বোপদেবকৃত, এমন সিদ্ধান্ত—নিতান্ত হাস্যাস্পদ। কেন না, পদ্মপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত, তাহাতে মতভেদ নাই। তাহাতে যখন দ্বিতীয় ভাগবত ব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন সে মহাপুরাণ না হউক, কিন্তু ত্রয়োদশশতাব্দীর দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্ বোপ-দেব পণ্ডিতের যে উহা রচনা নহে, ইহা নিশ্চয়।

শিষ্য। সত্য কথা। কিন্তু যদি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যেই না হয়, তবে উহার কথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে কেন?

গুরু। মহাভারত, রামায়ণ পুরাণ নহে,—তাহার কথা কি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না? বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, স্মৃতি পুরাণ নহে,—তাহার রচনা কি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না? শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ কি না, সে বিচার বিতর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনা করিয়া ব্যাসদেব চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিয়া মলিনাবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন। এ মলিনতার হেতু কি,—না, তিনি যাহা প্রকাশ করিবেন বলিয়া এত লিখিলেন, এত পরিশ্রম করিলেন, বুঝি তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তাই তাঁহার প্রাণের ক্ষোভ দূর হইল না। তাই এত মহাগ্রন্থ লিখিয়াও তিনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না। অথচ প্রাণের সেই মহাভাব ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিল

না। একথা পুরাণান্তরে বেদব্যাস নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা,—

বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতন্তথা।
কৃত্বা সংমোহ-সংমূঢ়োঽভবং রাজন্ মনস্যপি॥

অর্থাৎ—হে রাজন্! আমি বেদ সমস্ত বিভাগ, বৈদিক শাখা, পুরাণ, বেদান্তসূত্র ও মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করিয়াও অবিদ্যাজনিত প্রবল মোহে সম্যক্ অভিভূত হইয়াছি।

তারপরে ব্যাসদেবের সেই মোহ নিবারণার্থে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব-বিবেক জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, এবং সেই জ্ঞানের অমৃত ফল শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকী উপদেশ হইতে উৎপন্ন। পাদ্মকল্পের প্রারম্ভেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা মায়াবিমোহিত হইলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে চতুঃশ্লোক ভাগবতের উপদেশ দেন,—পরে ব্রহ্মা স্বীয় মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উহা উপদেশ করেন। তদনন্তর দ্বাপরযুগে বেদব্যাস সমস্ত গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াও যখন 'যাহা বলিবার, তাহা বলা হয় নাই', এই ভাবে অপ্রসন্ন চিত্তে নির্ব্বেদ অবস্থায় ছিলেন, তখনই নারদ তাঁহাকে ঐ চতুঃশ্লোকী উপদেশ প্রদান করেন,—সেই উপদেশ লাভ করিয়াই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন।

এখন কথা এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত যদি পুরাণই না হয়, তবে তাহা যে হিন্দুর প্রামাণ্য গ্রন্থ হইবে না, এ তর্ক আসিল্ল কোথা হইতে? ব্যাসের বেদান্ত দর্শন, মহাভারত, উপনিষদ্ প্রভৃতি যদি পুরাণ না হইয়াও প্রামাণ্য হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবত না হইবে কেন? অধিকন্তু ইহা অবিদ্যা-বিনাশিনী প্রকৃতি-পুরুষের লীলাবধারিত মহাবিদ্যা।

শিষ্য। বিরুদ্ধমতবাদীরা বলেন, ইহা ব্যাসদেবের লেখা না

হইবার আরও একটি কারণ এই যে, পুরাণাদিতে ব্যাসদেব যেরূপ ভাষাদি ব্যবহার করিয়াছেন, ভাগবতের ভাষা সেরূপ নহে—উহা কিছু কট্‌মটে।

গুরু। বিষয় লইয়া ভাষা। শ্রীমদ্ভাগবতখানি আদ্যন্ত দার্শনিক তত্ত্ব। কাজেই আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এইরূপ গোটাকয়েক শব্দ ব্যবহার করিলেই লেখাটা কট্‌কটে হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাসদেব পুরাণের লেখক, এবং বেদান্তশাস্ত্রেরও লেখক—কিন্তু সে স্থলেও ভাষার সবিশেষ তারতম্য আছে।

অতএব অন্য বিচার বিতর্কে আমাদের মূলে বিষয়ের অধিক দূরবর্ত্তী না হইলেও আমরা এতাবতা ইহা জানিতে পারিলাম যে, শ্রীমদ্ভাগবত পরাবিদ্যাপরিপূর্ণ ব্রহ্মকথা। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেবের দৈবযোগের অমৃত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেবের সুলিখিত গ্রন্থ। অতএব উহা হিন্দুর পরম পবিত্র ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

শিষ্য। পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যাহা এখন প্রচলিত আছে, তাহা নাকি ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ? অর্থাৎ এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ দেখা যায়, তাহা আসল নহে, আসলখানি বিলুপ্ত করিয়া আধুনিক কোন ভট্টাচার্য্য নাকি এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন?

গুরু। একথা কে বলিল?

শিষ্য। কৃষ্ণচরিত্র-প্রণেতা বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন।

গুরু। অসঙ্গত কথা। তিনি মৎস্যপুরাণের যে বচনটির উপর নির্ভর করিয়া ঐমত প্রচার করিয়াছেন, সে বচনটি এই ;—

রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্ ॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্র্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ—"যে পুরাণে রথন্তর কল্প বৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্য সংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন, এবং যাহাতে পুনঃপুন ব্রহ্মবরাহ চরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশসহস্র শ্লোক সংযুক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।"

এই বচনের উপরে নির্ভর করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন,—"এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না। নারায়ণ নামে অন্য ঋষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথন্তর কল্পের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, এবং ব্রহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গ মাত্র নাই।" অতএব তাঁহার মতে বর্ত্তমান প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ভ্রষ্ট, অর্থাৎ উহা এখনকার কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচনা! আরও এক অপরাধে তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকে ভ্রষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে অপরাধ এই যে, "ইহাতে ষষ্ঠীমনসারও কথা আছে।" ষষ্ঠীমনসার কথা থাকিলে সে পুরাণ ভ্রষ্ট হইবে কেন? তাহা হইলে পদ্মপুরাণও ভ্রষ্ট, বিষ্ণুপুরাণও ভ্রষ্ট এবং অন্যান্য অনেক পুরাণই ভ্রষ্ট।

আর পূর্ব্বোক্ত বচন, যাহা মৎস্যপুরাণের বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহা বাস্তবিক মৎস্যপুরাণের কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। দুই

একটি জঘন্য সংস্করণের মৎস্যপুরাণে ঐ দুইটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বোম্বে হইতে প্রকাশিত দুই তিনখানি মৎস্যপুরাণ আমি দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে ঐ শ্লোকটী নাই। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত আগে রাধাকৃষ্ণদ্বেষী এবং ঘোর শাক্ত ছিলেন, তাঁহারা কোন উপপুরাণ হইতে বা নিজকৃত ঐ শ্লোকদ্বয় মৎস্যপুরাণে গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের সময়। আরও এক কারণে এই কথা বলা যাইতে পারে। অষ্টাদশ মহাপুরাণান্তর্গত শিবপুরাণে অষ্টাদশ মহা-পুরাণের প্রত্যেকেরই নাম সকল যোগরূঢ়ার্থে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে ;—

বিবর্ত্তনাদ্‌ব্রহ্মণস্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে।

যাহাতে বিশেষরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সেই পুরাণই ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত নামে আখ্যাত।

ইহাতে ব্রহ্মের বিবর্ত্তন বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। অতএব অন্য কোন কথা নাই।

যাহা হউক মৎস্যপুরাণের ঐ সন্দেহযুক্ত বচন দুইটির উপর নির্ভর করিয়া প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকে কখনই ভ্রষ্ট বলা যাইতে পারে না। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুর সিদ্ধান্ত এই যে, "এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত না হইলেও অন্ততঃ একাদশ-শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। * * *এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না, এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ

অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক "মেঘৈ-র্মেদুরমম্বরম্" ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না। অতএব এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্তও একাদশশতাব্দীরও পূর্ব্বগামী।"

এখন কথা এই যে, যদি এত দিনের ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইবে,তবে আসলখানি যে, কোন স্থানে থাকিতে পারে, এবং সময়ে তাহা প্রকাশ হইতে পারে, এ ভয় নূতন ব্রহ্মবৈবর্ত্তরচয়িতা একটু মাত্রও করিলেন না? এখন মুদ্রাযন্ত্র হইয়াছে, পুরাতন পুস্তকাদি রক্ষার জন্য রাজা যত্ন চেষ্টা করিতেছেন, অন্যান্য লোকও সাময়িক পত্রে পুরাতন হস্ত-লিখিত গ্রন্থাদির সংবাদ ঘোষণা করিতেছেন, সুতরাং এখন কোন্ গ্রন্থ কোথায় আছে না আছে, তাহার অনেকটা সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি। কিন্তু বঙ্কিম বাবু যখনকার কথা বলিতেছেন, তখন কিছু এসকল সুবিধা ছিল না। তখন একজন আসলের বদলে একখানি নূতন নকলগ্রন্থ প্রচার করিলেন, আর দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলী তাহাই আসল বলিয়া গ্রহণ করিলেন! আর তাঁহার মনে এমনও একটু ভয় হইল না যে, যদি আসলখানি কোনস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তবে আমাকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হইবে। যদি বলা যায়, তিনি যখন বেনামী করিয়া রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার অপদস্থ হইবার আশঙ্কা ছিল না। থাকুক,—কিন্তু ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তের মত অতবড় একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করাও কিছু অল্প পরিশ্রমের কর্ম্ম নহে,—সে "হাড়ভাঙ্গা" খাটুনীটাও ব্যর্থ যাইবে! অতএব একখানির বদলে আর একখানি প্রচার করা অসঙ্গত।

বঙ্কিমবাবু আর একস্থলে বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামগন্ধ-মাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই নূতন বৈষ্ণব-

ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন করিয়াই গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্য-দেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল ঋষি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন।" *

কেন করিলেন, তাহা আমাদিগের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পুরাণান্তরে উক্ত হইয়াছে যে,—"বিবর্ত্তনাদ্‌ব্রহ্মণস্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে।" ব্রহ্মের বিবর্ত্তবাদ লইয়াই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ লিখিত। কাজেই ইহা বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে আধিপত্য করিয়াছে।

জ্ঞানের শুষ্ক কঠোর তত্ত্বে জ্বলিতকণ্ঠ মানব-মানবীর শীতল অমৃতধারা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রবাহিত। সেই রসামৃত পান করিয়া বাঙ্গালী জীবন কৃতার্থ হইয়াছে, তাই সকলের চেয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের আধি-পত্য বাঙ্গালীর উপরে। বঙ্কিমবাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থারম্ভে যে বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণ নাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলী, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখা পড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধে কৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে কৃষ্ণ!" বলিয়া

* কৃষ্ণচরিত্র,—১১২ পৃ।

আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি ;—বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধে কৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বব্যাপক।"—এই সর্ব্বব্যাপকতা ভগবানের কৃষ্ণাবতার এবং তদ্বিষয়ক বর্ণনারূপ অমৃত-সমুদ্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

তারপরে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ব্ব সময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইহাঁরা ভগবান্‌কে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর,—ননীমাখন চুরি করিয়া খাইতেন, কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন।"

সমগ্র হিন্দু—সমগ্র ভক্ত—সমগ্র বাঙ্গালী উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন, "ছি ছি, আমরা ভগবান্‌কে সেরূপ ভাবিব কেন? যাহারা বিধর্ম্মী, যাহারা হিন্দুশাস্ত্র বুঝে না, যাহারা হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় দার্শনিকতা বুঝে না, তাহারাই অমন কথা বলে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হিন্দুকে বলিয়া দিয়াছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

আর মায়ার চক্ষুতে তাঁহার মধুরলীলা যাহা অপবিত্র ও অশ্লীল বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহারও অভ্যন্তর ভক্ত জানেন। আমি কৃষ্ণ-ভক্তের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সেই সকল কথাই বলিবার চেষ্টা করিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রচনাভঙ্গী।

শিষ্য। অধিকাংশ লোকের মত, তথা আমি নিজেও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ করিয়া যে মত গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই যে, উহার বর্ণনাপ্রণালী এবং বর্ণনীয় বিষয় শ্লীলতাহীন। পিতা পুত্রের নিকট, শিষ্য গুরুর নিকট উহার সর্ব্বস্থান পাঠ করিতে পারেন না। অতএব উহা ব্যাসের লিখিত পুরাণ বলিয়া গণ্য না হইবার ইহাও এক অন্যতম কারণ।

গুরু। উপনয়নের উদাস-ভাবব্যঞ্জক মন্ত্রগুলি যে বেদে আছে, শ্রাদ্ধের শোকপূর্ণ মন্ত্র যে বেদে আছে, আবার বিবাহের ও গর্ভাধান সংস্কারের মন্ত্রগুলিও সেই বেদে আছে। বলা বাহুল্য, বিবাহ ও গর্ভাধান সংস্কারের মন্ত্রগুলি স্থূলচক্ষে শ্লীলতাহীন। তবে কি বলিতে হইবে, বিবাহ ও গর্ভাধানের মন্ত্রগুলি বৈদিক নহে ;—উহা কোনও ভট্টাচার্য্য এক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আপনার রচা কথাগুলি বেদের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, আর অন্যান্য পণ্ডিতগণ অবাধে সেই চুরি করা মাল প্রচার করিয়া দিয়াছেন ?

শিষ্য। সে বিবেচনা করা যায় না,—তাহা অবস্থাভেদের মন্ত্র। বিবাহের সময়, গর্ভাধানের সময় যাহা প্রয়োজন, তাহাই সে মন্ত্রে আছে,—আবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের সময় বা মৃতাত্মার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা সেই সেই কর্ম্মের সময় পঠিত হইয়া থাকে, এবং সেই

উদ্দেশ্যে লিখিত বা রচিত হইয়াছিল। আর ব্রহ্মবৈবর্ত্তের আগা-গোড়াই ঐ দোষ-দুষ্ট।

গুরু। ব্যাসদেব ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আঠার প্রকারের আঠার-খানি পুরাণ রচনা করেন। প্রসঙ্গাধীন যদিও এক বিষয়ের উল্লেখ দুই তিনখানি বা ততোধিক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রত্যেকের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উদ্দেশ্য, জগতের এক সর্ব্বপ্রাণীর কাঙ্ক্ষিত আকর্ষণের নিবৃত্তিকারক ভগবানের লীলা বর্ণনা করা। সেই গুপ্ত অথচ কীট পতঙ্গ হইতে জীবজগতের সর্ব্বোচ্চ প্রাণী মানব-মানবী যে আকর্ষণে উন্মত্ত, যাহার জন্য ধর্ম্মকর্ম্ম বিস্মৃত, যাহার জন্য জন্মে জন্মে পাপভারাক্রান্ত,—তাহারই পূর্ণাস্বাদন প্রদান ও নিবৃত্তি করা—সুতরাং তাহার বর্ণনা অবশ্যই শ্লীলতা-রহিত হইবে বৈ কি? তাহার আগা-গোড়া, তৎসম্বন্ধীয় মানবজীবনের জন্মজন্মান্ত-রের সংবাদ না জানাইলে চলিবে কেন? তাহার ভালমন্দ না বুঝাইলে হইবে কেন? তাহার পূর্ণাস্বাদ প্রাপ্তির কথা প্রচার না করিলে সে আকর্ষণের অনলে শীতল জলধারা বর্ষিত হইবে কেন? সেই জ্বালা জুড়াইতে, সেই দাবানল নিবাইতে শ্রীহরির মধুর লীলা। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আরও সে সকল কথা স্পষ্টীকৃত হইবে বলিয়া কিঞ্চিৎ জড়ান ভাব আছে। তুমি আমি বা পণ্ডিতাভিমানী শিরোমণি তর্কালঙ্কার সে 'জড়ান ভাব' বুঝিতে পারি না। যাঁহার প্রেমের চক্ষু যথার্থ গুরুদ্বারা উন্মীলিত হইয়াছে, যিনি যোগমায়ার কৃপা লাভ করিয়া-ছেন,—তিনিই উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

শিষ্য। অনেকে বলেন, বর্ত্তমান প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—অবৈয়াকরণিক কলকৌশল দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতিপোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়া-

ছেন। * যে যে স্থলে এবং যে যে বিষয়ের জন্য সামবেদের দোহাই দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই বিষয় বাস্তবিক সামবেদে নাই।

গুরু। ইহা কে জানিতে পারিল? উইলসন সাহেবের বেদের ইংরাজী অনুবাদ বা সেই তৎসমশ্রেণী কোন ইংরাজী অনুবাদ হইতে দত্ত মহাশয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া কোন্ বেদে কি আছে, না আছে, তুমি আমি কেমন করিয়া বুঝিব বল? বেদের একটি বিন্দু-বিসর্গে কত অর্থ, কত বীজ, কত ধ্যানমালা রচিত হয়, তাহা তুমি আমি কি বুঝিব? ক্ষুদ্র (ওঁ) ওঙ্কারে কত ধ্যান, কত মধু, কত বীজ, কত মাহাত্ম্য আছে, না জানিতে পারিলে তুমি আমি কেমন করিয়া স্বীকার করিব? ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বড় আধুনিক হইলেও যখন তান্ত্রিকের শক্তিবাদে জগতে হিন্দুধর্ম্মের দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল,—যখন চৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্য ও প্রেম-ভক্তির মধুর স্রোতে জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ভাসিয়া গিয়াছিল,—তাহার পূর্ব্ববিরচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, তাঁহাদের মতে 'রাধা'-সৃষ্টিকারক এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। সুতরাং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ না জন্মিলে 'রাধা' জন্মিতেন কোথা হইতে?

এখন কথা এই যে, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের যেরূপ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আলোচনা হইয়াছিল,—পণ্ডিতে পণ্ডিতে সম্প্র-দায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ শাস্ত্রের বিচার-বিতর্ক হইত, এখন কি তাহা হয়? এখন আমরা ইংরেজের অনুবাদ পড়িয়া শাস্ত্রদর্শী হই,—সুতরাং তখন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই মিথ্যা জুয়াচুরি—এই অন্যের মিথ্যা দোহাই দিয়া মতপ্রচার করা কি ধরা পড়িত না? ধরা পড়া দূরে থাক, সেই সময় হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব্রহ্ম-

* বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র ;—১৮৩ পৃ।

বৈবর্ত্তপুরাণের আলোচনা সমধিক হইয়াছিল। এখন যে সকল ভুল দেখান হইতেছে, যদি তাহা যথার্থ ভুল হইত, তাহা হইলে সেই বৈয়াকরণিকগণের প্রবল উদ্যমের সময়, সেই শাক্তবৈষ্ণবের বিষম বিবাদের সময় নিশ্চয় তাহা নিষ্কাসিত হইয়া পড়িত। বৈষ্ণবপ্রাণ চৈতন্যদেব একজন খুব বৈয়াকরণিক ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন,—তিনি অবশ্য এরূপ মিথ্যা জালিয়তি গ্রন্থবাক্য কখনই গ্রহণ করিতেন না।

এখন যে জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানদৃপ্ত বাঙ্গালীদিগের আক্রোশ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উপর, তাহা এইঃ—

১। রাধা নামের ব্যুৎপত্তি লইয়া।

২। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার ধ্যান লইয়া।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে, রাধা নামের ব্যুৎপত্তি সামবেদে যাহা উক্ত, তাহারই অনুসরণ করা হইয়াছে। একথার আলোচনা 'শ্রীরাধা' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। আবার শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান,—ইহাও সামবেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত। যথা,—

১। ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং নিবোধ কথয়ামি তে।

২। ধ্যায়েৎ তথা রাধিকাঞ্চ ধ্যানং মধ্যন্দিনেরিতম্।

সামবেদোক্ত এবং মধ্যন্দিন শাখোক্ত শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার ধ্যান করিবে। সে ধ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে।

এখন সামবেদে ঐ ধ্যানদ্বয় নাই, ইহাই আমরা ইংরেজকৃত বেদের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছি।

আছে কিনা, ইহা জানিবার আমাদের অন্য কোন উপায় আছে কিনা, এখন তাহাই বিচার্য্য।

স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, বলিতে হইবে, নাই। কেন না, বেদের সংহিতা শাখা উপনিষৎ অরণ্যক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে। সে সমগ্র এখন পাওয়া যায় না। সামবেদের মধ্যন্দিন শাখা—যাহার উল্লেখ আছে, তাহা দুষ্প্রাপ্য। ইংরেজদের মধ্যে কে নাকি একখানি অনুবাদ করিয়াছেন। তবে সেখানি মধ্যন্দিন কি প্রথমদিন তাহার ঠিক কি? ফলকথা বেদের বিচার হওয়া এখন দুর্ঘট, তার উপরে বেদের সমস্ত কথার সমস্ত তত্ত্বের অর্থবোধ করা আরও দুর্ঘট।

অতএব যে সকল বিষয় আমাদের বুঝিবার উপায় নাই, তাহা লইয়া লম্ফ ঝম্ফ করা অন্যায় ও ধৃষ্টতামাত্র।

একজন বদ্ধ কালা একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। যাত্রাদলে বালকেরা যথানিয়মে নৃত্যগীত করিতেছিল, সে নৃত্য দেখিতে পাইল, কিন্তু গান বা বাজনা শুনিতে পায় নাই। ফিরিয়া আসিলে তাহার বাড়ীর লোক জিজ্ঞাসা করিল,—"কি গান শুনিয়া আসিলে?" সে বলিল—"না, আজ আর তাহারা গায় নাই, নাচিয়া রাখিল।"

আমরাও তাহাই। শাস্ত্রের সকল দিক্ দেখিতে পাই নাই। কোথাও বা নাচিতে দেখি, কোথাও গাহিতে শুনি। অতএব আমাদের বিষয়কর্ম্মকলুষিত চিত্তে শাস্ত্রবিচার করিয়া ঋষিদিগকে মিথ্যাবাদী বলায় অপরাধ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বকথা।

শিষ্য। এক্ষণে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলাকথা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।" কিন্তু এ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রগ্রন্থে নানারূপ বিভিন্ন মতের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

গুরু। কি শুনিতে পাও?

শিষ্য। কোন শাস্ত্রকার শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণ বলেন, কোন শাস্ত্রকার তাঁহাকে বামনের অবতার, কেহ বলেন, তিনি ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার, কেহ বলেন, তিনি পরম ব্যোমের নারায়ণ। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কাহার অবতার?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।" তাঁহারই প্রকটাবস্থা—"জগদেতচ্চরাচরম্।" তাঁহারই দেহে সমস্ত অবতারের স্থিতি,—যিনি যে অবতারের ভক্ত, যিনি যাহার উপাসক, তিনি সেই অবতারের অবতার পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণকে বলিয়াছেন। কেন না, তিনিই বিশ্বরূপ, তিনিই পরমাত্মা ;—অতএব ইহাতে কোন দোষ হয় না। এক্ষণে ঐ কয়টা অবতারের কথা তোমাকে বলি শোন ;—

মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী।
যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্বৃতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ;—৪।১।৩৯।

যাহাতে সর্ব্বগুণের উৎপত্তি হয়, দক্ষকন্যার সেই মূর্ত্তির দ্বারা নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষির উৎপত্তি হয়।

তাঁহাদের জন্মে দিক্ সকল প্রসন্ন, স্বর্গে তূর্য্যনাদ ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। মুনিগণ সন্তুষ্টচিত্তে স্তব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরনিকর প্রসন্নমনে গান এবং দেবাদিগণ পরম কৌতুকে নৃত্য করিয়াছিলেন।

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ;—৪।১।৪৫।

ভগবান্ হরির সেই দুই অংশ, অবনীর ভার হরণার্থ এই দুই কৃষ্ণ-রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন।

অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

যদুকুলে স্বয়ং নারায়ণ এবং কুরুকুলের কৃষ্ণ অর্জ্জুন।

দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র জন্মিয়া সূতিকা-গৃহ হইতেই অন্তর্হিত হয়। ক্রমে ক্রমে কয়েকটি পুত্রের এইরূপ দশা হইলে, ব্রাহ্মণ দ্বারকায় রাজসভায় আসিয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং রাজার পাপে যে রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, তাহা বলিতে লাগিলেন।

রাজসভায় তখন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির সহিত অর্জ্জুনও উপস্থিত ছিলেন। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের ঐরূপ শোকের কথা শুনিয়া দুঃখিত

হইলেন, এবং বলিলেন—"ব্রাহ্মণ, আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব। এবার যখন তোমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিও—আমি মৃত্যুকে জয় করিব, এবং তোমার পুত্রকে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিব।"

তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি এই সভাস্থলের প্রায় কাহাকেও ভালরূপ চিনি না। আপনি কে? ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ও অপ্রতিরথ সঙ্কর্ষণ বাসুদেব প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ইহার মধ্যে আপনি কে?" অর্জ্জুন বলিলেন,—"না না, আমি ইঁহাদের মধ্যে কেহ নহি। আমার নাম অর্জ্জুন। আমি বাহুযুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয়কেও জয় করিয়াছি। অতএব আমি মৃত্যুকে জয় করিয়া তোমার সন্তান রক্ষা করিব।" ব্রাহ্মণ তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণ-পত্নী গর্ভবতী হইলেন, এবং যথাসময়ে তাঁহার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। তখন অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ-কুটীরে আগমন করিলেন ও জলস্পর্শ পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া দিব্য অস্ত্র সকলকে স্মরণ করত জ্যা আরোপপূর্ব্বক গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন, এবং সূতিকাগারে গিয়া ঊর্দ্ধাধঃ তির্য্যক্ চতুর্দ্দিকে নানাস্ত্রযোজিত শর দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর বিপ্রপত্নীর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, এবং সে কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইয়া গেল,—তাহার দেহও সেস্থানে দেখা গেল না।

তখন ব্রাহ্মণ রোদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন, এবং বলিলেন—"কৃষ্ণ! আমি বালকের মিথ্যাবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম। যে কার্য্য তোমা হইতে সম্পন্ন হয় নাই—এবং বলবান্ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই; সামান্য

অর্জ্জুন তাহার কি করিতে পারিবে”? আমার মন্দবুদ্ধি—তাই আপনার উপরেও অর্জ্জুনের কৃতিত্ব মনে স্থান দিয়াছিলাম।

অর্জ্জুনও সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া সমধিক লজ্জিত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণের পুত্রকে আনিয়া দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিদ্যাপ্রভাবে সংযমনীপুরীতে যমের নিকটে গমন করিলেন। সে স্থানে বিপ্রপুত্রকে দর্শন করিতে না পাইয়া ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন,—কিন্তু ব্রাহ্মণ-পুত্র সেখানেও নাই! পরে আগ্নেয়ী, নৈঋতী, সৌম্যা, বায়বী, বারুণীপুরী ও স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া ফিরিলেন; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না। তখন অতিমাত্র লজ্জিত ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপভয়ে অর্জ্জুন অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“অর্জ্জুন, ব্যস্ত হইও না। বিপ্রপুত্রকে আমি তোমায় দেখাইব। আমার সঙ্গে চল।”

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত দিব্যাশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্তগিরি ও লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ঘোরতর অন্ধকারমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় গিয়া রথাশ্বগণের গতি রোধ হইল। তখন মহাযোগেশ্বর হরি সহস্রাদিত্যপ্রকাশতুল্য স্বীয় চক্রকে সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রক্ষেপ করিলে অন্ধকার দূর হইল। অর্জ্জুন চক্রপ্রদীপ্ত রথে দূরে বর্ত্তমান ব্যাপ্ত পরম ভাগবত জ্যোতি দেখিয়া, নিয়ত জ্যোতি দর্শনে চক্ষু মেলিয়া থাকিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে উভয় চক্ষু মুদিত করিতে লাগিলেন। *

তৎপরে তাঁহারা নভঃস্থল হইতে অতিবেগে মহৎ ঊর্ম্মিসঙ্কুল সলিল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই পুরীমধ্যে সহস্রফণায় বিভ্রাজমান, দ্বিসহস্র

উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট শ্বেতপর্ব্বত সন্নিভ নীলজিহ্ব, অদ্ভুত অনন্তমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। পরে দেখিলেন—সেই অনন্তের ফণার উপরে, নিবিড় মেঘবর্ণ, পিঙ্গল-বসন, প্রসন্নমুখ, রুচিরনেত্র, মহাপ্রভাব এক পুরুষোত্তম উপবিষ্ট আছেন। মহামণিসমূহে খচিত কিরীট-কুণ্ডল-প্রকাশে বিরাজিত সহস্র কুণ্ডলবিশিষ্ট, আজানুলম্বিত অষ্টভুজে সুশোভিত, কৌস্তুভের সহিত শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত ও বনমালা বিরাজিত—চতুর্দ্দিকে সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি পার্শ্বদেরা, মূর্ত্তিমান্ চক্রাদি আয়ুধগণ এবং পুষ্টি শ্রী কীর্ত্তি প্রভৃতি অখিল বিভূতি সকল সেই পরমেষ্ঠী-পতির সেবা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া স্তব করিলেন। তখন সেই পরম প্রভু পরমেষ্ঠী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা,
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্,
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥
পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ;—১০।৮৯।৩২-৩৩

হে নর-নারায়ণ, তোমাদিগকে দেখিবার জন্য আমি ব্রাহ্মণ-বালক-গণকে এখানে আনিয়াছি। এখন—এই লও, ব্রাহ্মণবালকগণকে গ্রহণ কর। তোমরা পৃথিবীর ভার হরণ করিতে আমার অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ,—অতএব তাহা সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট

আগমন কর। হে নরনারায়ণ! তোমরা পূর্ণকাম হইয়াও কেবল লোকসংগ্রহের নিমিত্তই ধর্ম্মাচরণ করিতেছ।

তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণবালক লইয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন, এবং অর্জ্জুন ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুত্র প্রদান করিলেন।

নরনারায়ণের কথা এই বলিলাম। এখন ইহাতে কি বুঝা গেল? বুঝা গেল এই যে, অর্জ্জুন নিজ বাহুবল ও পুরুষকার শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক মনে করিতেন। যদি তাহা না করিতেন তবে দ্বারকাবাসী ব্রাহ্মণ- অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রজা। সেই প্রজার অভাব তিনি মোচন করিতে ইচ্ছুক কেন হইবেন? এ গর্ব্ব তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল—কিন্তু কৃষ্ণভক্তজনের এ গর্ব্ব থাকিবে কেন? তাই কৃষ্ণের এই লীলা। অর্জ্জুন দেখিলেন. কৃষ্ণের উপর কোন কার্য্য সম্ভবে না। অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন পুরুষের যাহা কিছু পুরুষত্ব, তৎসমুদয়ই কৃষ্ণানুকম্পিত।

নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের অবতার, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ নর ঋষি পরজন্মে কুরুকুলে অর্জ্জুন ও যদুকুলে নারায়ণ ঋষি পরজন্মে শ্রীকৃষ্ণ ;—যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই পূর্ণব্রহ্ম হইতে পারেন না।

এখন সেই গোড়ার কথা স্মরণ করিতে হইবে—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" সমস্ত অবতারের যে সকল লক্ষণ. যে সকল ভাব, তাহা শ্রীকৃষ্ণের আছে। যত অবতার হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণে আছে। যত অবতারের যত কর্ম্মই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণে আছে। তাই সে জন্মের নর ঋষি, এ জন্মের অর্জ্জুন,—সে জন্মের নারায়ণ ঋষি, এ জন্মের শ্রীকৃষ্ণ। তাই উভয়ে ধরার ভার নিবারণ জন্য সখ্যপ্রেমে আবদ্ধ।

কিন্তু মাত্র নারায়ণ ঋষির অবতার হইলে শ্রীকৃষ্ণ অসুর নিধ-নই করিতেন। অন্যান্য কার্য্যে সক্ষম হইতেন না। রামাবতারের গুণ ও কর্ম্ম, বামন অবতারের গুণ ও কর্ম্ম, ক্ষীরোদশায়ীর গুণ ও কর্ম্ম তাঁহাতে থাকিত না। অনন্তদেবের ফণাশীন বিষ্ণু তাঁহাকে তাঁহার অংশ বলিয়াছিলেন, ইহাতেও তাঁহাকে অংশ বলা যাইতে পারে না ;—কেননা, তাঁহার গুণ ও কর্ম্মও তাঁহাতে বিদ্যমান। অর্জ্জুনের নিকট আপনাদের কর্ম্ম ও পূর্ব্বজন্মের গুণ জানাইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা করণ। তিনি যখন যেথানে, তখন তাহারই মত তবতীর্ণ। সূর্য্যকর আধারভেদে ভিন্নমূর্ত্তি। যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে নারায়ণ ঋষি বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করাইলেন, তিনিই আবার মাতা দৈবকীকে জন্মকালে বলিতেছেন,—

তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ;—১০ ৪।৩৪

দ্বিতীয় জন্মে আমি পুনরায় তোমাদেরই দুইজনের পুত্র হইয়া-ছিলাম। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মিয়া উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত হই। ঐ জন্মে আমার আকৃতি খর্ব্ব ছিল বলিয়া লোকে আমাকে বামন বলিত।

এখন বুঝিয়া দেখ, শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে আপনাকে বামনের পুনর্জ্জন্ম বলিয়া কেন ব্যক্ত করিতেছেন! তাঁহার মাতা তাঁহার নবঘনশ্যাম কায় ও গদাপদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজ প্রভৃতি বিষ্ণুরূপ দেখিয়া ব্রহ্মভাবে স্তব করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুত্রভাবে ভাবিতে বলিয়া দৈব-কীর ও আপনাংশ বামনের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মাতা পুত্র

সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তবে বামনাবতারের গুণ ও কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান ছিল।

এখন ক্ষীরোদশায়ী অবতারের কথা—

দ্বাপরে ধরা পাপভারাক্রান্ত হইয়া গাভীরূপ ধারণ করত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকটে গমন করেন। ব্রহ্মা সেই গাভীরূপিণী পৃথিবীকে এবং অমরগণ ও ত্রিনয়ন শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া পুরুষ-সূক্ত দ্বারা পরম-পুরুষ ভগবান্ জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই এক আকাশ-বাণী ব্রহ্মার শ্রবণগোচর হইল। তখন তিনি অমরবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং,
নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-
র্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥
পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো,
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥

ব্রহ্মা বলিলেন—পরম পুরুষ ভগবানের যে বাক্য শুনিতে পাই-লাম, আমার নিকটে তাহা শোন, এবং তদ্রূপ বিধান কর। ধরণীর যে সন্তাপ হইতেছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই পরম-পুরুষ ভগবানের বিদিত হইয়াছে। ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর সেই হরি কালশক্তিদ্বারা ধরার

ভার হরণ করত যাবৎ ভূতলে বিহার করেন, তাবৎকাল তোমরা যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক।

এখন এই ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ সকল জীবের আত্মা,—শ্রীকৃষ্ণও সকল জীবের আত্মা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী।

পরব্যোমে নারায়ণ—বৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিতে পরিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে,
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্তিতিবাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বরত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি॥
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণাঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

শ্রীমদ্ভাগবত;—১০।১৪।১৫—১৬

দেব! জগতের আশ্রয়ভূত তোমার ঐ শরীর কল্পান্তে জলশায়ী ছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি তোমার নাভিকমলের নানারূপ বর্ত্মযোগে তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াছি, সেঁ সময়ে কেন তাহা দৃষ্ট হয় নাই? যদি বল, তোমার শরীর বাহ্য-দৃষ্ট হইয়া পরে অন্তঃকরণ-দৃশ্য হয়;—তাহাতেও বক্তব্য এই যে, তখন আমি তাহা হৃদয়েও দেখিতে পাই নাই।

পরন্তু তৎকালেই আমি তপস্যা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সুন্দররূপে দৃষ্ট হইয়াছে—তাহাতে উহা মায়া মাত্র, এখও এরূপ বোধ হইতেছে। অতএব তোমার মূর্ত্তির দেশবিশেষ পরিচ্ছেদ সত্য নহে। হে মায়াপশমন! তুমি এই অবতারেই বহিরনুব্যক্ত এই সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ আপনার জঠরমধ্যে জননীকে দর্শাইয়াছ, তদ্দ্বারাও এ সকলের মায়াত্ব প্রকটীকৃত হইয়াছে। অতএব জলাদি প্রপঞ্চ সত্য না হওয়াতে তদ্দ্বারা তোমার পরিচ্ছদ সত্য নহে। ভগবন্, তোমার সহিত এই সমস্ত জগৎ তোমার কুক্ষিতে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, সে সকল বাহিরেও সেই প্রকারে প্রকাশ প্রাইয়া থাকে। প্রভো! মায়া ব্যতিরেকে কি তোমাতে এসকল ঘটিতে পারে? অতএব বহিঃস্থিত জগৎপ্রপঞ্চ তোমার জঠরমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, ইহাও বলা গেল না—কেন না, তাহা হইলে তুমি আদর্শস্থানীয় হইয়া পড়, তাহাতে তোমাতে প্রতীতি হয় না, সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা মাত্র।

অতএব এইভাব শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান,—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ। ব্রাহ্মা সেই পূর্ণতা তাঁহাতে দেখিয়াছিলেন। সৃষ্টিতে প্রকৃত ও অপ্রকৃত যত জীব আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার আত্মা ও মূল স্বরূপ। ঘট মাত্রেরই কারণ ও আশ্রয় যেমন পৃথিবী, জাত পদার্থ মাত্রেরই তদ্রূপ কারণ ও আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ,—সুতরাং সমস্ত জীব, সমস্ত দেবতা, সমস্ত ঈশ্বরগণের কারণ ও আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ,—সুতরাং তাঁহাকে যে যেরূপে দেখিয়াছে, যেরূপে চিন্তা করিয়াছে, সেইরূপেই তাঁহাকে ভাবনা ও প্রচার করিয়াছে। এই জন্যই কেহ তাঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার, কেহ নরনারায়ণ, কেহ বামন এবং কেহ পরব্যোমের নারায়ণ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কার নহেন—তিনি সকলের সব, সবের সকল। সমস্ত অংশ, বিভূতি, শক্তি প্রভৃতি অবতারগণ, তাঁহাতে অধিষ্ঠিত। কাজেই

তাঁহাকে যে, যেভাবে দেখিয়াছে,—সে তাঁহাকে সেই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছে। আর যাঁহারা তাঁহার কৃপাকণায় কৃতার্থ হইয়াছেন—তাঁহারা দেখিয়াছেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ কোন্ অবতার?

শিষ্য। কথাটা আরও একটু বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে, পৌরাণিকী রকমের। এখনকার লোকে উহাকে রূপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে।

গুরু। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণের করুণা বিনা রূপকথা বলিয়াই জ্ঞান হয়। কৃষ্ণের করুণালাভের জন্য শম দম প্রভৃতি সাধন আবশ্যক। এক্ষণে বোধ হয় তুমি অবতারের বিষয়ই শুনিতে চাহিতেছ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। সে সম্বন্ধে কি বলিতেছ?

শিষ্য। ভগবানের কত অবতার?

গুরু। অসংখ্য অবতারের কথা শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র বলেন;—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনা কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

যেমন ক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্রনালী নির্গত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি হরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রাদুর্ভূত হন।

বরাহ, যজ্ঞ, কপিল, দত্তাত্রেয়, কুমারচতুষ্টয়, নর-নারায়ণ, ধ্রুব, পৃথু, ঋষভ, হয়গ্রীব, মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন, হংস, মন্বন্তর অবতার, ধন্বন্তরি, পরশুরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, বুদ্ধ ও কল্কি প্রভৃতি বহু অবতার আছেন।

কোন কোন অবতার ভগবানের অংশ। কোন কোন অবতার তাঁহার বিভূতি। মৎস্য আদি অবতার সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও তাঁহারা কেবলমাত্র আত্মকার্য্যোপযোগী জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কুমারচতুষ্টয় এবং নারদাদির মধ্যে যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার মধ্যে সেইরূপ ঈশ্বরত্বের অংশ ও কলারূপে আবেশ। কুমার-আদিতেও জ্ঞানের আবেশ, এবং পৃথু-আদিতে শক্তির আবেশ।

শিষ্য। অবতার আবির্ভূত হইয়া কি কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন?

গুরু। রজোগুণ ও তমোগুণের বৃদ্ধিদ্বারা মানবসকল দৈত্য-ভাবাপন্ন হয়। যুগমধ্যে এবং মন্বন্তরমধ্যে যখন আসুরিক ভাব প্রবল হয়, তখনই সত্ত্বনিধান অবতার সকল আপনার প্রভূত সত্ত্বগুণ জগতে ব্যাপ্ত করেন, এবং বিশ্বকে অধোগতি হইতে রক্ষা করেন। ভক্ত শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিয়াছিলেন।

বলিয়াছিলেন:—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৪ অ। ৭—৮।

"যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।"

পূর্ব্বেও তোমাকে একথা বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে,—এই ধর্ম্মবিপ্লবের এক ধারাবাহিক ক্রম আছে। এ ধর্ম্মবিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রদুর্ভাব ব্যক্তিবিশেষের কৃত অধর্ম্ম নহে। রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধি-দ্বারা জীবের অধোগতি উপস্থিত হয়। তমোগুণের চরম বৃদ্ধিই সেই অধোগতির পরাকাষ্ঠা।

শিষ্য। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন,—আমার ভালরূপ বোধগম্য হইল না।

গুরু। প্রকৃতি স্থূল পরিণামশীলতাই অধোগতির কারণ। তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইলে জীবদেহ প্রথমতঃ সূক্ষ্মতত্ত্বদ্বারা নির্ম্মিত হয়। কালক্রমে দেহের স্থূলতা হয়, এবং তত্ত্বসকলও স্থূল হইতে স্থূলতর হয়। জীব-নিবাসভূমি পৃথিবীও ক্রমে ক্রমে জড়তার শেষ সীমায় উপনীত হয়। স্থূল উপাদানে তমঃ প্রধান। আমাদের স্থূল দেহে জ্ঞানের আবরক,—নিদ্রা ও আলস্যের আস্পদ। যখন কুম্ভকর্ণ ছয়মাস কাল নিদ্রিত থাকিতেন, তখনই তমোগুণের সম্পূর্ণ অধিকার। তামসিক উন্মাদগ্রস্ত রাবণ সীতা-দেবীকেও অপহরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও তামসিক শক্তি-বলে পরাভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্র-সূর্য্যকেও রাবণের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র সেই অধোগতির স্রোত রুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঊর্দ্ধ-গতির স্রোত ধারাবাহিক করিবার জন্য অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল।

শিষ্য। কি প্রকারে ঊর্দ্ধগতির স্রোত ধারাবাহিক করিতে পারা যায়?

গুরু। প্রকৃতির প্রতি বিভাগকে সূক্ষ্ম পরিণামশীল করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধগতির পথ উন্মুক্ত করা হয়। তত্ত্বসকল ঊর্দ্ধগামী হইলে

জীবসকল স্থূলদেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব অবতার গ্রহণ করিয়া সকল তত্ত্বকেই ঊর্দ্ধগামী করিয়াছিলেন। অন্য কোন অবতারে এতাধিক ক্ষমতা নাই। তাই—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" তিনি কি প্রকারে কি করিয়াছিলেন, তাহারই আভাস তোমাকে লীলাতত্ত্বে প্রদান করিব।

শিষ্য। অবতার সম্বন্ধে আরও একটু পরিষ্কাররূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। কি শুনিতে চাহ, বল।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, কৃষ্ণে সমস্ত অবতারের গুণ এবং তাহার তত্ত্ব, সমস্ত অবতারের ভাব ও সমস্ত অবতারের কর্ম্ম নিহিত আছে—তদ্ভিন্ন তাঁহাতে যাহা আছে, তাহা কোন অবতারে নাই, কোন মানবে নাই, কোন দেবতায় নাই, কোন ঈশ্বরে নাই। আমি সেই কথাটা আরও একটু প্রাঞ্জলরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হাঁ, বলি শোন—তদেকাত্মস্বরূপের স্বাংশবিলাসে ভগবৎশক্তি অসীম অবতাররূপে সৃষ্টিরাজ্যে অবতীর্ণ হয়। এই সমস্ত অবতারের মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রেষ্ঠ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে, সৃষ্টিকার্য্যের জন্য পরমব্রহ্ম পদার্থ প্রথমেই পুরুষাবতার গ্রহণ করেন। এই পুরুষাবতার আবার তিনি,—প্রথমপুরুষ, দ্বিতীয়পুরুষ ও তৃতীয়পুরুষ।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

ভগবান্ বিষ্ণুর পুরুষ নামে তিনটি রূপ আছে। তন্মধ্যে প্রথম মহত্তের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু রূপ; দ্বিতীয় অণ্ডসংস্থিত গর্ভোদকশায়ী রূপ, এবং তৃতীয় সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী রূপ।

প্রথম পুরুষ যখন ছিলেন, তখন আর কোন দৃশ্য বা কেহ দ্রষ্টা ছিল না।

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

তাঁহার ইচ্ছা হইল, আমি বহু হইব এবং প্রকৃষ্টরূপে জায়মান হইব।

শিষ্য। তাঁহার এ ইচ্ছা কেন হইল? আপনি কি বলিতে চাহেন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কেন হইল, তাহার উত্তর আমি দিব?

গুরু। না না,—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অবশ্য আমার তাহা বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যোগনয়নসম্পন্ন ঋষিগণ তাহা জানিতেন। তাঁহারা তাহা বলিয়াছেন :—

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ।
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥
সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥
কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥

ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত,—৩৫॥ ২২—২৭।

"জীবসকলের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা—যিনি সৃষ্টিকালে নানাবুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আপনার মায়া-লীলা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎস্বরূপ হইয়াছিল। অর্থাৎ তৎকালে অন্য দ্রষ্টৃ বা দৃশ্য কিছুই ছিল না। সে সময় একমাত্র তিনিই প্রকাশ পাইয়াছিলেন. সুতরাং স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও অন্য দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান নাই। অতএব মায়াদি শক্তি লীনা হইয়া থাকাতে দৃশ্য এবং দ্রষ্টৃত্বের অভাবে আপনি যেন নাই, এইরূপ মানিতেন, কিন্তু চিৎশক্তি দেদীপ্যমানা ছিল, ইহাতে আপনি একেবারে নাই, এমত অনুমান করিতে পারেন নাই। দ্রষ্টৃ স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-অনুসন্ধান-রূপা সেই শক্তি কার্য্য এবং কারণ উভয়স্বরূপা। ঐ শক্তির নাম মায়া। ভগবান্ তাহার দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চিৎশক্তিযুক্ত পরমাত্মা কালশক্তি বশতঃ গুণক্ষোভযুক্ত মায়াতে আপনার অংশ স্বরূপ যে, পুরুষ প্রকৃতির উপরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা প্রথমতঃ বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন। তাহার পরে কাল-প্রেরিত অব্যক্ত মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইল। ভগবান্ এইরূপে আত্মদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশিত করিলেন।

এতাবতা জানা গেল,—আদিপুরুষ বিশ্বরূপে পরিণত হইলেন, ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা, মায়া আর কালশক্তি উদ্বোধিত হইয়াছিল।

শিষ্য। মায়া অবশ্য ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ ; কিন্তু কালশক্তি কি স্বতন্ত্র?

গুরু। না। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনিই একমাত্র ছিলেন,—অন্য কিছুই ছিল না। কাল ভগবানেরই অন্যতম রূপ। শাস্ত্রে বলেন,—'এতদ্ভগবতো রূপম্'। ইংরেজীতে যাহাকে periodlcity বলে, তাহা কালশক্তির অনেক অংশের জ্ঞাপক। দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত্রি যায়, দিন আসে ;—ঋতুর পরে ঋতুর আগমন হয়। বৎসরের পরে বৎসর আসে। যুগের পর যুগের উদয় হয়। মন্বন্তরের পরে মন্বন্তর হয়—কল্পের পরে কল্প আসে। যে শক্তিদ্বারা সুনিয়মে সুশৃঙ্খলায় ইহা হয়, তাহাকেই কালশক্তি বলা যায়। প্রকৃতিও এই শক্তিবশে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কাল প্রাকৃতিক সীমার অতীত—কালশক্তি ঐশ্বরিক শক্তি।

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥

বিবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বর ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবকে স্বীকার করিয়াছেন।

এই প্রথম পুরুষ বা বিশ্ব প্রকাশ পাইল। তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইল। কিন্তু জীবসংস্থান ও জীবশরীর রচনা হইল না। তখন—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

শ্রীমদ্ভাগবত ;—১।৩।১

ভগবান্ লোকসৃজনাভিলাষে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা ষোড়শকলাবিশিষ্ট পৌরষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ অংশযুক্ত বিরাটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। ইহাই বোধ হয় দ্বিতীয় পুরুষ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। যদি বলি, পরমব্রহ্ম প্রথমেই এই দ্বিতীয় পুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন? অর্থাৎ প্রথম পুরুষের সত্তা যদি অস্বীকার করা যায়?

গুরু। না, তাহা যাইতে পারে না। কেন না, যে শক্তি দ্বারা তত্ত্বসকল স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত হইতে পারে, তাহাই প্রথম পুরুষের শক্তি, এবং যে শক্তি দ্বারা তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বিভিন্ন দেহ ও লোক রচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহাই দ্বিতীয় পুরুষের শক্তি।

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ;—৩।৬।৪০

প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক পুরুষই পরব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার। তৎপরে কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপিণী প্রকৃতি. মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম, বিরাট্‌দেহ, বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর ও জঙ্গম।

অতএব অশরীরী প্রথমপুরুষ কারণ সৃষ্টির অর্থাৎ তত্ত্বসমূহের আত্মা, এবং দ্বিতীয় পুরুষ মূলপ্রকৃতিরূপ শরীরবিশিষ্ট হইয়া কার্য্যসৃষ্টির অর্থাৎ জীবসমূহের আত্মা।

ঐ বিরাট্‌মূর্ত্তি ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট হইয়া আপনা হইতে এক দশ ও তিন প্রকারে বিভক্ত হইল। ঐ বিরাট্ পুরুষ আত্মশক্তি দ্বারা অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব ও অধিভূত এই তিনের

সহিত বর্ত্তমান হওয়াতে তিনপ্রকার, এবং ক্রিয়াশক্তিদ্বারা প্রাণাদি-স্বরূপ হওয়াতে দশপ্রকার, আর জ্ঞানশক্তিদ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্ত স্বরূপ হওয়াতে একপ্রকার হইলে ভগবান্ ঈশ বিশ্বস্রষ্ট্ তত্ত্বগণে আপনার চিৎশক্তিদ্বারা ঐ বিরাট্ শরীরকে সন্তপ্ত করিলেন। ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি সন্তপ্ত হইলে, তাহা হইতে সমস্ত জীবের প্রকাশ হইল।

এই দ্বিতীয় পুরুষই সমগ্র জীবের আত্মা—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা। ইঁহাকেই হিরণ্যগর্ত্ত, গর্ত্তোদকশায়ী, সহস্রশীর্ষ, বিরাট্পুরুষ বলা হয়।

আর যখন জীবসমূহ পৃথক্‌ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়, তখনই তিনি তৃতীয় পুরুষ। অর্থাৎ প্রতিজীবের আত্মাকে তৃতীয় পুরুষ বলে।

পুরাণে তৃতীয়পুরুষ বিষ্ণুকে গুণ-অবতার বলা হইয়াছে—তিনি জীবে জীবে অধিষ্ঠিত। তিনি ক্ষীরোদশায়ী—তিনিই পালনকর্ত্তা।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইঁহারা গুণাবতার। গুণের ক্ষোভ না হইলে তত্ত্বসকল ক্রিয়াপর হয় না।

মৎস্য, কূর্ম্ম, শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহ, বামন, বরাহ প্রভৃতি লীলাবতার। তৎপরে মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার প্রভৃতি অবতার সকলও সৃষ্টিকর্ত্তার সহায়ক এবং কেহ ঈশ্বরের অংশ, কেহ বিভূতি প্রভৃতি।

শিষ্য। এখন জানিতে চাহি, কৃষ্ণচন্দ্র কোন্ পুরুষ বা কোন্ অবতার?

গুরু। যেরূপ সমুদ্রপ্রবাহ অনন্ত, সেইরূপ ভগবল্লীলারও আদি-অন্ত নাই—উহা নিজ এবং বিরাম-বিরহিত। কিন্তু যত লীলা আছে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান আছে—তাই 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' কৃষ্ণে স্বরূপতত্ত্ব, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব, ভক্তি ও রসতত্ত্ব একত্রে বিদ্যমান। অন্য কোনও অবতারে তাহা একত্রে ছিল না,—তাই 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥

বিষ্ণুপুরাণ ;—১-১৯।৫০

একস্থানস্থ বহ্নির জ্যোৎস্না যেমন অধিকদূরস্থান ব্যাপিনী হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তিও এই দৃশ্যমান নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছে।

এখন সেই শক্তি কি? শাস্ত্র বলেন :—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞ্যান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

বিষ্ণুপুরাণ ;—৬—৭।৬০

বিষ্ণুশক্তি ত্রিবিধ। পরা ক্ষেত্রজ্ঞা, অপরা অবিদ্যা এবং তৃতীয়া কর্ম্মাখ্যা। ইহাদিগের অপর নাম অন্তরঙ্গী চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গী মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি।

শ্রীকৃষ্ণে স্বভাবতই এই তিনশক্তির পরিণতি। তাঁহাতে সর্ব্ব অবতারের গুণ ও কর্ম্ম বিদ্যমান। তাঁহাতে রস ও ঐশ্বর্য্য নিহিত। অতএব—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

তাই হিন্দুশাস্ত্রে সমবেত কণ্ঠে জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণমেবৈনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া

এই কৃষ্ণকে নিখিল শরীরধারীর আত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। তিনি জগতের হিতার্থ মায়াশক্তিদ্বারা শরীরীবৎ প্রকাশিত হইতেছেন॥

তৃতীয়-পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতত্ত্ব বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না। জন্মতত্ত্ব কি বলিতেছ, বিশদ করিয়া বল।

শিষ্য। তিনি কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন, কেন জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং ধরাই বা গাভীরূপে দেবতাগণের নিকটে কেন গেলেন?

গুরু। সৃষ্টিকাল হইতে জ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছিল। যজ্ঞ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছিল;—কিন্তু ভক্তিরস, মধুর রস জগতীর জীবের জলিতকণ্ঠে পতিত হয় নাই। এদিকে জ্ঞানের চর্চ্চা প্রবলাকার ধারণ করিয়া কৃষ্ণ হারাইয়া বসিল।—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। যেমন এক শ্বেতরশ্মি দৃষ্টির আনুসঙ্গিক উপাধিদ্বারা বিভক্ত হইয়া সাত বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ এক উপনিষদ দর্শকের বুদ্ধিভেদ দ্বারা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দর্শনে পরিণত হয়। ভেদদ্বারা সকলই ঘটিতে পারে। ধর্ম্ম কেবল শুষ্কজ্ঞানের কঠোরতায় আবদ্ধ হইল—এক এক জন এক এক মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকে নাস্তিক্যবাদও প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—জড়ের চর্চ্চায় জগৎ ভরিয়া উঠিল। রসাস্বাদন, ভক্তির অশ্রু জগৎ

হইতে বিলুপ্ত হইল,—রজোগুণে ধরাতল পূর্ণ হইল। রাবণ কুম্ভ-কর্ণের সময় প্রবল তমোগুণে জগৎ ভাসিয়া গিয়াছিল,—আর দ্বাপরের অন্তভাগে রজোগুণে অহঙ্কারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইল। মানবই অসুর সাজিয়া বসিল। পৃথিবী রজোগুণের ভারে আক্রান্ত হইয়া দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন। যে গুণে যে তত্ত্ব উদ্ভূত, সেই পথে সেই তত্ত্বকে যাইতে হইবে। তাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সঙ্গে পৃথিবী গাভীরূপে ধারণ করিয়া জগৎপতির সকাশে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন, এবং পুরুষসূক্ত দ্বারা পুরুষের স্তব করিলেন।

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ব্যষ্টি পৃথিবীর রাজা। তাই পৃথিবীর দুঃখ তাঁহার নিকটে নিবেদন করিতে যায়।

তখন সেই পুরুষ আকাশবাণী দ্বারা ব্রহ্মাকে জানাইলেন যে, "আমি ধরার দুঃখ অবগত আছি। ঈশ্বরের ঈশ্বর কালশক্তি সহকারে পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন—দেবগণ তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে আপন অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করুন।"

তারপরে বলিলেন :—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥

সাক্ষাৎ পরম-পুরুষ ভগবান্ বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবনারীগণ তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য জন্ম-গ্রহণ করুণ।

এই কথায় কি বুঝিতে পারা গেলনা যে, ক্ষিরোদশায়ী পুরুষ নিজে জন্মগ্রহণ করিবেন না—ধরার ভার হরণ করিতে পরম পুরুষ আদি দেবই জন্মগ্রহণ করিবেন, বলিলেন।

তারপরে বলিলেন :—

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।

অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥

বাসুদেবের কলা স্বরূপ সহস্রবদন অনন্ত দেব শ্রীহরির প্রিয় সাধনোদ্দেশে অগ্রে জন্মগ্রহণ করিবেন।

শিষ্য। অনন্তদেবের জন্মগ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। সঙ্কর্ষণশক্তির জন্য। তারপরে বলিলেন :—

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।

আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥

ভগবতী বিশ্বমোহিনী বিষ্ণুমায়া, প্রভুদ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইবেন।

শূরবংশোদ্ভব বসুদেব মথুরা নগরে বিবাহ করিয়া নবপরিণীতা পত্নী দেবকীর সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক নিজালয়ে গমন করিতেছিলেন। ভগিনীর প্রীতিকামনায় কংস রথের অশ্ব চালাইয়া গমন করিতেছিলেন। এই সময়ে আকাশবাণী হইল যে,—"কংস! তুমি যে ভগিনীর প্রীতির জন্য রথাশ্বরশ্মি পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া যাইতেছ, সেই ভগিনীর গর্ভেই তোমার হন্তা জন্মগ্রহণ করিবে। তোমার ভগিনীর অষ্টম গর্ভে যে বালক হইবে, সেই তোমাকে নিহত করিবে।"

কংস পূর্ণ রজস্তমোরূপী। তিনি এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বসুদেব বহুবিধ স্তব ও বিনয় সহকারে বলিলেন,—আপনি আপনার ভগিনীকে হত্যা করিবেন না, আমরা আপনার অধীনেই বাস করিব, এবং আমাদিগের পুত্র হইলে আপনাকে অর্পণ

করিব,—আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিবেন। কংস স্বীকৃত হইলেন।

দেবকীর প্রথম গর্ভে এক তনয় জন্মিল। বসুদেব পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মতে সেই পুত্রকে কংসহস্তে সমর্পণ করিলেন,—এই সময় মহামুনি নারদ আসিয়া কংসকে বলিয়া গেলেন যে, যদুবংশ শ্রীহরির আশ্রিত; এবং দেবকীর গর্ভাশয় বৈকুণ্ঠ তুল্য। উহাতে যে সকল সন্তান জন্মিবেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুরূপী—সুতরাং তোমার হন্তা হইতে পারেন।

কংস বিচলিত হইলেন। হরিভক্তির বিদ্বেষ্টা—রজস্তমঃশক্তি বিনষ্ট করাই ভক্তি-অবতার নারদের কার্য্য। যাহাতে ত্বরায় কংস নাশ হয়,—যাহাতে রজস্তমোবৃত্তির পূর্ণ বিনাশ হয়, নারদ তাহাই করিলেন। পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হইলে সঙ্কোচন সম্ভবে না। কংস যদু-কুলকে বিতাড়িত করিলেন, বসুদেব দেবকীকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন, এবং সাধুগণকে খিন্ন ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছিলেন। তারপরে বসুদেবের প্রথম পুত্রকে নিহত করিলেন।

তদনন্তর ভগবদাশ্রয়ত্ব হেতু সর্ব্বদেবময়ী দেবকী বৎসরে একটি করিয়া তনয় প্রসব করিতে লাগিলেন,—ক্রমে ক্রমে তাঁহার ছয় পুত্র হইল, নির্দ্দয় কংস সেই ছয়টি পুত্রই নিহত করিলেন।

কংস কর্ত্তৃক দেবকীর ছয়টি সন্তান নিহত হইলে পরে ভগবান্ বিষ্ণুর কলা—যাঁহাকে অনন্ত বলা যায়—তিনিই দেবকীর সপ্তম গর্ভে হই-লেন। বিশ্বাত্মা ভগবান্ রজস্তমোরূপী কংসকর্ত্তৃক ঐ সত্ত্বগুণময় সঙ্কর্ষণ শক্তি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় যোগমায়াকে স্মরণ করিয়া বলিলেন,—

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে॥

অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষ বসন্তি হি ॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে! ।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি।
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্ ॥
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্।
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥

হে দেবি! হে ভদ্রে! গোপ এবং গোসমূহে অলঙ্কৃত ব্রজপুরে গমন কর। বসুদেব-রমণী রোহিণী নন্দ-গোকুলে অবস্থিতি করিতেছেন,—কেবল তিনিই নহেন, বসুদেবের অন্যান্য মহিলারাও সেখানকার অলক্ষ্য স্থানে বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে যে শেষ নামক সন্তান আছে, তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। হে দেবি! আকর্ষণ করিলে, গর্ভ কি প্রকারে জীবিত থাকিবে, তুমি এ আশঙ্কা করিও না,—উহা আমারই অংশ। পরে আমি পূর্ণ-রূপে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব,—তখন তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মিয়ো। ভদ্রে! তুমি উৎপন্ন হইয়াও যদ্দ্বারা পুত্রাদি কামনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের প্রেষ্ঠা নিয়ন্ত্রী হইবে এবং অর্চ্চকদিগের সমস্ত

কামনা পূর্ণ করিবে। মানবগণ নানা উপহার ও বলি দিয়া তোমার পূজা করিবে। পৃথিবীতে নরগণ তোমায় স্থাপনা করিবে, এবং তুমি দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা নামে আখ্যাত হইবে।

শিষ্য। ভগবান্ জন্মিবার পূর্ব্বে বলরামের জন্ম হইল ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। লীলাসহায়ের জন্য বোধ হয় ?

গুরু। হাঁ, একথা পূর্ব্বেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,—সেবারও ইহার উত্তর দিয়াছি। তাতে অকর্ষণ শক্তির বিকাশার্থ তিনি মানবসমাজে আগমন করিলেন, এবং মানবের রতি উৎপাদন করিবেন, কাজেই তিনি রাম। ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে রাম ও যোগমায়ার কার্য্য আরম্ভের প্রয়োজন। যোগমায়ার কথা পরে বিশদ করিয়া বলিব।

শিষ্য। তবে যাহা বলিতেছিলেন, তাহাই বলুন।

গুরু। ভগবানের নিকট আদিষ্ট হইয়া যোগমায়া তাহাই করিলেন। সকলে জানিল, দেবকীর সপ্তম গর্ভ স্রাব হইয়া গেল।

তারপরে ভক্তজনের অভয়-দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ পরিপূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। জীবসকলের ন্যায় তাঁহার ধাতু-সম্বন্ধ হয় নাই। বসুদেব ঐ প্রকারে পৌরুষধাম অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি মনে মনে ধারণ করত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া সর্ব্বভূতের দুরাসদ এবং সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন।

তদনন্তর প্রাচীদিক্ যেমন আনন্দকর চন্দ্র ধারণ করে, সেই প্রকার দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক দেবদীক্ষা দ্বারা অর্পিত অচ্যুতাংশ আপনার মন দ্বারা ধারণ করিলেন। ভগবানের ঐ অংশ সর্ব্বাত্মা, অতএব আগেও দেবকীর আত্মাতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু—

সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস-
নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥

অর্থাৎ দেবকী যদিও ঐরূপে জগন্নিবাস ভগবানের আবাসভূমি হইলেন, তথাপি সর্ব্বজনানন্দভাজন হইয়া শোভিতা হইতে পারিলেন না, কেবল আপনিই দীপ্তিমতী হইলেন; কারণ, ঘটাদিতে অবরুদ্ধা দীপশিখার ন্যায় কংসগৃহে অবরুদ্ধা ছিলেন,—অতএব জ্ঞানবঞ্চক ব্যক্তিতে নিরুদ্ধা সরস্বতী যেমন অন্যের উপকারিণী হন না, তদ্রূপ জগতের লোক সে শোভা দর্শনে বঞ্চিত হইল। কংসকারাগারে অপার্থিব অগ্নিশিখা রুদ্ধ হইলেন।

কিন্তু একদিন কংস আসিয়া সে শোভা দর্শন করিলেন। তিনি ভগিনীর সেই অপার্থিব তেজের শোভা দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, এইবার দেবকী-গর্ভে তাঁহার নিহন্তা হরি আবির্ভূত হইয়াছেন। এইবার রজস্তমঃ সত্ত্বগুণে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল,—গুণ এইবার ক্রমোন্নতির পন্থা অনুসরণ করিল,—কংস, শয়নে, স্বপনে, আহারে বিহারে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন! তাঁহার তন্ময়তা যোগ অবলম্বিত হইল। কংস হরিজন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন,—শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে জগৎকে তন্ময় দেখিতে লাগিলেন।

তারপরে এক ঘনঘোরা মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে দেবকীর গর্ভ হইতে ভগবান্ ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবৎসচিহ্ন-বিরাজিত পীতবাস শ্রীনিবাসের

রূপ দেখিয়া বসুদেব দেবকী প্রেমে গদ্গদ হইয়া তাঁহার স্তব করিলেন এবং সেই ঐশ্বররূপ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ বসুদেবকে বলিলেন,—"আমাকে গোকুলে নন্দভবনে রাখিয়া আইস, এবং যশোদার গর্ভে এক কন্যা জন্মিয়াছে, তাহাকে লইয়া আইস। আমি গোকুলে বর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় এখানে আসিব, এবং তোমাদের উদ্ধার করিব।"

অতঃপর ভগবান্ প্রকৃত বালকরূপ ধারণ করিলেন।

যোগমায়ার প্রভাবে তখন জগৎ সুপ্ত। বসুদেব নবজাত শিশু কোলে করিয়া গোকুলের পথে গমন করিলেন। মধ্যে জলবেণীরম্যা সফেনতরঙ্গায়িতা যমুনা গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিতেছিল। শ্রীনিবাস পার হইবেন বলিয়া যমুনা জলহীনা হইল, বসুদেব স্বচ্ছন্দে পার হইয়া নন্দভবনে প্রবেশ করিলেন।

যশোদা এক সন্তান প্রসব করিয়া মায়া-সুপ্ত হইয়াছিলেন। জগৎও সুপ্ত—নন্দাদিও সুপ্ত। বসুদেব আপন বক্ষঃস্থ শিশুকে যশোদাসমীপে রাখিয়া তদীয় কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া কংসকারাগারে ফিরিয়া গেলেন।

বসুদেবের বহির্গমনের সময় যোগমায়া-প্রভাবে সমস্ত লৌহ-কবাট—সমস্ত কীলক আপনিই খুলিয়া গিয়াছিল—তাঁহার আগমনে আবার সে সকল বদ্ধ হইল।

বসুদেব কন্যাটিকে দেবকীর ক্রোড়ে প্রদান করিবামাত্র কন্যা প্রকৃত শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। সে কন্যা আর কেহ নহেন,—যোগমায়া।

তখন প্রহরিগণ জাগিয়া বসিয়াছিল। তাহারা বালকের ক্রন্দন শুনিবামাত্র প্রভু কংসসমীপে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল।

কংস কারাগারে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন, পুত্র হয় নাই, কন্যা

হইয়াছে। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি দৈব কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছি—অষ্টমগর্ভে পুত্র জন্মিয়া আমাকে নিহত করিবে, এইরূপই শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পুত্র কৈ—এ ত কন্যা! কন্যা আমার কি করিতে পারিবে?

দেবকীও কাতরে করুণস্বরে বলিলেন,—"দাদা, এ কন্যা। নারী-হত্যায় পাপও আছে, এবং এ তোমার কোন প্রকার শত্রুতাচরণও করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে বধ করিও না।"

কংসও সেকথা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার দৈহিক জ্যোতি দেখিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সে দেহে লাবণ্য নাই, জ্যোতির লহরীলীলা। তাঁহার মনে হইল, এ বালিকাকে বিশ্বাস নাই—এ অসাধারণ, অবশ্যই আমাকে হত্যা করিতে পারিবে। তখন তিনি ক্রোধাবতার স্বরূপ হইয়া দেবকীর ক্রোড় হইতে বলে কন্যাকে আকর্ষণ করিলেন, এবং প্রস্তরোপরি আছাড় মারিলেন। কিন্তু সেই বিষ্ণুমায়াকে কে হনন করিতে পারে? তিনি কংসের হস্ত হইতে উর্দ্ধে গমন করিলেন, এবং অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে কংসকে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন, এবং বলিলেন—"কংস! বৃথা দীন বালকগণকে বধ করিয়াছ, বৃথা আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। যিনি তোমাকে হনন করিবেন, তিনি নন্দালয়ে বর্দ্ধিত হইতেছেন।"—দেবী অদৃশ্য হইলেন।

শিষ্য। কৃষ্ণজন্মকথার এই স্থানগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

গুরু। কোন্‌গুলি বিশ্বাস করিতে চাহেন না?

শিষ্য। যে স্থানগুলি অলৌকিক।

গুরু। লোকাতীত পুরুষের কার্য্য অলৌকিক না হইবে যদি,

তবে অলৌকিক হইবে কাহার কার্য্য? যদি কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে হয়, তবে তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতাও মানিতে হয়। যে ক্ষমতা আমার নাই, সে ক্ষমতা অন্যে নাই, একথা বলা নিতান্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধির কার্য্য। মনে কর, তারহীন টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান-প্রদান চলিতে পারে, এ তত্ত্ব যাঁহার মস্তিষ্কে প্রথম সঞ্জাত হইয়াছিল; তিনি কি অলৌকিক বুদ্ধি-সম্পন্ন নহেন? তোমার আমার মাথায় সে তত্ত্ব কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না বলিয়াই কি তাহাকে অলৌকিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?

শিষ্য। লৌহকবাট আপনি খুলিয়া যায়, আপনি আবদ্ধ হয়,—জলস্তম্ভ হইয়া যমুনা বসুদেবের গমনের পথ করিয়া দেয়,—এ সকল আষাঢ়ে গল্প বলিয়া অনেকে উড়াইয়া দেন।

গুরু। তুমি এমন কোন দেশের অবতার সম্বন্ধে শুনিয়াছ কি যে, তাঁহাতে কিছু না কিছু অলৌকিকত্ব নাই? যাহাতে ঈশ্বরের অংশ বা আবেশ আছে,—তাঁহাতেই অলৌকিকত্ব আছে। যাহা লোকে নাই, তাহাকেই বোধ হয় অলৌকিক বলিয়া থাকে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। যাহা লোকে নাই, তাহা প্রচার করণার্থই অবতারের আবির্ভাব। যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়, তাঁহার ইচ্ছায় দ্বার খুলিবে, জলস্তম্ভ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শিষ্য। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, ভগবান্ যখন মানুষ-কলেবর ধারণ করিলেন, তখন মানুষের মতই কার্য্য করিবেন। যাহা মানুষে নাই, তাহা তাঁহার দ্বারা কৃত হইবে না।

গুরু। তাঁহার কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি, ইহা যে অল্পবুদ্ধি মানব স্থির করিতে বসে, তাহার মত হাস্যাস্পদ লোক আর কেহ আছে কি

না, সন্দেহ। আমাদের আপন আপন কর্ত্তব্য কি, তাহাই যখন আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, স্থির করিলেও কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারি না, তখন ঈশ্বরের কার্য্য স্থির করা হাসির কথা নহে কি? আর এককথা, জগতে ঐ সকল কার্য্য সমাধা করিবার জনাই যোগ-মায়াকে আগেই অবতীর্ণ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার বিষ্ণু-মায়াই এই জগৎ—এই গোলোক-ধাঁধায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই মায়ার বলে কেহ তাঁহার অমানুষিকী কার্য্য দর্শন করিতে পারে নাই,—আমরাও সেই মায়ার ঘোরে তাঁহার কার্য্য কারণ বুঝিতে পারি না। যিনি প্রকৃতিরও প্রবর্ত্তক, যিনি কারণেরও কারণ, তাঁহার কার্য্য-কারণ তুমি আমি কি বুঝিব বল? তিনি মানুষ হইয়া মানুষের মত কার্য্য করিবেন জিদ করা সম্ভবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শকট-বিপর্য্যয়।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-লীলা বিষয়ক কতকগুলি অনৈসর্গিক গল্প পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে,—আমি সেইগুলি সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহি।

গুরু। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি—যিনি প্রকৃতিরও প্রবর্ত্তক, তাঁহার লীলা অনৈসর্গিক বিবেচনা করা আমা-দেরই অল্পবুদ্ধির ফল। আর এক কথা এই যে, বৃন্দাবন-লীলায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহর ষোল আনাই অনৈসর্গিক;—কেননা, তাহা প্রাকৃত

জগতের অতীত। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ কথা বলিতেছিলে, তাহা বল।

শিষ্য। পূতনাবধোপাখ্যান কি, তাহা বলুন।

গুরু। কংস যখন যোগমায়ার নিকট শ্রবণ করিলেন যে, কংস-হন্তা কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি চারিদিকে রাক্ষস-গণকে প্রেরণ করিলেন। পূতনা বালঘাতিনী রাক্ষসী। সে মনো-হারিণী নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নন্দোগোকুলে উপস্থিত হইল। নন্দ তখন গোকুলে ছিলেন না,—তিনি কংসের বার্ষিক রাজস্ব প্রদান জন্য মথুরায় গমন করিয়াছিলেন।

বালগ্রহ পূতনার কামরূপ দেখিয়া গোকুলবাসী গোপগোপীগণ মুগ্ধ হইয়া গেল, কেহ তাহাকে নিষেধ করিতে সক্ষম হইল না,—সে একেবারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং যেখানে যশোদা ও রোহিণী শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তার-পরে বহুবিধ মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিল। ভগবান্ সর্ব্বাত্মা—তিনি সহজেই পূতনাকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাহার ক্রোড়ে থাকিয়া তাহার স্তনপান আরম্ভ করিলেন।

পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য তাহার স্তনদ্বয়ে অতি উগ্র বিষ মাখাইয়া আনিয়াছিল। তাহার বাসনা, সেই বিষপানে শ্রীকৃষ্ণকে মৃত্যু-পথের পথিক করিবে। কিন্তু তাহা হইল না,—শ্রীকৃষ্ণ সেই গরলের সহিত পূতনার প্রাণাকর্ষণ করিলেন। পূতনা স্বরূপ ধারণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার স্বরূপ দেহ যখন প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইল, তখন ছয়ক্রোশের মধ্যে যত বৃক্ষ ছিল, সমুদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ইহাই পূতনাবধের উপাখ্যান।

শিষ্য। ইহা কি ঘটিতে পারে?

গুরু। তোমরা যাহাকে অপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক বলিতে চাহ, তাহা ব্রজলীলায় বাস্তব। ব্রজলীলার এক স্থূলরহস্য এই আছে যে,—সূক্ষ্মতত্ত্বের ক্রীড়া। যে সকল শক্তি বা তত্ত্ব সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল,—যাহা দ্বারা জীবাত্মার ও জীবের রসাস্বাদ হয়, সেইগুলি স্থূলভাবে পরিণত করা। ইহাই ব্রজলীলার উদ্দেশ্য।

এখন একটা কথা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে তদীয় পিতা বসুদেবকে সূতিকাগারে বলিলেন,—"আমাকে নন্দালয়ে রাখিয়া এস। আমি সেইস্থানে নিরাপদে বর্দ্ধিত হইব।"—এই কথার তাৎপর্য্য কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ কি? বাস্তবিক কি তিনি কংসভয়ে নন্দালয়ে গমন করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার নিজ মুক্তত্ব ও নিত্যশক্তিত্ব থাকে কোথায়? ইহা যদি না থাকে, তবে তাঁহাকে কোন ক্রমেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কথা এই যে, বালক নিজজন চায়। শ্রীকৃষ্ণ মানবাকারে তখন বালক,—তিনিও নিজজন চাহেন। দেবদেবীগণ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত পরের সম্বন্ধ,—তার আগেও আপনার জন আছে। যাহারা তাঁহার নিজ মুক্ত ভক্ত—যাহারা সব বিসর্জ্জন করিয়া তাহাকে চায়, তাহারাই তাঁহার বড় আপনার। তাই তিনি ব্রজলীলা করিতে—কৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য সাধন করিতে, আর ভক্তের সহিত মিলিত হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। রস আগে, ঐশ্বর্য্য পাছে। ভক্তের জ্বলিতকণ্ঠে রস-ধারা ঢালিবার জন্য আগেই তিনি ব্রজে গমন করিলেন।

বালগ্রহ পূতনা কামরূপিণী। গোপগোপী কৃষ্ণনামে ভক্তির

বাল্যাবস্থায় উপস্থিত। মানব মাত্রেরই ভক্তি উপস্থিত হয়, কিন্তু বাল্যাবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাকে যদি ভগবান্ রক্ষা করেন, তবেই সে রক্ষা পায়। কামচারিণী পূতনা কত বালক-ভক্তের ভক্তিকে বিনাশ করিয়াছে। ভক্তি প্রচার করিতে হইলে সেই বালঘাতিনী পূতনাকে বিনষ্ট করিতে হয়। কামচারিণী পূতনার প্রলোভন প্রবল। সে তাই অতি মনোহররূপে গোকুলে দেখা দিয়াছিল।

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং
বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্।
সুবাসসং কল্পিতকর্ণভূষণ-
ত্বিষোল্লসৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্॥
বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ-
র্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।
অসংগতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতং পতিম্॥

তাহার কেশপাশে মল্লিকাকুসুম সংযুক্ত, নিবিড় নিতম্ব ও পীন স্তন-দ্বয়ে কটিদেশ আক্রান্ত হইয়া অতিশয় ক্ষীণ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহার পরিধানে মনোহর বসন। মনোহর কুণ্ডল ও উজ্জ্বল কর্ণভূষণে অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি সমধিক শোভিত হইয়াছিল।

বালগ্রহ পূতনার এই রূপ দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? কাম-রূপিণীর অভ্যন্তরে বিষ। যিনি ভগবানের প্রিয়,—যিনি ভক্তিতে তাঁহাতে আত্মসমর্পিত, তাহাকে—সেই ভক্তকে তিনি রক্ষা করেন।

তিনি সেই কামকে সমূলে বিনাশ করেন। তখন ছয় ক্রোশের বৃক্ষাদি চুরমার হইয়া পরিষ্কার হয় ও প্রেমের বাতাস বহিতে থাকে। এই ছয়ক্রোশ ছয় রিপু। কাম-কলুষিত আবর্জ্জনা ভগবানের কৃপায় বিদূরিত হয়।

কাম তখন প্রেমের পবিত্রতায় আনন্দদায়ক হইয়া পড়ে। কামের বিষ যায়, প্রাণ যায়। দেহ পুড়িয়া প্রেমের সৌরভ বিকাশ করে। তাই—

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্ত-সপদ্যাহতপাপ্মনঃ॥

বালঘাতিনী পূতনা কৃষ্ণস্পর্শে বিগতপাপ হইল, এবং তাহার দেহ পুড়িয়া যে ধূম উত্থিত হইল, তাহাতে অগুরুচন্দন-সৌরভ দিতে লাগিল।

কাম-বিনাশে গোপগোপীগণের কৃষ্ণে রতি হইল। ইহাই পূতনা-বধোপাখ্যান।

শিষ্য। শকটবিপর্য্যয় কি?

গুরু। বালকের অঙ্গপরিবর্ত্তনে উৎসব অভিষেক হইত। নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপরিবর্ত্তন-উৎসবের দিন। বাটী আত্মীয় কুটুম্ব ও কুটুম্বিনী ও বালক-বালিকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক ও নিমন্ত্রিতগণে বাড়ী পূরিয়া পড়িয়াছিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর, ননীতে সমস্ত গৃহাঙ্গন থৈ থৈ করিতেছিল। সম্ভবতঃ নন্দালয়ের বহির্ভাগে একখানা বৃহৎ গৃহ ছিল, তাহার মধ্যে শকটাদিও দুই একখানা রক্ষিত হইত। এখনও বড় বড় কৃষকদের বাড়ী এমন গৃহ দেখা যায়। বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হওয়ায় সে

গৃহখানিও কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু শকটাদি আর একদিনের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া ফেলা হইয়াছিল না। তবে শকটের উপরে দধি দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার রাখা হইয়াছিল।

এখন কৃতাভিষেক বালক শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা সেই শকটের তলদেশে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। এরূপস্থলে শয়ন করাইবার হেতু এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময় সর্ব্বত্র গোলযোগ আর শকটের নিম্নদেশ নিরুপদ্রব।

অধোভাগে শ্রীকৃষ্ণ শয়ান ছিলেন, উপরে শকট ছিল, খেলার ছলে ভগবান্ ঊর্দ্ধদিকে পদক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু চরণাঘাতে শকটখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার উপরে দধিদুগ্ধাদি যাহা ছিল, সুতরাং তাহাও সমস্ত শব্দ করিয়া ভূপতিত হইল।

সে শব্দে যশোদা ছুটিয়া গৃহমধ্যে আগমন করিলেন, তাঁহার সঙ্গে গোপগোপীগণও আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, শকটবিপর্য্যয় এবং তদুপরিস্থিত দ্রব্যাদি মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছে,—বালক যে শয্যায় শুইয়াছিলেন,সেই শয্যায় শুইয়াই হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছেন। অনতিদূরে—গৃহমধ্যে কয়েকজন গোপবালক উপস্থিত রহিয়াছে।

শকটবিপর্য্যয়ের কারণ কি? যশোদা এইকথা বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল,—"শায়িত শিশুর পদাঘাতে শকট-বিপর্য্যয় হইয়াছে,—আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

গোপীগণ তাহা বিশ্বাস করিলেন না,—নন্দাদি গোপগণও শকট-বিপর্য্যয় দর্শন করিলেন এবং তাহা বালক-কৃত কার্য্য শুনিয়া অবিশ্বাস করিলেন। কিন্তু শকটবিপর্য্যয় অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, কারণ তাহা সম্মুখেই বিপর্য্যস্ত। তখন কোন ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নন্দ ব্রাহ্মণদিগকে বহুল ধনাদি দান করিলেন।

এখন ভগবানের একার্য্যে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইল, একথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার।

ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া মানুষ শক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পারে। ভগবান্ নন্দ-যশোদা তথা অন্যান্য ভক্ত গোপগোপীদিগকে লইয়া এক অনাস্বাদিত মধুর রসের অবতারণা করিবেন, যাহাতে জ্ঞান-জ্বলিত জীবের কণ্ঠে সে মধুর রস পড়িতে পারে। কিন্তু যোগমায়া-প্রভাবে ভক্ত গোপ-গোপীগণ তাহাকে পুত্র বৈ দেখিবে না। যদিও ঐকান্তিকী প্রেমভক্তিতে—'তিনি ঈশ্বর আমি জীব' এভাব বিদ্যমান থাকে না, তথাপি তাঁহাকে জগদতীত শক্তিমান্ এমন ভাব থাকা চাই,—ঐশ্বর্য্য না দেখিলে, জীব মুগ্ধ হয় না। ঐশ্বর্য্য হইতে জ্ঞান,—জ্ঞান হইতে উপাসনা, উপাসনা হইতে আত্মদৃষ্টি। বৃন্দাবনলীলার গোপগোপীদিগের হৃদয়ে ঘটনার পর ঘটনায় ধীরে ধীরে এই ভাবেরই উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। শকটবিপর্য্যয় শক্তিতত্ত্বের অন্যতর ক্রিয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তৃণাবর্ত্ত বধ ও বিভূতি-বিকাশ।

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বাল্যলীলা বর্ণনা করুন।

গুরু। লীলা বিস্তর ও বিস্তারিত। সংক্ষেপে অন্যান্য দুই একটী কথা বলিতেছি।

একদিন যশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য দান করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা বালককে তিনি এত ভার বোধ করিলেন যে,

কিছুতেই কোলে রাখিতে সক্ষম হইলেন না। তখন মাটীতে নামাইয়া কোনও বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। মায়ামুগ্ধা যশোদা জানিতে পারিলেন না যে, জগৎ তাঁহার পুত্রোদরে অবস্থিত হইয়াছে।

এই সময় তৃণাবর্ত্ত নামক একটা দৈত্য কংসপ্রেরিত হইয়া ঘূর্ণি-বায়ুতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইল, এবং আকাশমার্গে তুলিয়া লইল। সমস্ত গোকুল সেই বিপুল বায়ু ও আবর্ত্তোত্থিত তৃণপত্রাদির আঘাতে অস্থির হইয়া উঠিল।

যশোদা সেই চক্রবায়ুর মাঝেই স্নেহের পুত্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নাই। তখন যশোদা হাহাকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছাড়-পিছড়ে কাঁদিতে লাগিল।

বায়ুবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, অন্যান্য গোপীগণ যশোদার আর্ত্ত-নাদ শুনিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া যশোদার ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে পারিল, এবং তাহারাও সন্তাপিত চিত্তে অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

এদিকে তৃণাবর্ত্ত দানব চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল,—কিন্তু বালক তখন বিশ্বম্ভর। দানব তাঁহাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইল না, বরং গুরুভার বশতঃ নিজেই মূর্চ্ছিত হইয়া ব্রজ-মধ্যে নিপতিত হইল। গোকুলানন্দ নন্দ-নন্দন তাহার বক্ষঃস্থলের উপরে সংস্থিত থাকিয়া প্রকৃত বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্যান্য গোপীরা ছুটিয়া সেখানে গমন করিল, এবং সেই বিগতপ্রাণ বিশালদেহী দানবের দেহচ্যুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে করিয়া আনিয়া যশোদার কোলে প্রদান করিলেন।

গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ অদ্ভুত শক্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

এখন ইহাতে কি বুঝা গেল?

গোকুল ধাম শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান হইয়াছে। যেখানে ভগবানের আবাসস্থান,—সেখানে আনন্দ আসিবে। কিন্তু আনন্দলাভ করিতে হইলে আশাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। আশা চক্রবায়ু। মানুষকে সতত নিষ্ফল কার্য্যে ব্যস্ত রাখে। আশাই জগতে মানুষকে নিত্য নূতন কার্য্যে আবদ্ধ করে,—আশাই মানুষকে মায়ার দাসত্ব করিয়া দেয়। সেই আশাকে বিদূরিত বা নিহত না করিতে পারিলে, চিত্ত নির্ম্মল হয় না। তাই তৃণাবর্ত্ত বধ।

ইহার পরও আর একটি যোগের কথা আছে। কথা একই, তবে ইহা হইতে উচ্চস্তরের। হংস—জীবাত্মা। হং প্রশ্বাস, স শ্বাস। অর্থাৎ যে কিছু টানিয়া দেহমধ্যে লওয়া হয়, তাহা শ্বাস, এবং যাহা পরিত্যাগ করা হয়, তাহাই প্রশ্বাস। মানব এই শ্বাস প্রশ্বাসকে জয় বা স্থির করিতে না পারিলে বিক্ষিপ্তচিত্ত স্থির করিতে পারে না,—যখন বায়ু বিক্ষিপ্ত, তখনই বিঘূর্ণিত। সেই বায়ুনিরোধকে তৃণাবর্ত্ত বধ বলিতে পারা যায়। শ্বাস প্রশ্বাস সংস্থিত হইলে, আশা যায়—তখন এক আশা ভগবানে। যোগের পথ ইহা প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি।

শিষ্য। তবে এই বাল্যলীলাগুলিকে রূপক বলা যাইতে পারে? যদি রূপক হয়, তবে একথাও নিশ্চয় যে, উহা শাস্ত্রকারগণের কল্পিত রূপক,—কৃষ্ণলীলার অবয়ব ঐ সকল যথার্থ ঘটে নাই। এক কথায় উহা ঐতিহাসিক বা লৌকিক নহে।

গুরু। এই কথা লইয়াই যত গোলযোগ। এই কথা বুঝিতে না পারায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের, তথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শিষ্যোপশিষ্য

দেশীয়গণের সহিত যত গোলযোগ। জগতে যাহা সূক্ষ্ম,—তাহাই সময়ে স্থূল। দেবতা সূক্ষ্ম শক্তি—সে শক্তি সময়ে স্থূল হয়। মানুষ সময়ে সূক্ষ্ম, সময়ে স্থূল হয়। স্থূল হইয়াই মানুষরূপে দেখা দেয়। বীজে বৃক্ষ অব্যক্তাবস্থায় থাকে, তখন সূক্ষ্ম,—যখন বৃক্ষাকার ধারণ করে, তখনই স্থূল হয়। অতএব যত প্রকার তত্ত্ব আছে, প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি সমস্ত সূক্ষ্ম হইলেও সময়ে স্থূল হইতে পারে, বা হইয়া থাকে। ইহা না বুঝিলে লীলাতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। বায়ুতত্ত্ব যে, সময়ে স্থূল দানব হইতে পারে না, তাহা তোমাকে কে বলিল? অতএব উহা রূপক নহে, -ঐতিহাসিক। যাহা অন্য সময় সূক্ষ্মতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলায়—লীলাপ্রয়োজনে তাহারা স্থূল হইয়া লীলা করিয়াছিল। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তাহারা শরীরী হইয়াছিল। ভগবান্‌ও অশরীরী: তিনিও মানবের আদর্শ হইবার জন্য শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন দেবতারাও তখন শরীরী হইয়াছিলেন। প্রকৃতিও শরীরী—ভগবানের লীলার জন্য যে যে তত্ত্বের আবশ্যক হইয়াছিল, তখন সকলেই স্থূল হইয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছিল। একথা আত্যন্ত স্মরণ রাখিও।

শিষ্য। তারপরে অন্য কথা বলুন।

গুরু। একদা যশোদা কৃষ্ণকে স্তনপান করাইতেছিলেন। স্তনপান করিতে করিতে কৃষ্ণ একবার হাই তুলিলেন। যশোদা পুত্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন,—দেখিলেন, সেই ক্ষুদ্র বালকের বদনমধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্যলোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদ, নদী, অরণ্য এবং স্থাবর ও জঙ্গম দেদীপ্যমান। যশোদার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে কথা যথাসময়ে নন্দসমীপে নিবেদন করিলেন। কোন বালগ্রহের মায়া বলিয়া তাঁহারা দৈবকার্য্য করাইলেন।

ইহার কিছু দিন পরে যদুগণের পুরোহিত মহামুনি গর্গ বসুদেব কর্ত্তৃক গোপনে প্রেরিত হইয়া নন্দালয়ে আগমন করিলেন, এবং রাম-কৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। গর্গ যে ভাবে আসিয়াছিলেন, তাহাতে নন্দ বুঝিতে পারিলেন না যে, বসুদেব তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন বা বসুদেবের সহিত বাসুদেবের কোন সম্বন্ধ আছে।

যাহা হউক, রাম ও কৃষ্ণ ক্রমে হাঁটিতে শিখিলেন। তাঁহারা প্রাকৃত বালকের ন্যায় আশাতীত ক্রীড়া করত, গোপ-গোপীগণের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ অতিশয় চঞ্চল বালক, জল, অগ্নি ও পশু পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা তাহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়, এজন্য যশোদা ও রোহিণীকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইত। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দুরন্তপণাতে তাঁহারা ক্ষণমাত্র বিচলিত বা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

রাম-কৃষ্ণের নামে প্রত্যহই নানাপ্রকার অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হইত। কেহ আসিয়া বলিত,—কৃষ্ণ অদোহন কালে বাছুর খুলিয়া দেয়, কিছু বলিলে হাসিয়া ফেলে। কেহ বলিয়া যান,—তোমার কৃষ্ণ চুরি করিয়া ক্ষীর, সর, ননী খান, আবার বানরদিগকে বিলাইয়া দেন। কেহ বলে,—ঘুমন্ত শিশু টানিয়া তুলিয়া কাঁদাইয়া দৌড় মারেন। এইরূপ নিত্য নূতন নূতন অভিযোগ। যশোদাও সে সকল বড় কানে তোলেন না।

একদিন বাল্যসখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কৃষ্ণ অনেকখানি মাটি খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বলরাম ও অন্যান্য বালকগণ সে কথা আসিয়া যশোদাকে বলিয়া দিলেন।

যশোদা কৃষ্ণকে ধরিয়া আনিয়া ধমক দিলেন, এবং প্রহারোদ্যত

হইলেন। ভয়াকুলিত নয়নে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি কিছুই খাই নাই। ইহারা মিথ্যা করিয়া বলিতেছে, না হয় তুমি আমার মুখ দেখ।"

যশোদা বলিলেন,—"মুখ প্রসারণ কর, দেখি।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুখ ব্যাদান করিলেন।

শিষ্য। এস্থলে আমি কিছুই খাই নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি মিথ্যা কথা বলিলেন?

গুরু। না, মিথ্যাকথা বলিবেন কেন? একথার তাৎপর্য্য এই যে, আমি এখন কিছুই খাই নাই, পূর্ব্ব হইতেই আমার উদরমধ্যে সমুদয়ই নিহিত আছে।

শিষ্য। ভগবানের ব্যাদিত মুখবিবরে যশোদা কি দেখিলেন?

গুরু। দেখিলেন, কৃষ্ণের আস্যমধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্‌সকল এবং পর্ব্বত, দ্বীপ, সমুদ্র সহিত ভূলোক, প্রবহ বায়ু, বৈদ্যুত অগ্নি, চন্দ্র-তারা সহিত জ্যোতিশ্চক্র, অর্থাৎ স্বর্লোক ও জল, বায়ু বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, ইন্দ্রিয় সকল, মন ও শব্দাদি বিষয়, এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রভৃতি সমুদয় দেখিতে পাইলেন।

পুত্রের ঈষদ্বিবৃত বদনাভ্যন্তরে এই প্রকার বিচিত্র বিশ্ব, যাহাতে গুণক্ষোভক জীব, পরিণামহেতু কাল, কর্ম্ম এবং তাহার সংস্কার আশয় এই সকল চরাচর যাবতীয় শরীরভেদ বর্ত্তমান ছিল, তাহা, এবং এক প্রদেশে আত্মসহিত ব্রজপুরী অবলোকন করিয়া যশোদার যৎপরোনাস্তি বিস্ময় হইল।

যশোদা ভাবিলেন, ইহা কি স্বপ্ন? না কোন ভূতাবেশ? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, ইহা কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। স্বয়ং ভগবান্ দয়া করিয়া আমায় মা বলিয়া ডাকিয়া

কৃতার্থ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া প্রেমাশ্রু বহিল। পুলকে তনু পূর্ণ হইল—কিন্তু পরক্ষণেই বিষ্ণুমায়া-প্রভাবে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে দর্শন করিলেন।

শিষ্য। ইহা কৃষ্ণের কোন্ লীলা? ঈশ্বর-রূপেই বা মাতাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজ উদরে দেখাইলেন কেন, আবার বিষ্ণু-মায়াতেই বা তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেন কেন?

গুরু। বুঝি বুঝি বুঝি না,—জানি জানি জানি না,—এইরূপ ধারণা না হইলে—প্রেম হয় না। যশোদা যদি শুষ্ক জ্ঞানীর ন্যায় কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন, তবে বাৎসল্য-প্রেমের লীলা হইত না। শুষ্ক জ্ঞানের অনেক দিন প্রসার হইয়াছিল, কিন্তু বাৎসল্য-প্রেমের আদর্শ এই নূতন। আবার যদি কৃষ্ণকে প্রকৃত বালক বলিয়া যশোদার দৃঢ় জ্ঞান থাকিত, তবে এক কৃষ্ণে সমস্তার্পণ হইত না। তাই তাহাকে নিজোদরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শান। আর একদিন ভক্ত ও সখা অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তারপরে এইরূপেই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-প্রেমের আদর্শ এই স্থানে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ।

শিষ্য। যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ ব্যাপারটা কি? কেহ কেহ বলেন,—"অর্জ্জুন বলে, কুরুচি গাছকে; যমলার্জ্জুন অর্থে যোড়া কুরুচিগাছ! কুরুচি গাছ সচরাচর বড় হয় না এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়।

যদি চারা গাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।" *

গুরু। এত সোজা কথা ঋষিগণ পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশ কেন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা নহে কি? অর্জ্জুন বলে, কুরুচি গাছকে, তাহাও তাঁহারা জানিতেন, এবং সকলেই জানে। অর্জ্জুন অর্থে কুরুচি গাছই বলা হইয়াছে,—অর্জ্জুন অর্থে অন্য কিছুই বলা হয় নাই। তবে চারা গাছ বলবান্ শিশু দ্বারা ভাঙ্গা নয়। কথাটা এই :—

একদা যশোদা বালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অখিলপতি ভগবান্ গৃহস্থিত ক্ষীর সর নবনী চুরি করিয়া নিজে ভক্ষণ করিতেছিলেন, এবং বানরদিগকে বিলাইয়া দিতেছিলেন। তদ্দর্শনে গোপমহিষী নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া বালককে প্রহার করিতে ধাবমানা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃতাপরাধ প্রাকৃত বালকের ন্যায় মাতার অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিলেন। যশোদা কিছুতেই ধরিতে পারেন না, —তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অধরনাথ ধরা দিলেন।

জননী ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে গাভীবন্ধনের রজ্জুদ্বারা বাঁধিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যেশ্বর ভগবান্‌কে বাঁধা তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিল। যত দড়ি আনেন, সকলই সে উদরে কম পড়িতে লাগিল। যশোদা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন,—তখন ভগবান্ বাঁধা পড়িলেন,— যশোদা গরু বাঁধিবার দড়ি দিয়া পুত্রের উদরে বন্ধন করিয়া দড়ির অপরাগ্রভাগ একখানা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহকার্য্যে গমন করিলেন।

দামন্ অর্থে গরুর দড়ি। গরুর দড়িতে উদর বাঁধা হইয়াছিল।

---

* কৃষ্ণচরিত্র—১১৮ পৃঃ।

তাই শ্রীকৃষ্ণের এক নাম দামোদর। বাৎসল্য-প্রেমে ভগবান্ বাঁধা ছিলেন—বাৎসল্য-প্রেমের লহরীলীলায় ভগবান কেমন বাঁধা পড়েন, তাই জগতের জীবকে দেখাইলেন।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্ বদ্ধাবস্থায় উদূখলসহ সম্মুখস্থ যুগল কুরুচি-বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বম্ভরের ভরে যমলার্জ্জুন মহান্ শব্দ করিয়া ভূতলে পতিত হইল, এবং সেই দুই বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় দুইটি সিদ্ধপুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া শিরোনমন পূর্ব্বক অখিলনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন, এবং নির্ব্বাক্ হইয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। যোড়া কুরুচির গাছ ভাঙ্গিয়া গেল, আর তন্মুহূর্ত্তে দুইজন সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হইল, এবং তাঁহারা ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন,—ইহার কারণ কি?

গুরু। কারণ আছে। যক্ষাধিপতি কুবেরের দুই পুত্র। একের নাম নলকূবর ও অপরের নাম মণিগ্রীব। উভয় ভ্রাতা ধন-ঐশ্বর্য্য, যৌবনশ্রী, সাহস ও বলবীর্য্যে মদগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেখানে মদ, সেইস্থানেই ভক্তির বিরোধ। একদা ভক্তির অবতার নারদ মুনি তাহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহারা দুই ভ্রাতা তখন কামিনী লইয়া উপবন-বিহার করিতেছিল। নারদকে দেখিয়াও আপনাদের বসনাদি সম্বরণ বা কোনরূপ অভ্যর্থনাদি করিলেন না। নারদ দেখিলেন, অজ্ঞানতা সেখানে পরিপূর্ণ। তাই কৃপা করিয়া তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিলেন,—তাহারা দিব্য শতবৎসর গোকুলে অর্জ্জুনবৃক্ষরূপে অবস্থান করিল। তারপরে তাঁহারই শাপে কৃষ্ণস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া দিব্য ভক্তিজ্ঞান লাভ করিল।

এখন এই কথাটা একটু বিচারসাপেক্ষ। ত্রেতায় গৌতমপত্নী রূপসী অহল্যা মানবী হইয়া পাষাণে পরিণতা হইয়াছিল, তারপরে রামচরণ-পরশে আবার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুবেরপুত্রদ্বয় নারদের শাপে কুরুচি বৃক্ষ হইয়া গোকুলে অবস্থান করিতেছিল,—তারপরে কৃষ্ণস্পর্শে পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইল,—এইরূপ আরও কত হইয়াছে,—ইহা হিন্দুশাস্ত্রকারগণের অতি প্রাকৃত গল্প, না ইহা সম্ভব হইতে পারে?

অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শিগণ বলেন,—হাঁ, হইতে পারে। যেখানে রিপুর প্রাবল্য, সেখানে মানুষ গাছ পাথর হইয়া যায়। মানুষের যেমন ঊর্দ্ধগতি আছে, তেমনি অধোগতিও আছে। কাম বিনাশই এই অভিশাপের—এই সাধু কৃপার মূল।

নলকুবর ও মণিগ্রীব যক্ষাধিপতি কুবেরতনয়,—তাহারা অপদার্থ সাধারণ জীব নহে। কিন্তু জীবসৃষ্টির মূল প্রবাহ। কামেই তাহাদের মতি—কামেই তাহাদের রতি। ভক্তি সেখানে আদৌ ছিল না। ভক্তির গুরু নারদ তাহাদিগকে ভক্ত করিতে প্রয়াসী—তাই তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন, বৃক্ষ হইয়া গোকুলে থাক। ইহাতে তাহাদের কর্ম্মকারিত্ব শক্তি স্থগিত হইয়া গেল।

নারদ ইচ্ছা করিয়া—উপদেশ দিয়া, শাস্ত্রকথা শুনাইয়া কখনই তাহাদিগকে ভক্তির পথে লইতে পারিতেন না। কেহই তাহা পারে না—ভগবানের কৃপা ভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না। কিন্তু ভগবানের কৃপালাভের অন্তরায় অবিদ্যা। কর্ম্মবলে মানব সেই অবিদ্যার কবলস্থ হয়। তাই কৃপাময় নারদ তাহাদিগের কর্ম্ম স্থগিত করিয়া দিবার জন্য বৃক্ষ করিয়াছিলেন।

কেহই মরণ চায় না। যে, যে দেহই প্রাপ্ত হউক,—সে তাহা

নাশের আশঙ্কা করে। যে উপাধি লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, সেই উপাধি নষ্ট হইলে, আমি নষ্ট হইলাম, এই ভ্রান্তিবৃত্তিই মরণজ্ঞানের উৎপাদক। শাস্ত্রে এই বৃত্তিকে অন্ধতামিস্র বৃত্তি বলে। *

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে।—

তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ।
মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা॥
মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

ব্রহ্মা প্রথমে এই অজ্ঞানবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা সৃষ্টি না করিলে, অজ্ঞান-অন্ধকারে জীব ডুবিত না—অজ্ঞান-অন্ধকারে দৃষ্টি-ভ্রম না জন্মিলে জীবসৃষ্টি হইতে পারিত না। এই অজ্ঞান-বৃত্তিদ্বারাই জীবের অধঃপতন হয়,—এই অধঃপতনকে আ'জ কা'ল ইংরেজ পণ্ডিত-গণ Material Descent বলিয়া অভিহিত করেন। সেই অধঃপতনের স্রোত চলিয়া আসিতেছিল। সেই অধোগতির জীব উর্দ্ধে গমন করিবে (Spiritual insect)। ভগবান্ জীবের সেই উর্দ্ধগতি প্রদান জন্য—তাহারই আদর্শ হইয়া অবতার গ্রহণ করিয়াছেন—তাই তাঁহার স্পর্শে অবিদ্যা-বৃত্তি নাশ হইয়া যথার্থ ভক্তি লাভ করিয়া কুবেরতনয়দ্বয় কৃতার্থ হইল।

সেশ্বর সাংখ্যকার বলেন—"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ।" অবিদ্যারূপ ক্লেশ হইতেই আমাদের কর্ম্ম।—"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ু-র্ভোগাঃ।" যতদিন কর্ম্মের মূল অবিদ্যা থাকিবে, তত দিন জন্ম, আয়ু ও ভোগরূপ কর্ম্মের বিপাক হইবে।

* অন্ধতামিস্রঃ তন্নাশেঽহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ।—শ্রীধর।

মানবের সাধন ও তদুদ্দেশ্য অবিদ্যাবৃত্তির বিনাশ। কি প্রকারে তাহা বিনাশ করিতে হয়, তাহারই আদর্শ হইয়া ভগবান্ মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে মনুষ্যসমাজে অবিদ্যাবৃত্তির উপাসনা হইত। অনুসারী জীব অবিদ্যাবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই দেহ-আদি লাভ করে, এবং যথাপ্রাপ্ত উপাধির অভিমানী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

ভগবান্ বৃন্দাবনলীলায় ক্রমে ক্রমে এই সাধনারই পূর্ণ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাধাকৃষ্ণের মিলন প্রসঙ্গ।

শিষ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। হাঁ, বলিতেছি। কিন্তু এবারে তোমাকে যে কথা বলিব, তাহা অতি বিষম কথা। আধুনিক শিষ্টতার চক্ষে সেই কথাই কৃষ্ণ-চরিত্রের মহাপাতকাধ্যায়। সেই কথার জন্যই অষ্টাদশপুরাণের অন্যতম ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ অপকৃষ্ট গ্রন্থ ও তদ্রচয়িতা কুরুচিসম্পন্ন, রচনাকৌশল-জ্ঞানহীন, এমন কি, তিনি ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের উপক্রম-ণিকা ব্যাকরণখানিও পড়েন নাই বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন।

এবারে সেই রাধিকার কথা আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। সেই ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের কথা লইয়া আমাদিগকে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের সমালোচনা করিতে হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে, এই সময় একদিন নন্দ কতকগুলি গোবৎস লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। অন্যান্য গোপগণও সম্ভবতঃ সঙ্গে গিয়াছিল,—স্নেহের পুতুল বালক কৃষ্ণকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন।

নন্দ বৃন্দাবনসমীপে ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন। কতকগুলি গাভীকে বনমধ্যস্থ সরোবরের সুস্বাদু জল পান করাইয়া গাভীগণকে সম্ভবতঃ অন্যান্য গোপগণের রক্ষার অধীনে বনান্তরালে ছাড়িয়া দিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন।

সহসা কৃষ্ণের মায়াপ্রভাবে দিগন্ত মহামেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে কাননাভ্যন্তর শ্যামবর্ণ হইয়া উঠিল। তারপরে ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের সুদারুণ শব্দ, বজ্রের ঘোরতর নিনাদ এবং অতিস্থূল বৃষ্টিধারা, বৃক্ষসমূহের পতন হইতে লাগিল।

ইহাতে নন্দ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। গাভীসকল কাননাভ্যন্তরে থাকিল, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। এদিকে এরূপ দুর্য্যোগে বালক কৃষ্ণকেই বা কোথায় রাখেন। গোপরাজ নন্দ অতিশয় ব্যস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বালকও দুর্য্যোগ দর্শনে পিতার কণ্ঠ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তথায় রাধিকা আসিয়া দর্শন দিলেন। রাধিকা তখন পূর্ণযুবতী এবং বিশ্ব-বিমোহিনী। সেই দৈবদুর্য্যোগকালে, সেই গভীর বনমধ্যে রাধাকে দর্শন করিয়া নন্দ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার মায়া বিদূরিত ও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। রাধা কে, কৃষ্ণ কে, তাহা তাঁহার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল,—মহামুনি গর্গবাক্য স্মরণ হইল। তাই মহাভক্ত গোপরাজ নন্দ—

উবাচ তাং সাশ্রুনেত্রো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ ॥
জানামীমং মহাবিষ্ণোঃ পরং নির্গুণমচ্যুতম্।
তথাপি মোহিতোঽহঞ্চ মানবো বিষ্ণুমায়য়া ॥

ভক্তির অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন,—গর্গমুখে শুনিয়াছি, তুমি লক্ষ্মী হইতেও হরির প্রিয়তমা, এবং আমার ক্রোড়স্থ এই বালক মহাবিষ্ণু। ইহা জানিয়া আমি বিষ্ণুমায়ায় সমাচ্ছন্ন—বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। চিনিয়াও তোমাদিগকে চিনিতে পারি না।

নন্দ রাধিকার ক্রোড়ে আপন শিশুকে প্রদান করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন,—দেবি, তোমার প্রিয়তমকে তুমি গ্রহণ কর এবং তোমার মনোরথ পূর্ণ কর—আর এই দুর্য্যোগে রক্ষা করিয়া আমার পুত্রকে আমায় প্রদান করিও। রাধিকা কৃষ্ণকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এখন আমাদিগকে এইস্থলে কিছু বুঝিয়া দেখিতে হইবে। নন্দ গোকুল হইতে গোধন ও স্নেহাধিক্য জনিত বালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে গোচারণ জন্য আসিতে পারেন, হঠাৎ একদিন সেই সময়ে খুব ঝড় জলও আসিতে পারে, তাহাতে নন্দ, পুত্র ও গাভী লইয়া বিপন্ন হইতে পারেন,—কিন্তু সেই দুর্য্যোগে রাধিকার সেস্থানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না! না হয়, ধরিয়া লওয়া গেল, তাও আছে। রাধিকা তখন যুবতী—তখনকার বর্ণনা পাঠে জান যায়, গোপবালাগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনা ছিল, তাহারা মথুরায় হাট করিত, জলে জলে সন্তরণ করিত—গোপগণের সহিত সমস্ত কার্য্যে যোগদান করিত, ইত্যাদি। রাধাও গোপবালা—রাধাও স্বাধীনা। ভাণ্ডীরবনে কোন কারণে আগমন করিয়া শেষে ঝড়জলে ঠেকিয়া ছুটিয়া গৃহপানে

যাইতেছিল। হঠাৎ গোপরাজ নন্দ তাহাকে দেখিয়া পুত্রকে তাহার নিকট প্রদান করেন, এবং ঝড়জল থামিলে পুত্রকে লইয়া যাইবেন বলেন,—হইতে পারে, এইটুকু আসল কথা—আর তুমি হরির প্রিয়তমা, আর বালক কৃষ্ণ স্বয়ং মহাবিষ্ণু। তোমার প্রিয়তমকে গ্রহণ ও নিজ মনোরথ পূর্ণ করিয়া আবার আমার পুত্রকে আমায় ফিরাইয়া দিও—এ কথাটা যেমন কুৎসিত, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক!

এমন কথা উঠিতেছে। বাস্তবিক আমাদের বুদ্ধির দোষেই এমন কথা উঠিতেছে।

রাধা কি, ইহা যখন বুঝিতে পারিব, তখন বুঝিব, নন্দ সেই প্রকৃতির বিপর্য্যয় ও তন্মধ্যে রাধাকে দেখিয়াই দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছিলেন, এবং মহাপ্রকৃতির কোলে মহাপুরুষকে প্রদান করিয়াছিলেন। এখন সেই মহাপ্রকৃতির কোলে মহাপুরুষ কি করিয়াছিলেন, শাস্ত্রবাক্যে তাহাই পাঠ করা যাউক।

গত্বা দূরে তং নিনায় বাহুভ্যাঞ্চ যথেপ্সিতম্।
কৃত্বা বক্ষসি তং কামাৎ শ্লেষং শ্লেষং চুচুম্ব হ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী সস্মার রাসমণ্ডলম্।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

রাধা কৃষ্ণকে বাহুযুগলের দ্বারা বক্ষে করিয়া দূরে গমন করিলেন। কামবশে আলিঙ্গন ও যত্নপূর্ব্বক বারংবার চুম্বন করিলেন। এবং তাহাতে পুলকিতাঙ্গী হইয়া রাসমণ্ডলের স্মরণ করিলেন। মহামায়া মূল প্রকৃতির স্মরণে রাসমণ্ডলের আবির্ভাব হইল।

দদর্শ রত্নকলস-শতকেন সমন্বিতম্।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং চিত্রকাননশোভিতম্॥

চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রব্যযুক্তয়া।
সংযুক্তং মালতীমালাসমূহ-পুষ্পশয্যয়া॥
নানাভোগসমাকীর্ণং দিব্যদর্পণসংযুতম্।
মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্য-মালাজালৈর্বিভূষিতম্॥
মণীন্দ্রসাররচিত-কবাটেন বিরাজিতম্।
ভূষিতং ভূষণৈর্বস্ত্রৈঃ পতাকানিকরৈর্ব্বরৈঃ॥
কুঙ্কুমাকারমণিভিঃ সপ্তসোপান-সংযুতম্।
যুক্তং ষট্‌পদসন্দোহৈঃ পুষ্পোদ্যানঞ্চ পুষ্পিতৈঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

শত শত রত্নকলস-সমন্বিত, নানা চিত্র-চিত্রিত, বহু চিত্রকাননে পরিশোভিত এবং সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ মণিস্তম্ভসমূহে বিরাজিত, কৃষ্ণ-মায়ানির্ম্মিত রাসমণ্ডল রাধিকাদেবী দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, মণ্ডপের মধ্যভাগে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যযুক্ত মালতীমালা বিরচিত, মনোহর কত পুষ্পশয্যা তথায় বিরাজমান। মণ্ডপমধ্যে কোথাও নানাবিধ মনোহর ভোগ্যবস্তু, কোথাও দিব্যদর্পণ-যুক্ত, কোথাও বা মণীন্দ্র-মুক্তা-মাণিক্য প্রভৃতির মালাশ্রেণীতে সুশোভিত। সেই রত্নমণ্ডপ সারভূত মণি-নির্ম্মিত, কবাটযুক্ত ও বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ পতাকাসমূহে বিভূষিত। তাহাতে কুঙ্কুমাকার মণিনির্ম্মিত সাতটি সোপান বর্ত্তমান। তাহার চারিদিকে ষট্‌পদযুক্ত বিকশিত পুষ্পসমূহে সুশোভিত মনোহর পুষ্পোদ্যান।

শিষ্য। একটু অপেক্ষা করুন,—আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

গুরু। যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, বল।

শিষ্য। এই যে রাসমণ্ডল আবির্ভূত হইল, ইহা পূর্ব্বে ছিল, না হঠাৎ প্রস্তুত হইল ?

গুরু। ছিল।

শিষ্য। কোথায় ছিল ?

গুরু। গোলোকে।

শিষ্য। গোলোক কোথায় ?

গুরু। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্যলোকের উপরে। সেখানে কেবল রস ও রাস। সেই রসের ধারা জীবকণ্ঠে প্রদান করিতে জগতে এই রাসের আবির্ভাব। আর রাসবিহারী পুরুষ ও রাসেশ্বরী মূল প্রকৃতির এই প্রথম রসের মিলন। তাই রাসেশ্বরীর কামবশে পুরুষের গাত্রে প্রথমালিঙ্গন।

শিষ্য। তৎপরে কি ঘটিল, তাহা বলুন।

গুরু। তারপরে শ্রীমতী রাধিকা রাসমণ্ডল-মধ্যস্থলে অপূর্ব্ব এক নবীন কিশোর পুরুষকে শায়িত দেখিলেন। দেখিলেন,—

পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরম্।
কোটিকন্দর্পলীলাভং চন্দনেন বিভূষিতম্॥
শয়ানং পুষ্পশয্যায়াং সস্মিতং সুমনোহরম্।
পীতবস্ত্রপরীধানং প্রসন্নবদনেক্ষণম্॥
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্।
সদ্রত্নসার-নির্ম্মাণ-কেয়ূরবলয়ান্বিতম্॥
মণীন্দ্রকুণ্ডলাভ্যাঞ্চ গণ্ডস্থলবিরাজিতম্।
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ বক্ষঃস্থল-সমুজ্জ্বলম্॥

শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্য-প্রভামুষ্টমুখোজ্জ্বলম্।
শরৎ-প্রফুল্লকমল-প্রভামোচনলোচনম্॥
মালতীমাল্যসংশ্লিষ্ট-শিখিপুচ্ছসুশোভিতম্।
ত্রিভঙ্গচূড়াং বিভ্রন্তং পশ্যন্তং রত্নমন্দিরম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

মণ্ডপমধ্যে পুষ্পশয্যায় কমনীয় শ্যামসুন্দর কিশোর-বয়স এক পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শরীর কোটি কন্দর্পের আভার ন্যায় প্রভাশালী এবং চন্দনে বিভূষিত। তিনি সস্মিত ও মনোহর। তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান;—বদনমণ্ডল ও নয়ন প্রসন্ন,—অঙ্গ শ্রেষ্ঠ মণিনির্ম্মিত কেয়ূর ও বলয়যুক্ত। তাঁহার গণ্ডস্থল মণিময় কুণ্ডলযুগলে শোভিত। বক্ষঃস্থল মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তভের দ্বারা বিরাজিত, এবং মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের প্রভানিন্দিত ও লোচনদ্বয় শারদীয় কমলের ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর। সেই পুরুষ মালতীমালাযুক্ত শিখিপুচ্ছ-পরিশোভিত ত্রিভঙ্গ চূড়া ধারণ করিয়াছেন, এবং সেই রাসমন্দিরের শোভা দর্শন করিতেছেন।

শিষ্য। রাসমণ্ডলমধ্যস্থ সেই কিশোর পুরুষ কৃষ্ণ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। আর রাধিকার কোলেও কৃষ্ণ?

গুরু। না। সেই বালক কৃষ্ণই রাসে কিশোর কৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যেশ্বর ভগবানের তাহাও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এস্থলে ক্রোড় হইতে অন্তর্হিত হইয়াই রাসমণ্ডল-মন্দিরে কিশোর হইয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্য কথা নহে। সাধারণ যোগিগণও এখন করিতে পারেন,—আর যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ ইহা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, সে মূর্ত্তি

দেখিয়া রাধিকা মুগ্ধ হইলেন, এবং নিজ ক্রোড়স্থ বালক নাই দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্না হইলেন।

ক্রোড়ং বালকশূন্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং নবযৌবনম্।
নষ্টস্মৃতিস্বরূপা সা তথাপি বিস্ময়ং যযৌ॥
রূপং রাসেশ্বরী দৃষ্ট্বা মুমোহ সুমনোহরম্।
কামাচ্চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং মুখচন্দ্রং পপৌ মুদা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

দেবী রাধা সকল স্মৃতিস্বরূপা হইয়াও ক্রোড়স্থিত বালককে না দেখিয়া এবং সেই নবযৌবনসম্পন্ন পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাসেশ্বরী সেই সুমনোহর রূপদর্শনে মোহিত হইলেন, এবং কামবশে তাঁহার লোচনরূপ চকোরযুগল সেই পুরুষের মুখচন্দ্রের রশ্মি নিয়ত পান করিতে লাগিল।

শিষ্য। এইস্থলে আমার কয়েকটি কথা জানিবার আছে।

গুরু। বল।

শিষ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, আর রাধিকা মূলপ্রকৃতি,—একথা আপনি ইত্যগ্রে বলিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, সেই পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে এরূপ একটা প্রবল ও গোপন আয়োজন কেন?

গুরু। এ মিলন চিরদিন গোপন। ইহা কর্ম্মীর কাছে গোপন, নিষ্কর্ম্মীর কাছে গোপন। ইহা জ্ঞানীর কাছে গোপন, অজ্ঞানীর কাছে গোপন, ইহা বেদের কাছে গোপন, বিধির কাছে গোপন। যাগ-যজ্ঞ জপ-তপ, সকলের কাছেই ইহা গোপন। কেবল রসিকের নিকট—রসপ্রয়াসীর হৃদয়ে ইহা চিরসমুজ্জ্বল। অন্যে ইহা ব্যভিচার মনে করে—কিন্তু রসিক জানেন, ইহাই সাধনার শেষ, ইহাই ব্যষ্টিজগতের প্রার্থনা,

ইহাই প্রেমের অনুকরণ। সেই মহাপ্রকৃতি গোপনলীলার জন্য দারুণ দুর্ব্বাসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাই ভক্ত কাতরে বলিয়াছেন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতঃ প্রচলিতপ্রত্যদ্রিকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

পুরুষাখ্য পরমাত্মা সহস্রারে শায়িত, ষট্‌পদযুক্ত বা ষট্‌চক্র-শোভিত রাসমণ্ডলের পথে প্রকৃতিদেবী সেখানে বা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহা যোগীর যোগসাধনা—ভক্তের ভক্তির মিলন—প্রেমিকের পূর্ণ প্রেমের মহল্লীলা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে এই সময় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার বিধিপূর্ব্বক বিবাহ দিয়াছিলেন।

শিষ্য। কথাটায় বড় গোল বাধিল।

গুরু। কেন?

শিষ্য। বয়সে বড় শ্রীরাধিকার সহিত বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইল? ব্রহ্মাই বা সহসা সেখানে কি জন্য আবির্ভূত হইলেন? যদি বলা যায়, বিবাহ না হইলে শ্রীকৃষ্ণের পারদারিক দোষ হইত—তাহাই সংশোধিত করিতে ব্রহ্মার আবির্ভাব ও রাধাকৃষ্ণের বিবাহ সংঘটন।— কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে রাসলীলা করিয়াছিলেন, তখন একা রাধার সহিত নহে—ব্রজের অনেক কুল-কামিনীই পতি পরিত্যাগ করিয়া তথায় আসিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ

সে অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন না। তবে ঐ অস্বাভাবিক ঘটনার কারণ কি?

গুরু। তুমি সত্য অনুমান করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার এই বিবাহে কৃষ্ণকে পারদারিক দুর্নাম হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাওয়া হয় নাই। ইহার অন্য উদ্দেশ্য আছে। ইহা গ্রন্থকারের কল্পিত কাহিনী নহে—ভগবৎকৃপায় লব্ধ জ্ঞানের অমৃত-ধারা। ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া শ্রীমতী রাধিকাকে বলিয়াছিলেন ;—

সর্ব্বা দেব্যঃ প্রকৃত্যংশা জন্যাঃ প্রাকৃতিকা ধ্রুবম্।
ত্বং কৃষ্ণার্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা তুল্যা কৃষ্ণেন সর্ব্বতঃ॥
শ্রীকৃষ্ণস্ত্বময়ং রাধা ত্বং রাধা বা হরিঃ স্বয়ম্।
ন হি বেদেষু মে দৃষ্ট ইতি কেন নিরূপিতম্॥
ব্রহ্মাণ্ডাদ্‌বহিরূর্দ্ধে চ গোলোকোঽস্তি যথাম্বিকে।
বৈকুণ্ঠশ্চাপ্যজন্যশ্চ ত্বমজন্যা তথাম্বিকে॥
যথা সমস্তব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণাংশাংশজীবিনঃ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং তথা তেষু স্থিতা সদা॥
পুরুষাশ্চ হরেরংশাস্ত্বদংশা নিখিলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আত্মায়ং দেহরূপস্ত্বমস্যাধারস্ত্বমেব চ॥
অস্য প্রাণাশ্চ ত্বং মাতস্ত্বৎপ্রাণৈরয়মীশ্বরঃ।
কিমহো নির্ম্মিতঃ কেন কারুণা শিল্পকারিণা॥
নিত্যোঽয়ঞ্চ যথা কৃষ্ণস্ত্বঞ্চ নিত্যা তথাম্বিকে।
অস্যাংশা ত্বং ত্বদংশো বাপ্যয়ং কেন নিরূপিতঃ॥

অহং বিধাতা জগতাং বেদানাং জনকঃ স্বয়ম্।
তং পঠিত্বা গুরুমুখাদ্ভবন্ত্যেব বুধা জনাঃ॥
গুণানাং বা স্তবানান্তে শতাংশং বক্তুমক্ষমঃ।
বেদো বা পণ্ডিতো বান্যঃ কো বা ত্বাং স্তোতুমীশ্বরঃ॥
স্তবানাং জনকং জ্ঞানং বুদ্ধির্জ্ঞানাম্বিকা স্মৃতা॥
ত্বং বুদ্ধিজননী মাতঃ কো বা ত্বাং স্তোতুমীশ্বরঃ।
যদ্বস্তু দৃষ্টং সর্ব্বেষাং তন্নির্বক্তুং বুধোঽক্ষমঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সকল দেবীগণ প্রকৃতির অংশসম্ভূত, অতএব তাহারা প্রাকৃতিক ও জন্যা; কিন্তু আপনি শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ-সম্ভূতা এবং সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার সদৃশী। আপনি শ্রীকৃষ্ণ, ইনি রাধা; ইনি রাধা, আপনি শ্রীকৃষ্ণ; এরূপ নিশ্চয় কে করিতে পারে? ইহা বেদেও কথন দেখিতে পাই নাই। ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধদেশে গোলোক ধাম, আপনি তথায় বাস করেন। যেরূপ গোলোক ও বৈকুণ্ঠ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্য। যেরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীব কৃষ্ণের অংশ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ আপনিও সেই সকল প্রতিজীবে সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। পুরুষগণ হরির অংশসম্ভূত, স্ত্রীগণ আপনার অংশসম্ভূত। ভগবান্ কৃষ্ণ আত্মা স্বরূপ, আপনি দেহ স্বরূপ ও আধাররূপিণী। মাতঃ! আপনি কৃষ্ণের প্রাণযুক্ত হইয়া জগতে মাতৃস্বরূপা হইয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর হইয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয়—কোন্ শিল্পী এরূপ করিয়াছে, তাহা বোধগম্য নহে। কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, আপনিও সেইরূপ নিত্য। আপনি ইঁহার অংশ, কি ইনি আপনার অংশ—তাহা কেহই নিরূপণ করিতে

পারে না। আমি জগতের বিধাতা ও বেদকর্ত্তা—আমিই যখন তাহা স্থির করিতে পারি নাই বা পারিব না, তখন সেই বেদ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করত কোন্ পণ্ডিত তাহা স্থির করিতে সক্ষম হইবে? স্তবের কারণভূত জ্ঞান, আপনিই জ্ঞানরূপিণী অম্বিকা। আপনি বুদ্ধির জননী। এরূপ বুদ্ধিমান্ কে আছে যে, বুদ্ধিদ্বারা আপনার গুণানুকীর্ত্তন করিতে পারিবে? যে পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, পণ্ডিতগণ তাহারই নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন,—কিন্তু অদৃষ্ট অশ্রুত বিষয়ের নির্ব্বাচন করিতে কে সমর্থ হয়?

ব্রহ্মা স্তুতিচ্ছলে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, রাধা-কৃষ্ণে ভেদ নাই। অগ্নি ও দাহিকা শক্তির যে প্রভেদ, রাধা-কৃষ্ণেও সেই প্রভেদ অনুমান করা যাইতে পারে। এ কথা শাস্ত্রসমূহে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে—প্রবন্ধান্তরে তাহা আমরা জানিতে পারিব।

এক্ষণে ব্রহ্মার আবির্ভাবের কারণ এই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনরূপ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সাধিত করেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির প্রবাহ ও স্থিতির প্রবাহ উভয় বিপরীত-গামী। সৃষ্টির আদি প্রবৃত্তি, এবং স্থিতির আদি নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সহায়ক ভেদ, এবং নিবৃত্তির সহায়ক অভেদ। সকল জীবকে নিষ্ফল করিবার জন্য প্রথমে বেদের প্রকাশ। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সন্ধিস্থল।

এখন ভগবান্ পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিষ্কামের বা প্রেমের সাধনা জগতে প্রচার করিতেছেন। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে এক নূতন ভাবের ঢেউ আসিতেছে,—যাহা গোলোকের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব, তাহা স্থূল হইয়া জগতে

আবির্ভূত হইতেছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্যলোকেরও উপরের তত্ত্ব স্থূলতম ভূলোকে আসিতেছে—সুতরাং তাহা ব্রহ্মার সৃষ্টির পথেই আসিতে হইবে,—তাই ব্রহ্মার আবির্ভাব। তাই গোলোকের রাসমণ্ডল জগতে আসিয়া ব্রহ্মার সমক্ষে উপস্থিত হইল। তাই গোলোকের অভেদ প্রকৃতিপুরুষ মর্ত্ত্যজগতে বা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পৃথক্‌রূপে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অভেদের ভেদ হইল। পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ বিধিবদ্ধ হইল। এখন কি প্রকারে সেই ভেদের অভেদ হয়,—কি করিয়া প্রকৃতির পুংভাব বা মোক্ষ হয়,—তাহাই ভগবান্ ব্রজলীলায় দেখাইবেন।

এই যে মিলন—এই যে বিবাহ, ইহা মর্ত্ত্যলোকের জন্য নহে। ইহা গোলোকভাব। তুমি আমি এতত্ত্ব বুঝিতে পারি না। পুরাণের এটুকু ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। সাধারণের পাঠ্য ভাগবতে তাই ভাগবতকার এ তত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই।

শিষ্য। এখন জিজ্ঞাস্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ—তিনি ইচ্ছাময়, তবে এই মিলনে ব্রহ্মার সাহায্য লইলেন কেন?

গুরু। ভগবানের শৃঙ্খলাময় সৃষ্টিতত্ত্বে সমস্ত ক্রিয়াই যথাবিধি—সুনিয়মের পথে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তত্ত্বসকল সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের পথে আসিতে হইলে নিয়মিত ভাবেই আসিবে। কিন্তু ইহা হইতে আরও সুন্দর কথা আছে। কূর্ম্মপুরাণ হইতে তাহা তোমাকে আমি শুনাইতেছি।—

যোজয়ামি প্রকৃত্যাহং পুরুষং পঞ্চবিংশকম্।
তয়া স সঙ্গতো দেবঃ কূটস্থঃ সর্ব্বগোঽমলঃ॥

সৃজত্যশেষমেবেদং স্বমূর্ত্তেঃ প্রকৃতেরজঃ ॥
স দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা বিশ্বরূপঃ পিতামহঃ।
তবৈতৎ কথিতং সম্যক্ স্রষ্টৃত্বং পরমেষ্ঠিনঃ॥
একোহহং ভগবান্ কালো হ্যনাদিশ্চান্তকৃদ্বিভুঃ।
সমাস্থায় পরং ভাবং প্রোক্তো রুদ্রো মনীষিভিঃ ॥

কূর্ম্মপুরাণ।

রুদ্র বলিলেন—আমি কাল, আমি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব পুরুষ ও প্রকৃতিকে সংযুক্ত করিয়া থাকি। সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল নিত্য কূটস্থ চৈতন্ত স্বরূপ ঐ অনাদি নারায়ণ দেব স্বীয়মূর্ত্তি প্রকৃতি হইতে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়া-সম্ভব বিশ্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ দেবই সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরমেশ্বরের সৃষ্টিকারিত্ব তোমার নিকট সম্যক্‌রূপে উক্ত হইল। অদ্বিতীয় ও বিভু আমিই ভগবান্ অনাদি কালস্বরূপ এবং জগতের অন্তকারী ; পরম ভাব আশ্রয় করিয়া আমিই মনীষিগণ কর্ত্তৃক রুদ্র-পদ-বাচ্য হইয়া থাকি।

এখন বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, ভগবান্ তাঁহার প্রকৃতিতে সঙ্গত হইতেছেন – রাসমণ্ডল উপস্থিত হইলে কেন ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরাধা।

শিষ্য। এখনকার শিক্ষিতগণের মতে রাধা একটা গোঁজামিলান পদার্থ। রাধা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, হইতে পারে না এবং হইবেও

না। তাঁহাদের মতে রাধা অশাস্ত্রীয় ও আজগুবী জিনিষ। কৃষ্ণাবতারের সহিত রাধার কোন সম্বন্ধ বা দাবীদাওয়া নাই। তাঁহারা বলেন—"সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ-উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির বা মূর্ত্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে রাধা নাই, তবে এ রাধা-আসিলেন কোথা হইতে।

গুরু। ভাগবতে গোপীপ্রেমেরই প্রকৃষ্ট ভাব বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ বা সমবেত গোপীদিগের কথাই তাহাতে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা লিখিত হয় নাই—মহাভারত কৃষ্ণজীবনী নহে—কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস, কুরুপাণ্ডবদিগের সংস্রবে যদুবংশের বা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কথা সংসৃষ্ট ও ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহাই লিখিত হইয়াছে। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের বংশপরিচয় ও লীলার কথা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষরূপে মধুর লীলা বলা হয় নাই,—ঐ সকল গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের উপাসনার কথাও কিছু বলা হয় নাই, সুতরাং রাধার নাম বা উপাসনার কথা তাহাতে নাই বলিয়া রাধা যে লুকান বা বৈষ্ণব কবিদের গড়ান বাজে পদার্থ, তাহা নহে। যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা আছে, যে গ্রন্থে মধুর লীলার পরিস্ফুটতা আছে, যে গ্রন্থে রাধার বিষয় বর্ণনার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই গ্রন্থে রাধার নাম আছে।

শিষ্য। আপনি বোধ হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কথা বলিতেছেন?

গুরু। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কথা পরে বলিব। কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

পুরাণ পুরাণের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া ইংরেজ পণ্ডিতগণের তথা তাঁহাদের শিষ্যোপশিষ্যগণের চক্ষে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

শিষ্য। তবে আর কোন্ গ্রন্থে আছে?

গুরু। বহু গ্রন্থে আছে।

শিষ্য। কোন প্রামাণিক গ্রন্থে আছে?

গুরু। হিন্দুর নিকট হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্রই প্রামাণিক। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ,চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির পদাবলী বা যাত্রার পালা, ইহা হিন্দু মান্য করে না। এসকল দেখিয়াও হিন্দু শ্রীরাধার পূজা করে না। হিন্দুর পুরাণে, হিন্দুর তন্ত্রে, হিন্দুর মন্ত্রে রাধা বিজড়িত।

শিষ্য। সে সকল গ্রন্থের নাম আমাকে বলুন।

গুরু। শোন; বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্দেবীভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের একখানি পুরাণ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। * এবং ঐ গ্রন্থ হিন্দুর সমাজে বিশেষ আদরণীয়। † সেই শ্রীমদ্দেবীভাগবতে শ্রীরাধার সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই ;—

নারদ উবাচ।—

শ্রুতং সর্ব্বমুপাখ্যানং প্রকৃতীনাং যথাতথম্।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রহস্যং বেদগোপিতম্।
রাধায়াশ্চৈব দুর্গায়া বিধানং শ্রুতিচোদিতম্॥
মহিমা বর্ণিতোঽতীব ভবতা পরয়োর্দ্বয়োঃ।
শ্রুত্বা তং তদ্গতং চেতো ন কস্য স্যান্মুনীশ্বর॥

* বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র; ১৬৫ পৃঃ।
† বঙ্কিম বাবুও একথা স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্র, ৯৫ পৃঃ।

যয়োরংশো জগৎ সর্ব্বং যন্নিয়ম্যং চরাচরম্।
যয়োর্ভক্ত্যা ভবেন্মুক্তিস্তদ্বিধানং বদাধুনা॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবত, ৯৫০।১—৪।

"দেবর্ষি নারদ কহিলেন,—ভগবন্! যে প্রকৃতি-উপাখ্যান শ্রবণ করিলে মানবগণ সংসারবন্ধন ও জন্মপাশ হইতে বিমুক্ত হয়,আমি যথাশাস্ত্র সেই প্রকৃতি দেবীগণের উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম; তথাপি শ্রীরাধার ও দুর্গার বেদবর্ণিত পরম রহস্য শ্রবণ করিতে বাসনা করি। মুনিবর! যদিও আপনি শ্রীরাধা ও দুর্গার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে আমার তৃপ্তি বোধ হয় নাই। বাস্তবিক ঐ উভয়ের মহিমা শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত না তন্ময় হয়? এই জগৎ তাঁহাদিগেরই অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত চরাচর তাঁহাদিগের দ্বারাই নিয়মিত হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি থাকিলে, অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়; অতএব মুনিবর! তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষ বিবৃত করুন।"

নারদের প্রশ্নে নারায়ণ ঋষি বলিলেন:—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং শ্রুতিনোদিতম্।
যন্ন কস্যাপি চাখ্যাতং সারাৎসারং পরাৎপরম্॥
শ্রুত্বা পরস্মৈ নো বাচ্যং যতোঽতীব রহস্যকম্।
মূলপ্রকৃতিরূপিণ্যাঃ সংবিদো জগদুদ্ভবে॥
প্রাদুর্ভূতং শক্তিযুগ্মং প্রাণবুদ্ধ্যধিদৈবতম্।
জীবানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং নিয়ন্তৃ প্রেরকং সদা॥
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং বিরাড়াদি চরাচরম্।
যাবত্তয়োঃ প্রসাদো ন তাবন্মোক্ষো হি দুর্ল্লভঃ॥

ততস্তয়োঃ প্রসাদার্থং নিত্যং সেবেত তদ্দ্বয়ম্।
তত্রাদৌ রাধিকামন্ত্রং শৃণু নারদ ভক্তিতঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভির্নিত্যং সেবিতো যঃ পরাৎপরঃ।
শ্রীরাধেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নের্জ্জায়া ততঃ পরম্॥
ষড়ক্ষরো মহামন্ত্রো ধর্ম্মাদ্যর্থপ্রকাশকঃ।
মায়াবীজাদিকশ্চায়ং বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ॥
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি।
এতন্মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে॥
জগ্রাহ প্রথমে মন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণো ভক্তিতৎপরঃ।
উপদেশান্মূলদেব্যা গোলোকে রাসমণ্ডলে॥
বিষ্ণুস্তেনোপদিষ্টস্তু তেন ব্রহ্মা বিরাট্ তথা।
তেন ধর্ম্মস্তেন চাহমিত্যেষা হি পরম্পরা॥
অহং জপামি তং মন্ত্রং তেনাহমৃষিরীরিতঃ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা নিত্যং ধ্যায়ন্তি তাং মুদা॥
কৃষ্ণার্চ্চায়াং নাধিকারো যতো রাধার্চ্চনং বিনা।
বৈষ্ণবৈঃ সকলৈস্তস্মাৎ কর্ত্তব্যং রাধিকার্চ্চনম্॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী সা তদধীনো বিভুর্যতঃ।
রাসেশ্বরী তস্য নিত্যং তয়া হীনো ন তিষ্ঠতি॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবত; ৯।৫০।৫—১৭॥

"নারায়ণ কহিলেন,—নারদ! বেদবর্ণিত রাধা ও দুর্গারহস্য কীর্ত্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সারাৎসার ও পরাৎপর রহস্য আমি আর কাহারও নিকট বর্ণন করি নাই। এই রহস্য অতীব গোপনীয়। ইহা শ্রবণ করিয়া আর কাহারও নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা—এই উভয় মূল প্রকৃতি ভুবনেশ্বরী হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ উভয় শক্তিই জগতের পরিচালক। এমন কি, মহাবিরাট্ হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত চরাচর মূল প্রকৃতির অধীন। এমন কি, তাঁহারা প্রসন্ন না হইলে মুক্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব মূল প্রকৃতির প্রসন্নতা নিমিত্ত নিয়ত তাঁহাদিগের সেবা করা কর্ত্তব্য। বৎস নারদ! ঐ উভয় মূল প্রকৃতির মধ্যে প্রথমতঃ রাধামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই নিয়ত ঐ মন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। "শ্রীরাধায়ৈ স্বাহা" ইহা মূলমন্ত্র। এই ষড়ক্ষর মন্ত্রে ধর্ম্মাদি সমস্তই সুখলভ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাদ্বারা সমস্ত বাঞ্ছাই পূর্ণ হয়। এমন কি, সহস্রকোটি মুখ, এবং শতকোটি জিহ্বা লাভ হইলেও এই মন্ত্রের মহিমা বর্ণন করা যায় না। মূল প্রকৃতির আকাশবাণী হওয়াতে, প্রথমেতে কৃষ্ণ গোলোকে রাসমণ্ডলে এই মন্ত্র প্রাপ্ত হন। তাহার পরে কৃষ্ণের নিকট হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণুর নিকট হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নিকট হইতে বিরাট্, বিরাটের নিকট হইতে ধর্ম্ম এবং তৎপরে ধর্ম্মের নিকট হইতে আমি এই মন্ত্র লাভ করি। আমি ঐ মন্ত্র জপ করিয়া ঋষি নামে বিখ্যাত হইয়াছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ নিয়ত পরমানন্দে ঐ মূলপ্রকৃতির ধ্যান করিয়া থাকেন। রাধিকার পূজা ব্যতীত কখন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় অধিকার থাকে না। অতএব বিষ্ণুপরায়ণ মানবগণের পক্ষে প্রথমতঃ রাধার অর্চ্চনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাধার একান্ত অধীন। রাসেশ্বরী রাধা নিয়ত তাঁহার

নিকট অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ কখন ক্ষণকালের জন্য জীবন ধারণ করিতে পারেন না।”

এই দেবীভাগবত গ্রন্থখানি শাক্তগণের পরম আদরের গ্রন্থ এবং ইহাতে দুর্গাচরিত বর্ণিত। রাধার কথা বাজে কথা হইলে, কখনই এই গ্রন্থে তাহা স্থান পাইত না। আর একটী কথা এস্থলে তোমাকে শুনাইব। “সামবেদে রাধার কথা বর্ণিত আছে”—এই কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার লিখিয়াছেন বলিয়া তিনি মিথ্যাবাদী আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন, * কিন্তু দেবীভাগবতেও সে কথা অধিকতর স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। যথা :—

অথ ধ্যায়েন্মহাদেবীং রাধিকাং রাসনায়িকাম্।
পূর্ব্বোক্তরীত্যা তু মুনে সামবেদে বিগীতয়া॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবত ; ৯।৫০।২০—২১।

যদি দেবীভাগবতকারকেও সেই দোষে দোষী করা যায়, তবে আর কথাই নাই। বলা বাহুল্য, আমরা বেদের অর্থ বা মন্ত্রের কিছুই বুঝি না। ইংরেজগণের অনুবাদ পড়িয়া সেই বিদ্যার বলে ব্যাসের ভুল ধরিতে যাওয়া প্রগল্‌ভতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

শিষ্য। দেবীভাগবতোক্ত শ্রীরাধা যে বৃন্দাবনের রাধিকা, তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। প্রমাণ দেবীভাগবতেই আছে। যথা :—

কেনচিৎ কারণেনৈব রাধা বৃন্দাবনে বনে।
বৃষভানুসুতা জাতা গোলোকস্থায়িনী সদা॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবত ; ৯।৫০।৪৩

* বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র ১৮৩ পৃঃ।

"কোন কারণবশতঃ নিরন্তর গোলোকবাসিনী শ্রীরাধা বৃন্দাবনে বৃষভানুপুত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

বৃষভানুরিতি খ্যাতো যজ্ঞে বৈশ্যকুলোদ্ভবঃ।
সর্ব্বসম্পত্তিসম্পন্নঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ ॥
উবাহ কীর্ত্তিদানাম্নীং গোপকন্যামনিন্দিতাম্ ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং প্রতপ্তকনকপ্রভাম্ ॥
বৃষভানুর্মহাভক্তঃ কীর্ত্তিদায়াস্তপোবলাৎ ।
অস্মাদ্বিনয়বাহুল্যাত্তৎকন্যা রাধিকাভবৎ ॥
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবেৎ ।
অস্যাং দিনার্দ্ধেঽভিজিতে নক্ষত্রে চানুরাধিকে ॥
রাজলক্ষণসম্পূর্ণাং কীর্ত্তিদাসূত কন্যকাম্ ।
অতীব সুকুমারাঙ্গীং সিতরশ্মিসমপ্রভাম্ ।
ত্রৈলোক্যাদ্ভুতসৌন্দর্য্যাং দোষনির্ম্মুক্তবিগ্রহাম্ ॥

তারপরে এই রাধিকা সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ—

দাহশক্তির্যথা বহ্নেস্তথৈষা মম বল্লভা ।
অনয়া সহ বিচ্ছেদং ক্ষণমাত্রং ন বিদ্যতে ॥
তথা চ রসপোষায় প্রকটস্যানুসারতঃ ।
করোমি লীলামতুলাং যোগাযোগবিবর্দ্ধিতাম্ ॥

* * * * *

কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং নাম রাধয়া সহ যো বদেৎ।
আহূতসংপ্লবং যাবৎ বসামি তত্র নারদ॥
মন্নামলক্ষজাপেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং স সমাপ্নোতি রাধাকৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

বৃষভানুপুরী নাম্না সর্ব্বরত্নময়ী শুভা।
সুবর্ণমণিমাণিক্য-বিচিত্রভবনাঙ্গনা॥
অণিমাদি-সুখৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণমনোহরা।
চিত্রধ্বজপতাকাদিবিচিত্রা চিত্রনির্ম্মিতা॥
চিদানন্দস্বরূপা সা চিদানন্দপ্রদায়িনী।
আনন্দকলিলা নার্য্যো যত্র তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা॥
বিচিত্রবেশালঙ্কারা বিচিত্রবসনাম্বরা।
নানাবেশবিচিত্রাঙ্গী প্রমদামোহদায়িনী।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না রাধানাম্নী বিনোদিনী॥
জগতাং মোহিনী দেবী গুহ্যগুহ্যাতিসুন্দরী।
মূঢ়ানামসতাঞ্চৈব ন কথ্যং মুনিসত্তম॥
অপরং কিং নিগদেঽহমেকবক্ত্রেণ নারদ।
শ্রীরাধারূপলাবণ্য-গুণাদীন্ বক্তুমক্ষমঃ॥

পদ্মপুরাণ ; উত্তরখণ্ড। ১৬২ অঃ।

সুবর্ণ-মণিমাণিক্যাদি-শোভিত, অণিমাদি-যোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ চিত্র-ধ্বজ-

পতাকাদিতে শোভমান, সর্ব্বরত্নময়ী বৃষভানু-পুরীতে চিদানন্দস্বরূপা এবং চিদানন্দদায়িনী রাধা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাধার রূপলাবণ্য, রাধার গুণ বর্ণনার অসাধ্য।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

পদ্মপুরাণ।

শ্রীমতী রাধিকা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, তাহার কুণ্ডও তদ্রূপ কৃষ্ণের প্রিয়। সকল গোপীর মধ্যে সেই রাধিকাই প্রিয়তমা।

নারদপঞ্চরাত্র নামক হিন্দুর প্রামাণিক গ্রন্থের কথা তোমার নিকটে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই গ্রন্থে শ্রীরাধা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শোন :—

শ্রীমহাদেব উবাচ।—

অপূর্ব্বং রাধিকাখ্যানং গোপনীয়ং সুদুর্ল্লভম্।
সদ্যো মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং বেদসারং সুপুণ্যদম্॥
যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥
যথা স এব সগুণঃ কালে কর্ম্মানুরোধতঃ।
তথৈব কর্ম্মণা কালে প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা॥
তস্যৈব পরমেশস্য প্রাণেষু রসনাসু চ।
বুদ্ধৌ মনসি যোগেন প্রকৃতেঃ স্থিতিরেব চ॥

আবির্ভাবস্তিরোভাবস্তস্যাঃ কালেন নারদ।
ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ॥
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবীর াধারূপা চ সা মুনে।
রসনাধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়মেব সরস্বতী॥
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্ব্বতী॥

নারদপঞ্চরাত্র ; ৩অঃ। ৫০—৫৬।

"শ্রীমহাদেব কহিলেন ;—রাধিকার উপাখ্যান অপূর্ব্ব, গোপনীয়, সুদুর্ল্লভ, তৎক্ষণে মুক্তিপ্রদ, পবিত্র, বেদের সারভূত ও পুণ্যপ্রদ। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির পর, সেইরূপ রাধিকাও ব্রহ্মস্বরূপা নির্লিপ্তা ও প্রকৃতির পরস্থিতা। যেরূপ কর্ম্মানুরোধে কালবশে ভগবান্ সগুণ হন, সেইরূপ কর্ম্মদ্বারা কালে তিনিও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিস্বরূপা হন। সেই পরমেশ্বরের প্রাণ, রসনা, বুদ্ধি এবং মনে প্রকৃতির অবস্থিতি হয়। হে নারদ! কালে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। হরির ন্যায় তিনিও অকৃত্রিমা ও সত্যস্বরূপা। হে মুনে! প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই রাধা বলে। রসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—এক্ষণে হিমালয়ের কন্যা হইয়া ইঁহার নাম পার্ব্বতী হইয়াছে।"

নির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বসন্তাদ্যাশ্চ ঋতবস্তিষ্ঠন্তি তত্র সন্ততম্।
নানা ঋতুপ্রসূনেন ভূষিতো মুরলীধরঃ॥

তত্রৈব রাধিকাদেবী নানাসুখবিলাসিনী।
বদন্তী মুরলীগানং কুরু কান্ত প্রমোহনম্॥
যেন শব্দেন কামস্য উৎপত্তির্জায়তে সদা।
তদ্রাগঞ্চৈব তত্তালং কুরু গানং প্রযত্নতঃ॥
এবমানন্দসংযুক্তা মহাবেশবিলাসিনী।
বামভাগে সদা যাতি রাধিকা ভক্তবৎসলা॥

রাধাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে;—

রক্তবিদ্যুৎপ্রভা দেবী ধত্তে যস্মাৎ শুচিস্মিতে।
তস্মাত্তু রাধিকা নাম সর্ব্বলোকেষু গীয়তে॥

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে;—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—নারদ উবাচ;—

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥
আবির্ব্বভূব সা কেন কা বা সা জ্ঞানিনাং বরা।
কিং বা তল্লক্ষণং সা চ বভূব পঞ্চধা কথম্॥
সর্ব্বাসাং চরিতং পূজাবিধানং গুণমীপ্সিতম্।
অবতারঃ কৃতঃ কস্যাস্তস্যাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥

নারায়ণ উবাচ ;—

প্রকৃতের্লক্ষণং বৎস কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যৎ শ্রুতং রুদ্রবক্ত্রতঃ॥
প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥
গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তমসি স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানং সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ শক্তিরীশ্বরসন্ততম্।
সিদ্ধেশ্বরা সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী॥
বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুৎপিপাসা ছায়া তন্দ্রা দয়া স্মৃতিঃ।
জাতিঃ ক্ষান্তিশ্চ শান্তিশ্চ কান্তির্ভ্রান্তিশ্চ চেতনা॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা লক্ষ্মীর্ধৃতির্মাতা তথৈব চ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥
উক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতগুণশ্চাতিস্বল্পো যথাগমম্।
গুণোঽস্ত্যনন্তোঽনন্তায়া অপরাশ্চ নিশাময়॥

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মা চ পরমাত্মনঃ।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা॥
কান্তা দান্তাতিশান্তা চ সুশীলা সর্ব্বমঙ্গলা।
লোভমোহকামরোষাহঙ্কারপরিবর্জ্জিতা॥
ভক্তানুরক্তা পত্যুশ্চ সর্ব্বাদ্যা চ পতিব্রতা।
প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমপাত্রী প্রিয়ংবদা॥
সর্ব্বশস্যাত্মিকা সর্ব্বজীবনোপায়রূপিণী।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবাবতী সদা॥
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
গৃহে চ গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহিণী তথা
সর্ব্বপ্রাণিষু দ্রব্যেষু শোভারূপা মনোহরা।
প্রীতিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষু চ॥
বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহঙ্করা।
দয়াময়ী ভক্তমাতা ভক্তানুগ্রহকারিণী॥
চপলে চপলা ভক্তসম্পদো রক্ষণায় চ।
জগজ্জীবং মৃতং সর্ব্বং যয়া দেব্যা বিনা মুনে॥
শক্তির্দ্বিতীয়া কথিতা বেদোক্তা সর্ব্বসম্মতা।
সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্ববন্দ্যা চান্যাং মত্তো নিশাময়॥
বাগ্‌বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানাধিদেবতা পরমাত্মনঃ।
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা যা সা চ দেবী সরস্বতী॥

সুবুদ্ধি-কবিতা-মেধা-প্রতিভা-স্মৃতিদা সতাম্।
নানাপ্রকারসিদ্ধান্ত-ভেদার্থকল্পনাপ্রদা॥
ব্যাখ্যাবোধস্বরূপা চ সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী।
বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী॥
সর্ব্বসঙ্গীত-সন্ধানতাল-কারণকারিণী।
বিষয়জ্ঞানবাগ্রূপা প্রতিবিশ্বেষু জীবিনাম্॥
ব্যাখ্যামুদ্রাকরা শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা সুশীলা শ্রীহরিপ্রিয়া॥
হিমচন্দনকুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্নমালয়া॥
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী।
সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সদা॥
দেবী তৃতীয়া গদিতা শ্রীযুক্তা জগদম্বিকা।
যথাগমং যথাকিঞ্চিদপরাং সন্নিবোধ মে॥
মাতা চতুর্ণাং বেদানাং বেদাঙ্গানাঞ্চ ছন্দসাম্।
সন্ধ্যাবন্দনমন্ত্রাণাং তন্ত্রাণাঞ্চ বিচক্ষণা॥
দ্বিজাতিজাতিরূপা চ জপরূপা তপস্বিনী।
ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিস্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা॥
যৎপাদরজসা পূতং জগৎ সর্ব্বঞ্চ নারদ।
দেবী চতুর্থী কথিতা পঞ্চমীং বর্ণয়ামি তে॥

প্রেমপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী।
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সর্ব্বাদ্যা সুন্দরাবরা॥
সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তা চ মানিনী গৌরবান্বিতা।
বামার্দ্ধাঙ্গস্বরূপা চ গুণেন তেজসা ময়া॥
পরাবরা সর্ব্ববিব্রতা পরমাদ্যা সনাতনী॥
পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা॥
রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা॥
রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসবাসনিবাসিনী।
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা॥
পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী।
নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী॥
নিরীহা নিরহঙ্কারা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
বেদানুসারধ্যানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ষণৈঃ॥
দৃষ্টিদৃষ্টা ন সর্ব্বেশৈঃ সুরেন্দ্রৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নালঙ্কারভূষিতা॥
কোটিচন্দ্রপ্রভাযুক্ত-শ্রীযুক্তভক্তবিগ্রহা।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাস্যৈকদাত্রী চ সর্ব্বসম্পদাম্॥
অবতারে চ বারাহে বৃকভানুসুতা চ যা।
যৎপাদপদ্মসংস্পর্শ-পবিত্রা চ বসুন্ধরা॥

ব্রহ্মাদিভিরদৃষ্টা যা সর্ব্বদৃষ্টা চ ভারতে।
স্ত্রীরত্নসারসম্ভূতা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
তথা ঘনে নবঘনে লোলা সৌদামিনী মুনে॥
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি প্রতপ্তং ব্রহ্মণা পুরা।
তৎপাদপদ্মনখরদৃষ্টয়ে চাত্মশুদ্ধয়ে॥
ন চ দৃষ্টঞ্চ স্বপ্নেঽপি প্রত্যক্ষস্যাপি কা কথা।
তেনৈব তপসা দৃষ্টা ভুবি বৃন্দাবনে বনে॥
কথিতা পঞ্চমী দেবী সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা॥
অংশরূপা কলারূপা কলাংশাংশসমুদ্ভবাঃ।
প্রকৃতেঃ প্রতিবিশ্বেষু দেব্যশ্চ সর্ব্বযোষিতঃ॥
পরিপূর্ণতমাঃ পঞ্চবিধা দেব্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যা যা প্রধানাংশরূপা বর্ণয়ামি নিশাময়॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি-খণ্ড। ১—৫৬।

"নারদ বলিলেন—সৃষ্টিকার্য্যে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী. সরস্বতী, সাবিত্রী, এই পঞ্চপ্রকার প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠা সেই প্রকৃতি আবির্ভূতা হইলেন কেন? তাঁহার লক্ষণ কি? এবং কেনই বা পাঁচভাগে বিভক্ত হইলেন? তাঁহাদের সমস্তের চরিত্র, পূজাবিধান, গুণ ও ইচ্ছাবিষয়ীভূত কার্য্য এবং কি জন্য তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাহাই আমাকে সুবিশদরূপে বলুন। নারায়ণ বলিলেন,—বৎস নারদ! প্রকৃতির লক্ষণ কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? তথাপি শিব-মুখে যাহা কিছু শ্রুত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি;—প্র-শব্দে প্রকৃষ্টার্থ

বুঝায় এবং কৃতি শব্দের অর্থ "সৃষ্টি", অতএব সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা, তিনিই প্রকৃতি দেবী, এইরূপ কথিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে প্র-শব্দে প্রকৃষ্ট সত্বগুণ, কৃ-শব্দে রজোগুণ, তি-শব্দে তমোগুণ,—এইরূপ কথিত হইয়াছে,—তাহা হইলে যিনি ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না এবং সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রধানা, তাঁহাকেই প্রকৃতি বলে। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রথম এবং 'কৃতি' শব্দের অর্থ সৃষ্টি—অতএব যিনি সৃষ্টির আদিভূতা, তিনিই প্রকৃতি। প্রধান পুরুষ পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণভাগ পুরুষ ও বামভাগ প্রকৃতিস্বরূপ হইল। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা, মায়াময়ী, নিত্যা এবং সনাতনী,—অনলের দাহিকা শক্তির ন্যায় যে স্থানে আত্মা, প্রকৃতিও সেই স্থানে বিরাজ করেন। হে নারদ! এই জন্যই যোগিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্ত্রী-পুরু-ষের ভেদরূপ স্বীকার করেন না। হে ব্রহ্মন্! যোগিজন সমস্ত জগৎ নিরন্তর ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন, এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে অথবা ভক্তের অনুরোধে সৃষ্টিকার্য্যে পঞ্চভাগে বিভক্তা হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ ও মনুগণ—ইহাঁরা সেই ভক্তানুগ্রহরূপিণী, গণেশজননী, শিবরূপিণী, শিবপত্নী, নারায়ণী, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপিণী, বিষ্ণুমায়া, ব্রহ্মরূপা, সনাতনী, সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গাকে নিরন্তর পূজা করেন। সেই ব্রহ্মরূপিণী দেবী সকল জীবকে ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্ত্তি, যশ, মঙ্গল এই সমস্ত প্রদান করেন। তিনি সুখ, মুক্তি ও হর্ষ প্রদান করিয়া থাকেন এবং শোক, পীড়া, দুঃখ সমস্তই নাশ করেন। তিনি শরণাগত, দুঃখী ও পীড়িতদিগের পরিত্রাণতৎপরা, তেজঃস্বরূপা, এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা;—তিনি সকলের শক্তিস্বরূপা, ঈশ্বরের বিস্তৃত শক্তিরূপা, সিদ্ধির ঈশ্বরী, সিদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিদাতাদিগের ঈশ্বরীস্বরূপা।

তিনি বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ছায়া, তন্দ্রা, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, শান্তি, কান্তি, ভ্রান্তি, চেতনা, তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী, বৃত্তি ও মাতৃ-স্বরূপা। তিনিই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তিস্বরূপা। বেদে কথিত যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইয়াছি, তাহা অতি অল্প,—বস্তুতঃ সেই অনন্তরূপিণীর অনন্ত গুণ আছে। এক্ষণে অপরের কথা শ্রবণ কর।

যিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা, তিনিই পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী। তিনি সমস্ত সম্পত্তিস্বরূপা ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ;—তিনি মনোহারিণী, দান্তা, অত্যন্ত শান্তা, সুশীলা ও সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গলদায়িনী। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষ তাঁহার নাই। তিনি নিরন্তর পতিভক্তে অনু-রক্তা, পতিব্রতা সকলের আদিভূতা, ভগবানের প্রাণতুল্যা প্রেমপাত্রী ও প্রিয়ভাষিণী। তিনি সমস্ত শস্যস্বরূপা, অতএব সকল জীবের জীবনরূপিণী এবং মহালক্ষ্মী। তিনি বৈকুণ্ঠধামে সর্ব্বদা পতিসেবাপরায়ণা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, এবং মর্ত্ত্যবাসী গৃহীদিগের গৃহে গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা। তিনি সমস্ত প্রাণী ও দ্রব্যে মনোহর শোভাস্বরূপা, পুণ্যবান্‌দিগের প্রীতিরূপা ও রাজাদিগের প্রভাস্বরূপা। তিনি বণিক্‌দিগের বাণিজ্যরূপিণী, পাপী-দিগের কলহ উৎপাদনকারিণী। তিনি দয়াময়ী, ভক্তের মাতৃরূপিণী ও ভক্তানুগ্রহে সদয়হৃদয়া। তিনি চঞ্চল ব্যক্তিতে চঞ্চলা, এবং ভক্তের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তও চঞ্চলা। হে মুনে! যে দেবী ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃতবৎ, সেই সর্ব্বপূজ্যা সকলের বন্দনীয়া সর্ব্বসম্মতা বেদোক্তা দ্বিতীয়া শক্তির বিষয় বলিলাম, এক্ষণে অন্য প্রকৃতির বিষয় শ্রবণ কর।

যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, এই সমস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা, তিনিই দেবী সরস্বতী। সদ্ব্যক্তিদিগের কবিতা-রূপিণী এবং সুবুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতিদায়িনী। তিনি নানাপ্রকার সিদ্ধান্তভেদে অন্যের কল্পনা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি

ব্যাখ্যারূপিণী. বোধস্বরূপা, সকল সন্দেহ ভঞ্জনকারিণী ও শক্তিস্বরূপিণী। তিনি এই অখিল জগতে জীবদিগের বিষয়, জ্ঞান ও বাক্যস্বরূপা, তাঁহার করে ব্যাখ্যা-মুদ্রা; তিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী এবং অতি শান্তস্বভাবা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। সেই সুশীলাই হরির প্রিয়তমা পত্নী। তিনি হিম চন্দন, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র কুমুদ ও শ্বেতপদ্মসন্নিভ অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্না; রত্নমালিকা-দ্বারা নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে জপ করেন। তিনি তপঃস্বরূপা, তপস্যার ফলদানকারিণী ও স্বয়ং তপস্বিনী। তিনি সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা অখিলপ্রদানকর্ত্রী এবং সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী। শোভাসম্পন্না জগ-দম্বিকা—তৃতীয়া প্রকৃতি সরস্বতীদেবীর বিষয় আগমানুসারে বলিলাম; অপর প্রকৃতির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ অবগত হও।

চতুর্থ প্রকৃতি সাবিত্রী;—তিনি চারিবেদ, বেদাঙ্গ, ছন্দঃসমূহের মাতৃস্বরূপা। সেই বিচক্ষণা দেবী সন্ধ্যা-বন্দনা ক্রিয়া মন্ত্রের এবং তন্ত্রা-দিরও মাতৃস্বরূপা। তিনি ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্মণত্ব-জাতি-রূপিণী জপ-রূপা এবং তাপসী। তিনি ব্রহ্মতেজোময়ী ও সেই তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে নারদ! যাঁহার পদরজঃস্পর্শে সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়, সেই চতুর্থী দেবী সাবিত্রীর কথা বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে পঞ্চমী প্রকৃতির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পঞ্চবিধ প্রাণ-স্বরূপা, যিনি বিষ্ণুর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী এবং সকলের আদিভূতা, যিনি সমস্ত সৌভাগ্যশালিনী, মানিনী ও গৌরবে পরিপূর্ণা: যিনি গুণ ও তেজোগর্ব্বে বিষ্ণুর বামাঙ্গ স্বরূপা; যিনি পরাৎপরা, সর্ব্বব্রতনিরতা, পরমাদ্যা এবং সনাতনী; যিনি পরম আনন্দরূপিণী, ধন্যা, মান্যা ও পূজনীয়া;—যিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—রাস-মণ্ডলের নিমিত্ত উৎপন্না এবং রাসমণ্ডলদ্বারা ভূষিতা; যিনি রাসের

ঈশ্বরী সুরসিকা ও রাসবাসে নিয়ত অবস্থান করেন; যিনি গোলোক-বাসিনী ও গোপীবেশ ধারণ করিয়াছেন; যিনি পরম আহ্লাদদায়িনী, সন্তোষ ও হর্ষদায়িনী;—যিনি নিগুর্ণা, নিরাকারা, অতএব সর্ব্বত্রই নির্লিপ্তা, অথচ আত্মস্বরূপা; যিনি চেষ্টাশূন্যা, নিরহঙ্কারা এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ শরীর ধারণ করিতেছেন, যাঁহাকে পণ্ডিতগণ বেদানুসারে ধ্যানে জানিতে পারেন; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ সুরেন্দ্র এবং মুনিশ্রেষ্ঠগণেরও দৃষ্টির বিষয় নহেন, তিনি বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানা ও নানাবিধ রত্ন-অলঙ্কারে বিভূষিতা। তিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, মনোহর শোভাযুক্তা, ভক্তানুগ্রহে বিগ্রহধারিণী; ভক্তকে কৃষ্ণদাস্য দানে একমাত্র তিনিই সমর্থা এবং তিনিই নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি বরাহকল্পে বৃষভানুসুতা হইয়াছিলেন, যাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বসুধা নিরন্তর পবিত্রা; যিনি ব্রহ্মাদির দর্শনগোচর নহেন,—অথচ সমস্ত জগতের দৃষ্টিবিষয়; হে মুনে! সেই স্ত্রীরত্নের সারভূতা নবীন জলদজালে চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার পাদপদ্মের নখর দর্শন করিবার জন্য এবং নিজের শুদ্ধতাজন্য ব্রহ্মা ষষ্ঠিসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই,—বৃন্দাবনে লোক সমস্ত নিরন্তর তাঁহাকে দর্শন করিতেছে,—পঞ্চমী প্রকৃতিদেবী রাধার বিষয় তোমাকে বলিলাম।

অখিল জগতে দেবীগণ এবং সমস্ত যোগিগণের মধ্যে কেহ সেই প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্না, কেহ তাঁহার কলা হইতে উৎপন্না, কেহ বা কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্না। মূল সেই পাঁচ প্রকার দেবী পূর্ণ প্রকৃতি।"

তোমাকে প্রধান প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে রাধার কথা শুনাই-

লাম। রাধা এক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থে নাই, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্তির কথা, তাহা বোধ হয় এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ। এবং আরও বুঝিতে পারিয়াছ যে, এখনকার কৃষ্ণ-উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা কেন হইয়াছেন। কেন রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই, কেন বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

যে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি হইতে রাধার অস্তিত্ব উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন বহু উপপুরাণ, বহু তন্ত্র, বহু সংহিতায় রাধা ঠাকুরাণী আসর পাকাইয়া বসিয়া আছেন। যে গ্রন্থগুলিকে ইংরেজগণ, তথা ইংরেজশিক্ষিত পণ্ডিতগণ হিন্দুর মূল গ্রন্থ বলিয়া মান্য করেন, আমি কেবল তাহা হইতেই রাধার অস্তিত্ব প্রদর্শন করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে রাধা নাই।

শিষ্য। রাধা-বিরোধিগণ বলেন,—"সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে, কোথাও নাই। অথচ এখন কৃষ্ণ-উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্ত্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ 'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে? রাধাকে প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাই। উইলসন্ সাহেব বলেন যে, "পুরাণ-

পণের মধ্যে 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত' সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়।" * অতএব জিজ্ঞাস্য, ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে ও মহাভারতে রাধার কোন কথা নাই কেন?

গুরু। 'রাধাকে প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাই',—একথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পাঠ করা হয়, তাহাতেই বোধ হয় প্রথমে ঐ গ্রন্থে রাধার প্রথম দর্শন হয়। নতুবা ঐ কথার অন্য কোন অর্থ ই হয় না। ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, এই দুই-খানি মহাপুরাণ, দেবীভাগবত, নারদপঞ্চরাত্র, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র, নির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুর অতি প্রামাণিক গ্রন্থে রাধার বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ অষ্টাদশপুরাণের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরাণখানি না পড়িয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ আগে পাঠ করিলে রাধার দর্শন তাহাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যাক্, বাজে কথা পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রশ্নের কথা বলিতেছি।

ভাগবতে রাধার নাম আছে। বহ্নিতে যেমন দাহিকা শক্তি, কুসুমে যেমন সৌরভ, শর্করায় যেমন মিষ্টত্ব; তদ্রূপ ভাগবতে রাধা আছেন। গোপীপ্রেম বর্ণনা করাই ভগবানের উদ্দেশ্য—রাধা প্রেম বর্ণনা করা সেরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। জীবের সে ধারণা সহজে হয় না,—বা হওয়া অসম্ভব। গোপীভাব পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত না হইলে রাধাতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। তাই ভাগবতকার গোপীপ্রেম উল্লেখ করিয়াছেন,—কাহারও বড় নাম-গন্ধ করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা সে প্রেমের আস্বাদ অনুভব করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রভুপাদ স্বামী প্রভৃতি টীকাকারগণ সে রসনির্য্যাস করিয়া রাধা-নামের বাদাম তুলিয়া দিয়াছেন। প্রাণহীন ও প্রেমহীন আমরা সেই টীকাকারগণের ভুল ধরিয়া, আবার তাঁহাদিগেরই নামে

* বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র, ১৬৫—৬৬ পৃঃ।

কলঙ্কারোপ করি ;—হায় কলি! শ্রীধরস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের বিদ্যার তুলনা! বিদ্যা কেবল গ্রন্থ অধ্যয়নে হয় না—বিদ্যা হয় সাধনায়। সাধনবলহীন কামকলুষিত জীবের বিদ্যা কেবল পাখীর হরিনাম শিক্ষা।

কুসুমের সৌরভ সুরাসারে মাখাইয়া কৃতিগণ যেমন এসেন্‌স্‌ প্রস্তুত করত সদ্যপ্রস্ফুট কুসুমগন্ধ রক্ষা করেন—স্বামী প্রমুখ টীকাকারগণ তেমনি গোপীপ্রেম হইতে রাধাপ্রেম ভক্তির সঙ্গে মাখাইয়া বাহির করিয়াছেন। ভাগবতের টীকা পাঠ করিলে ভাগবতে রাধা আছেন কি না, দেখিতে পাইবে। শর্করা হইতে মিষ্টত্ব যিনি পৃথক্‌ করিতে পারেন, তিনিই করেন—তুমি আমি সে কার্য্যে অপারগ। তাই বলিয়া তুমি আমি একজন হইয়া, এক কথায় সব উড়াইয়া দিব কেন?

শিষ্য। হাঁ, ভাগবতের টীকাকারগণ রাধার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে সে সকল কথা নাই।

গুরু। মহাভারতে সে কথা থাকিবার কোন আবশ্যকও দেখা যায় না।

শিষ্য। কেন?

গুরু। মহাভারতকার কৃষ্ণজীবনী লেখেন নাই। প্রসঙ্গত কৃষ্ণকথার উল্লেখ করিয়াছেন। উহা কুরু-পাণ্ডবের জীবনী—কুরু-পাণ্ডবের সঙ্গে যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে কৃষ্ণকথা আছে—কৃষ্ণের বাল্যজীবনী ধারাবাহিক রূপে উহাতে লিখিত হয় নাই।

শিষ্য। মহাভারতের সভাপর্ব্বে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে যতদূর সম্ভব তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধীয় দোষ উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক গালাগালি দিয়াছিল,—কিন্তু ইহাতে একবারও রাধা সম্বন্ধে কোন কথা নাই। যদি রাধা সম্পর্কীয় অতবড় একটা দোষ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে থাকিত, তবে শিশুপাল নিশ্চয়ই সে কথার উল্লেখ করিতেন। আপনি বলিতে পারেন, পুরুষ-প্রকৃতির লীলা

দোষের নহে। কিন্তু শিশুপাল সে কথা মানিত না,—কৃষ্ণকে আদৌ লোকাতীত বলিয়া স্বীকার করিত না। ভীষ্ম মানিতেন, ভীষ্ম পুরুষ-প্রকৃতির লীলা বলিয়া তাহাতে দোষ না দেখিতে পারেন। কিন্তু শিশু-পাল কৃষ্ণকে মানুষ বলিয়াই জানিতেন, আর মানবের সেরূপ পার-দারিক দোষ থাকিলে, সেই বিরাট সভার মধ্যে অবশ্যই তিনি অন্যান্য দোষের সঙ্গে সে দোষেরও উল্লেখ না করিয়া ছাড়িতেন না।

গুরু। যাঁহারা কৃষ্ণকে মানুষ বলিয়া জানেন,—তাঁহারা কৃষ্ণের আনন্দময় ভাব ধারণা করিতে পারেন না। যাঁহারা কৃষ্ণকে মানুষ বলিয়া ভাবেন, তাঁহারা হ্লাদিনী-শক্তি রাধার ধারণা মাত্রও করিতে পারেন না। মানুষ, নিত্য নিত্য জীবগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও আপনার চিরজীবিত্ব কল্পনা করে—অন্ততঃ দৃঢ় ধারণা করিয়া জীবিত কালে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না—তাহার কারণ মায়া। মায়া জীবদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া ভুলাইতেছেন। সেইরূপ যোগ-মায়া রাধা-কৃষ্ণ-লীলাকে ইতর জনের ধারণা হইতে দূরে রাখিয়াছেন। সাধনাদ্বারা যোগমায়ার কৃপা লাভ করিতে পারিলে, তখন রাধা বুঝিতে পারা যায়,—কৃষ্ণ অবগত হওয়া যায়,—রাধা-কৃষ্ণের লীলা জানিতে পারা যায়। শিশুপালাদি যোগমায়াবৃত; রাধা-কৃষ্ণলীলা-সংবাদ জানিতে পারে নাই; কাজেই সে কথার উত্তর করিবে কি প্রকারে। শুক্তি-আবৃত মুক্তার সন্ধান কয় জনে পায়? যোগমায়া দ্বারা রাধাকৃষ্ণ-লীলা কিরূপে সমাচ্ছন্ন, তাহা পরে বলিতেছি।

শিষ্য। বিষ্ণুপুরাণে রাধার কথা নাই কেন?

গুরু। পুরাণ মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রস্তাব লইয়া লিখিত। তবে প্রসঙ্গাধীন এক বিষয় একেতর পুরাণে উল্লিখিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ সাধারণতঃ বিষয় লইয়া, বিষ্ণুশক্তি—লক্ষ্মী—বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ

তাহাতে আছে। মূলপ্রকৃতি রাধার কথা তাহাতে থাকিবার কোন কারণ নাই।

শিষ্য। হরিবংশে ? হরিবংশে কৃষ্ণের অন্যান্য সমস্ত লীলার কথাই আছে,—রাসলীলাও উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু রাধার নাম-গন্ধও তাহাতে নাই।

গুরু। হরিবংশের প্রধান উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের বংশবর্ণনা। অন্যান্য অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায়—কেবল সংক্ষেপে বর্ণনা করা। রাধা ভাগবতের ন্যায় লুক্কায়িত—কিন্তু ভক্তের চক্ষে নহে। যেখানে রাস আছে, সেইখানেই রাসেশ্বরী রাধা আছেন। হিন্দুর পুরাণে, তন্ত্রে, মন্ত্রে, রাধা-নাম বিজড়িত—হিন্দু, যাত্রার দলে রাধার দর্শন পায় নাই, হিন্দু, উইলসন সাহেবের নিকট রাধামন্ত্র পায় নাই। হিন্দু, জয়দেব কবির নিকট প্রথমে রাধার লীলাকথা শোনে নাই। যাঁহারা তাহা বলেন,—তাঁহারা হয় শাস্ত্রপাঠ না করিয়াই, কোনও শাস্ত্রে নাই বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন, আর নয়ত নিজমত প্রচার জন্য সত্য গোপন করিয়াছেন। কিন্তু সত্য চিরস্বপ্রকাশিত, ইহা ভাবিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধ।

শিষ্য। রাধা-কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ কি,তাহা আমাকে উপদেশ করুন।

গুরু। সে কথা অনেকবার বলিয়াছি, প্রসঙ্গত আবারও বলিতে হইবে। এক্ষণে সংক্ষেপত বলিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম ঈশ্বর; শ্রীরাধিকা পূর্ণতমা প্রকৃতি। তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধ—শক্তি ও শক্তিমান্।

শাস্ত্রে সে কথা অতি পরিষ্কাররূপেই বলা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধাকে এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই :—

ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধা প্রেয়সী প্রেয়সী পরা।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধ্রুবম্ ॥
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্ ॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ নহি শক্তঃ কদাচন ॥
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোঽহমচ্যুতঃ ॥
আগচ্ছ শয়নং সাধ্বি কুরু বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্।
ত্বং মে শোভাস্বরূপাসি দেহস্য ভূষণং যথা ॥
কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্ ॥
ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সম্পত্তিস্ত্বমাধারস্বরূপিণী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপি চ ॥
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্ব্বস্বরূপাসি সর্ব্বরূপোঽহমক্ষয়ে ॥
যদা তেজঃস্বরূপোঽহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী ॥

সর্ব্ববীজস্বরূপোঽহং যদা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিণী॥
মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
শক্ত্যা বুদ্ধ্যা চ জ্ঞানেন মম তুল্যা চ তেজসা॥
আবয়োর্ভেদবুদ্ধিন্তু যঃ করোতি নরাধমঃ।
তস্য বাসঃ কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত পুরুষান্ পাতয়ত্যধঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্॥
অজ্ঞানাদাবয়োর্নিন্দাং যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
পচ্যন্তে নরকে তাবদ্‌যাবদ্‌ বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্॥
রা-শব্দং কুর্ব্বতস্ত্রস্তো দদামি ভক্তিমুত্তমাম্।
ধা-শব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাৎ যামি শ্রবণলোভতঃ॥
যে সেবন্তে চ দত্ত্বা মামুপচারাণি ষোড়শ।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং নিত্যং ভক্ত্যা সুসংযুতাঃ॥
যা প্রীতিৰ্জায়তে তত্র রাধাশব্দাৎ ততোঽধিকঃ।
তে প্রিয়া মে যথা-রাধে রাধাবক্তা ততোঽধিকঃ॥
ব্রহ্মানন্তঃ শিবো ধর্ম্মো নরনারায়ণাবৃষী।
কপিলশ্চ গণেশশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ মৎপ্রিয়ঃ॥
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী প্রকৃতিস্তথা।
মম প্রিয়াশ্চ দেব্যশ্চ তাস্তথাপি ন তে সমাঃ॥

তে সর্ব্বে প্রাণতুল্যা মে ত্বং মে প্রাণাধিকা সতি।
ভিন্নস্থানে স্থিতাস্তে চ ত্বঞ্চ বক্ষঃস্থলস্থিতা ॥
যো মে চতুর্ভুজো মূর্ত্তির্বিভর্ত্তি বক্ষসি শ্রিয়ম্ ॥
যোঽহং কৃষ্ণস্বরূপস্ত্বাং বিভর্ম্মি হৃদয়ে সদা ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"তুমি আমার প্রাণাধিকা মঙ্গলদায়িনী প্রেয়সী রাধিকা। যে তুমি, সেই আমি;—আমাদের কোনও ভেদ নাই। যেরূপ দুগ্ধে ধবলতা, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ প্রভৃতি নিয়ত অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও তোমাতে নিয়ত অবস্থান করি। যেরূপ কুলাল মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে না, স্বর্ণকার কদাচও স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির আধার স্বরূপা। আমি বীজ স্বরূপ। হে সাধ্বি! এক্ষণে তুমি আসিয়া আমার উজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে তোমার শয়ন-স্থান কর। ভূষণ যেরূপ দেহের শোভা সম্পাদন করে, সেই-রূপ তুমিও আমার দেহের শোভা-সম্পাদিকা। যে সময়ে তোমা হইতে বিযুক্ত থাকি, তখন লোকসকল আমাকে মাত্র কৃষ্ণ বলে; আর যখন তোমার সহিত অবস্থান করি, তখন আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমিই জগতের আধাররূপা এবং তুমি আমার ও সকলের সমস্ত শক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমিই পুরুষ—ইহা বেদে নির্ণীত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ;—যখন আমি তেজোরূপ, তুমি তখন তেজোরূপিণী। হে সুন্দরি! যে সময়ে আমি যোগে সর্ব্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমিও সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ও সকল স্ত্রীরূপধারিণী হইয়া থাক। তুমি আমার অর্দ্ধাংশসম্ভূতা মূল প্রকৃতি। তুমি শক্তি, বুদ্ধি,

জ্ঞান ও তেজে আমার তুল্যা। যে নরাধমেরা আমাদের উভয়ে পৃথক্‌-বুদ্ধি হয়, সেই পাপিগণ চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নামক নরকে বাস করে, এবং তাহার ঊর্দ্ধ সপ্ত পুরুষ ও পরবর্ত্তী সপ্ত পুরুষ অধোগামী হয় ও তাহার কোটী জন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। যদি অজ্ঞান বশতঃ কোন নরাধম আমাদের নিন্দা করে, সেই পাপাত্মা শত ব্রহ্মার বয়ঃকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করে। যে ব্যক্তি রা-মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে, আমি ব্যগ্রচিত্তে তাহাকে উত্তম ভক্তি প্রদান করি, এবং পরে সেই ব্যক্তি ধা-শব্দ উচ্চারণ করিবে, আমি তাহা শ্রবণ করিতে পাইব, এই লালসায় তাহার সমীপে গমন করিয়া থাকি। যাহারা ষোড়শোপচার প্রদান করত আমার সেবা করে, তাহারা যাবজ্জীবন নিত্য ভক্তিযুক্ত হয়। তাহাতে আমার যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, রাধা-শব্দ উচ্চারণে তাহা হইতে অধিক প্রীত হই। হে রাধে! আমার ষোড়শো-পচারপূজানিরত ব্যক্তিগণ যেরূপ আমার প্রিয়, তাহা অপেক্ষা রাধানাম যাহারা সতত উচ্চারণ করে, তাহারাই অধিক প্রিয়। ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, কপিল, গণেশ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি সকলেই আমার প্রিয়, এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী—ইহারা ও প্রকৃতি দেবী আমার প্রিয়, কিন্তু তোমার সমান প্রিয় কেহই নহেন। হে সতি! তাঁহারা আমার প্রাণতুল্য, আর তুমি প্রাণাধিকা। তাঁহারা ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন, তুমি আমার বক্ষঃস্থলে নিয়ত বাস কর। আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও শ্রীরূপিণী তোমাকে নিয়ত বক্ষে ধারণ করিতেছে। এবং আমিও তোমাকে নিয়ত বক্ষে ধারণ করিতেছি।"

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম, বহ্নির দাহিকা শক্তি, দুগ্ধের ধবলতার ন্যায় রাধা-কৃষ্ণ অবিচ্ছেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কিন্তু আমি ইহার অতীত আরও কিছু শুনিতে চাই।

গুরু। তাহা কি?

শিষ্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রকৃত সম্বন্ধ।

গুরু। তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।

শিষ্য। হাঁ, কথাটা আমি ভাল করিয়া বলিতে পারিলাম না।

গুরু। যাহা বলিতে পারিতেছ না, তাহা বলিতে পারিবে না। সে তত্ত্বের রসাস্বাদন ব্যতিরেকে সে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম হইবে না। 'বলি বলি' বলা হইবে না। আমি তাহা বলিতেছি, শোনঃ—

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাধাকৃষ্ণ প্রকৃতি-পুরুষ। কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষ বলিলে তোমরা যে ধারণা কর বা এখনকার ইংরেজী-শিক্ষিতগণ প্রকৃতি-পুরুষের যে অর্থ করেন,—তাহা নহে। তাহা হইতে কছু বিভিন্ন। সে কথা তোমাকে পরে বলিব। মোটামুটি এখন ইহাই বলা যায় যে, যিনি পরমব্রহ্ম প্রকৃতির গুণাবলম্বীবৎ হইয়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকারী ও বিবিধ অবতারবিশিষ্ট, তিনিই পুরুষ। এই পুরুষ জীবহৃদয়ের অধিষ্ঠাতা। তাই শ্রীকৃষ্ণ মানব—কিন্তু তথাপি তিনি ঈশ্বর। তাঁহার স্বরূপ পূর্ণ প্রজ্বলিত বহ্নি, আর জীবের স্বরূপ স্ফুলিঙ্গের কণা। জীবতত্ত্ব শক্তি, আর কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।

এখন ভগবানের কথা শোন। তিনি বলিতেছেন :—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মামিকাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : ৭৫।

"পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি অপরা বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো! এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন জীবরূপী পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও।"

এই পরা প্রকৃতি বিদিত হইলে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ— রাধা ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থির হইবে।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণ ; ৬।৭।৬১।

বিষ্ণুশক্তি ত্রিবিধ ;—পরা ক্ষেত্রজ্ঞা, অপরা অবিদ্যা এবং তৃতীয়া কর্ম্মাখ্যা। ইহাদিগের অপর নাম—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি ও তটস্থা জীবশক্তি।

ঈশ্বর ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন—তথাপি কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ঐশ্বর্য্য-মায়াগন্ধ পরিশূন্য। এখন কৃষ্ণকে নির্ব্বিশেষ ও পূর্ণেশ্বর বলিয়া মান্য করিব, অথচ তাঁহার চিচ্ছক্তি মান্য করিব না,—ইহা হইতে পারে না—তাহা হইলে পূর্ণতার হানি হয়। ঈশ্বর প্রাপ্তির হেতু যে উপায়, তাহার সহায় শ্রবণাদি ভক্তি। * পণ্ডিতগণ ইহাকে অবিধেয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। সাধন ভক্তিতে প্রেমের উদ্গম হয়। অতএব ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি রাধা—তাই—"রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা চ পরাত্মনা।" তাই ভক্তগণ প্রেমকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—তাই প্রেমে মাধুর্য্যরস আস্বাদন হয়।

গোপী-প্রেম-তত্ত্বে এ সকল কথা আরও পরিস্ফুট হইবে এবং রাসের কথা বলিবার আগে আর একবার রাসেশ্বরীর কথা আলোচনা করিতে হইবে। সুতরাং এখন এসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত থাকিল।

---

* শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন,—ভক্তি এই নয় প্রকার। পাদসেবন—পরিচর্য্যা। দাস্য—কর্ম্মার্পণ। সখ্য—বিশ্বাস। আত্মনিবেদন—দেহ সমর্পণ। তবে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভক্তির নাম সাধনভক্তি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বলিতেছিলেন,—যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, তারপরে শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন-কথা বলিয়াছেন,—তদনন্তর কি ঘটিয়াছিল?

গুরু। যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি তন্মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তোমাকে বলিতেছি।

শিষ্য। হাঁ, তাহাই বলুন।

গুরু। নন্দ প্রভৃতি গোপগণ গোকুলে বহু বহু উৎপাত অনুভব করিয়া একদা সকলে মিলিত হইলেন এবং গোকুলের ও গোকুলবাসিগণের হিতার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে উপানন্দ নামক গোপ জ্ঞান ও বয়সে বৃদ্ধ এবং দেশ কাল ও অর্থের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলিলেন,—যদি গোকুলের হিত করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাদের এ স্থান হইতে উঠিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কারণ এখানে নিরন্তর ব্রজবাসীদিগের বিনাশ হেতু বিবিধ প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। বালঘাতিনী পূতনা, চক্রবায়ু প্রভৃতি যে সকল দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছিল, ভগবানের কৃপায় কেবল নন্দের বালক রক্ষা পাইয়াছে। আরও নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে। যদি এইরূপ উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার ইচ্ছা হয়,—তবে এস্থান ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করা শ্রেয়ঃ। বৃন্দাবন পশুসকলের হিতের স্থান,—তন্মধ্যে ভূরি ভূরি অবান্তর নবীন বন এবং পবিত্র পর্ব্বতসকল ও প্রচুর তৃণলতা আছে।

উপানন্দের পরামর্শ সকলেই গ্রহণ করিলেন এবং সেই দিবসেই গোকুল ছাড়িয়া গো-পাল ও স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বৃন্দাবনে বাসার্থ গমন করিবার বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। ক্রমে গোকুল জনশূন্য হইল এবং বৃন্দাবনে গোপগণ নব বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বসতি আরম্ভ করিল।

বৃন্দাবনে কংস-ভীতি ছিল না, কারণ তাহা কংসের সীমানার বহির্ভূত—বন, ক্রম ও পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত। সেখানে রাজা প্রজায় বৈষম্য ছিল না,—সকলেই সমান। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রথম বীজ-পত্তন বৃন্দাবনে হইল। এখানে বর্ণভেদ ছিল না—সকলেই একজাতি। সকলেই সকলের মিত্র, বান্ধব ও আত্মীয়। পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে বিজড়িত। সেখানে সহজ প্রেম, সহজ ভাব, সহজ কার্য্য—শাস্ত্রের আড়ম্বর, সমাজের ঝঞ্ঝা, রাজ-বিধান কিছুই ছিল না। বনের শ্যামলতা, বনকুসুমের সৌরভ, বন-পাখীর মধুর সঙ্গীত, যমুনার স্বচ্ছ জলের কুলু কুলু ধ্বনি—আর ছিল, শ্যামের বাঁশীর কল-নাদ। এ কল-নাদ জগতে ব্যাপ্ত। যাহার কাণ আছে, সে শুনিতে পায়। এই কল-নাদে নৃত্যশীলা মহামায়া প্রকৃতি নাচিতেছে—এই কল-নাদে ভক্তের প্রাণ উধাও ধাইতেছে। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

> শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
> মধুর মধুর বংশী বাজে সেই বৃন্দাবন॥

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সেই ধর্ম্মসংস্থাপনের এই প্রথম পত্তন। সহজের এই প্রথম বীজবপন।

সুস্নিগ্ধ-সৌরভাক্রান্ত-মুগ্ধীকৃতজগত্রয়ম্।
মন্দমারুত-সংসিক্ত-বসন্ত-ঋতুসেবিতম্ ॥
পূর্ণেন্দুনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্ ॥
অদুঃখসুখবিচ্ছেদং জরামরণবর্জ্জিতম্ ॥
অক্রোধগত-মাৎসর্য্যং অভিন্নমনহঙ্কৃতম্।
পূর্ণানন্দামৃতরসং পূর্ণপ্রেমসুখাবহম্।
গুণাতীতং পরং ধাম পূর্ণং প্রেমস্বরূপকম্ ॥

পদ্মপুরাণ।

"বৃন্দাবন সুস্নিগ্ধ সৌরভাক্রান্ত ও ত্রিভুবন-মোহনকারী। তথায় মন্দ পবন ও বসন্ত ঋতু চিরবিরাজিত। পূর্ণ শশধর নিয়ত শীতল রশ্মি বিতরণ করিতেছেন। ভগবান্ অংশুমালীও সেখানে মন্দাংশু। সেখানে দুঃখ নাই। সুখের বিচ্ছেদ নাই। জরা নাই, মরণ নাই. ক্রোধ নাই, মাৎসর্য্য নাই। ভেদজ্ঞান নাই, অহঙ্কার নাই। সেখানে পূর্ণানন্দ, অমৃতরস, সুখাবহ পূর্ণপ্রেম। গুণাতীত সেই পরমধাম পূর্ণ প্রেমস্বরূপ।

যো নন্দঃ পরমানন্দো যশোদা মুক্তিগেহিনী।

কৃষ্ণোপনিষৎ।

বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ জন নন্দ বা পরমানন্দ, আর মুক্তিগেহিনী যশোদা।

শিষ্য। বৃন্দাবনের এখনও কি সেই ভাব, আর সেই তত্ত্ব আছে? ইহা কি প্রাকৃত বৃন্দাবনের বর্ণনা?

গুরু। যেমন তোমার দেহ প্রাকৃত হইলে উহার মধ্যে নিত্য আত্মা বিদ্যমান,—তদ্রূপ প্রাকৃত বৃন্দাবনের মধ্যে নিত্য বৃন্দাবন বিরাজিত। যোগিজন যেমন জড়দেহ বিশ্লেষণে চৈতন্য পৃথক্ করিতে সক্ষম, রসিক-

জনও তদ্রূপ প্রাকৃত বৃন্দাবনে এখনও নিত্য বৃন্দাবনের সন্ধান প্রাপ্ত হন। এখনও সেই নিত্য বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলা হইতেছে। সেই নিত্য বৃন্দাবনের আবরণ আমাদের বৃন্দাবন। আমাদের কাম-কলুষিত ভাবে, আমাদের অবিশুদ্ধ দৃষ্টিতে, আমাদের ভেদজ্ঞানের অন্ধকারে নিত্যবৃন্দাবন অদর্শনীয় হয়। বিশুদ্ধ ব্রজভাব উদয় হইলে জীব সেই পরমধাম বৃন্দাবন দর্শন করিতে পারে। ইহা সাধনার ফল—সে সাধনার উপায় স্বতন্ত্র স্থলে বক্তব্য। তবে ব্রজভাবে ভক্তি ও প্রেম। পথ বড় সহজ। সহজ ভক্তি, সহজ প্রেম। সহজ সাধনা। সেখানকার সবই সহজ। বৃন্দাবনের ভাবও সহজ। বৃন্দাবনে পূর্ণরস, আর পূর্ণ আনন্দ নিত্য বিরাজিত।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্॥

পদ্মপুরাণ।

শ্রীবৃন্দাবন রম্য স্থান। সেখানে পূর্ণানন্দ ও পূর্ণ রস। ভূমি চিন্তামণি সদৃশ। জল অমৃত-রসপূরিত।

রাধা-ষোড়শ-নামাচ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যা রম্যং বনং গোপ্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥
অক্ষয়ং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
গোবিন্দ-দেহতোঽভিন্নং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্॥

পদ্মপুরাণ।

শ্রীরাধার ষোড়শ নামের মধ্যে এক নাম বৃন্দা। বৃন্দাবন তাঁহার অতি রমণীয় গোপ্য স্থান। সে স্থানে জরা নাই, মরণ নাই, শোক-দুঃখ কিছুই নাই। সেখানে নিত্য আনন্দ। বৃন্দাবন গোবিন্দের নিত্য অব্যয় স্থান।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবন তাহার আদর্শ স্থান সংস্থিত হইল। বৃন্দাবনে যাহারা অবস্থিত হইল, তাহারা তাঁহার নিজজন। এই নিজজনগণ দ্বারা আগে সেই ধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপন হইবে,—তারপরে বিশ্ববাসী সে ধর্ম্মের শীতল সুধা পান করিবে। আর ভগবান্ সেই ধর্ম্মের প্রচারার্থ যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিবেন। নিজজন ঘরে ধর্ম্মাচরণ না করিলে অন্য লোকে তাহার আদর্শ পাইবে কোথায়? ব্রজবাসী সব তাঁহার গোকুলের জন। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তাহাদিগকে লইয়া ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কামকলুষিত মর্ত্ত্যের জীব তাঁহার ধর্ম্মসংস্থাপনে সহায়তা করিবে কি প্রকারে? আবার আদর্শ না হইলে জীব ধর্ম্ম বুঝিবে কি প্রকারে? অনুষ্ঠানরত হইবে কি প্রকারে? তাই নিজজনের দ্বারা, এবং নিজে আবির্ভূত হইয়া এই বৃন্দাবনলীলা অনুষ্ঠান।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এই শ্রেষ্ঠ—কামনাশূন্য, জনশূন্য, জড় বন্ধনশূন্য তাঁহার নিজজন, আর পূর্ণতম সেই ভগবান্। ইতর জীবের জন্য তাঁহারা বৃন্দাবনলীলা করিয়া প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছেন। সেই আদর্শে আচরণ করিলে জীব পূর্ণ আনন্দ এবং পূর্ণ রস প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ইহাই ব্রজলীলার উদ্দেশ্য—ইহাই রসের কার্য্য। তারপরে মাথুর লীলাদি ঐশ্বর্য্যভাবে সেই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য পথ-বিযুক্তি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর বধ।

গুরু। এখন তোমাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৌমার লীলা বিষয়ক কয়েকটি প্রধান ঘটনার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাম-কৃষ্ণ কৌমার কালে অন্যান্য বালকগণের সহিত ব্রজভূমির অদূরে বৎসচারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোথাও বেণু বাজাইয়া বেড়ান; কোথাও বিল্ব ও আমলক ফলাদি দ্বারা লাটিম কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা খেলা করেন; কোথাও নূপুর-কিঙ্কিণীযুক্ত চরণের আঘাত করিয়া ঝুণুঝুণু শব্দ শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করেন; কোথাও বনফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া, আবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রীড়া করেন; কোথাও বা বৎসদিগের গাত্রে কম্বলাদি বন্ধনপূর্ব্বক কৃত্রিম গোবৃষ করিয়া আপনারাও বৃষের ন্যায় ব্যবহার করেন—অর্থাৎ তদনুকারী শব্দ করিতে করিতে পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হন। কখন কখন শব্দ দ্বারা হংসময়ূরাদি জন্তুর অনুকরণ করত প্রাকৃত বালকের তুল্য বেড়াইয়া বেড়ান।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত যমুনাপুলিনে বৎস চরাইতেছিলেন। সেই সময় একটা দৈত্য বৎসের আকার ধারণ করিয়া তাঁহাদের পালিত বৎসগণের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুতে তাহা লুকাইল না। তিনি বলরামকে ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে দেখাইলেন, এবং ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গমন করিলেন। সমীপে উপস্থিত হইয়াই বৎসরূপী সেই অসুরের পশ্চাদ্ভাগের দুইটা পায়ের সহিত লাঙ্গূল ধরিয়া কিয়ংক্ষণ ঘুরাইয়া তাহার জীবন নাশ করিলেন এবং সেই গতজীবন অসুরের দেহ একটা কপিত্থ বৃক্ষের উপর

ফেলিয়া দিলেন। অসুরের ভীষণ দেহ-ভারে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। মৃত অসুরের দেহ দর্শন করিয়া বালকদিগের বিস্ময় জন্মিল। আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে করিতে সকলেই সাধুবাদ করিতে লাগিল এবং দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে পুষ্পবর্ষণ করিলেন।

এমন একটা দৈত্য-বধে কি কার্য্য হইল, যাহাতে স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন? একটা অসুর বৎসরূপ ধরিয়া ব্রজের বৎসপালমধ্যে মিশিয়াছিল, কৃষ্ণ তাহাকে ধ্বংস করিলেন।

কথা এই যে—অসুর—পাপে—সুর পুণ্যে। জীবের মনোবৃত্তি অত্যন্ত চঞ্চল। পরের ভাল দেখা জীবের সাধ্যাতীত। পরনিন্দা, পরকুৎসায় সর্ব্বদাই আমাদের রসনা কলুষিত। কিন্তু ভগবানের ধর্ম্মরাজ্যে তাহা থাকিলে তাঁহার মত হওয়া যায় না। পূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে হইলে, পূর্ণতমের স্বভাব চাই। বদ্‌ধাতু হইতে বৎস-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বদ্‌ধাতুর অর্থ প্রকাশ—যাহারা নিন্দুক, তাহারা বৎস। ধর্ম্মরাজ্যের সেই নিন্দুকরূপী বৎসাসুর বিনষ্ট হইল, তাই সুরগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি বলিতে চাহেন, পুরাণের ইহা রূপক বর্ণনা?

গুরু। নিশ্চয়ই নহে। যাহা সূক্ষ্ম, সময়ে তাহাই স্থূল। তুমি আমি যখন সূক্ষ্ম, তখন আমরা রূপক। সূক্ষ্মই স্থূল হয়। অসুর যখন সূক্ষ্ম ছিল, তখন বালকেরা—ভক্তজনেরা চিনিতে পারে নাই। তাই স্থূলাকারে তাহার দেহ দেখাইয়া দিলেন। তাই বালকেরা ধন্য।

শিষ্য। বকাসুর-বধোপাখ্যান বলুন।

গুরু। আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত বৎস চরাইতে চরাইতে বৎসগণকে জলপান করাইবার জন্য জলাশয়সমীপে গমন করিলেন। সেখানে এক বিরাটকায় বকপক্ষী দেখিতে পাইয়া বালকগণ ভীত হইল।

সে একটা মহান্ অসুর,বকরূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবা মাত্র অত্যন্ত বেগে আসিয়া একেবারে গ্রাস করিল। তাহার তুণ্ড অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং সে স্বয়ং অতিশয় বলিষ্ঠ ছিল।

বলরাম প্রভৃতি বালকগণ কৃষ্ণকে মহাবকের মুখগ্রস্ত হইতে দেখিয়া যদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ প্রাণ বিনা বিচেতন হয়, ভয়ে সেইরূপ অচেতন হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই বকের বদনমধ্যস্থ হইয়া অগ্নির ন্যায় তাহার তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সে বমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বাহির করিয়া ফেলিল এবং তুণ্ডাঘাত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিতে উদ্যত হইল। কংসপ্রেরিত ঐ বককে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার দুই বাহু দ্বারা তাহার তুণ্ডদ্বয় ধারণ করিলেন, এবং দর্শনকারী বালকগণের বীরণবৎ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণের পরম হর্ষ হইল। দেবগণ নন্দনকানন-সঞ্জাত কুসুম বকারি ভগবানের উপর বর্ষণ ও শঙ্খ-দুন্দুভিধ্বনি ও স্তব করিতে লাগিলেন। এই সকল অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারী বালকগণ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিল।

বন্‌ক্ ধাতু হইতে বক শব্দ নিষ্পন্ন। বন্‌ক্ ধাতুর অর্থ কৌটিল্য। মর্ত্ত্যধামে কে আছে, যাহার মনোমধ্যে কৌটিল্যপাতক সঞ্জাত না হয়? কাহার মনোমধ্যে অভিমান, ঈর্ষা ও ভাণের ভাব আবির্ভূত না হয়? ধর্ম্মভাণ, বিদ্যাভাণ, রূপের ভাণ—ভাণ নাই কোথায়? কিন্তু ব্রজ-ভাবে ভাণ, কৌটিল্য, ঈর্ষা কিছুই আসিবে না। ভগবানের ধর্ম্মস্থাপনের ভিত্তিভূমি বৃন্দাবনে—তাঁহার নিজজনের জন্য এ অসুর থাকিতে পারিবে না। তাঁহার ধর্ম্ম-ভাণাদি থাকিলে পূর্ণ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা হইবে না। তাই ভগবান্ বকাসুরের আক্রমণ হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিলেন। হৃদয় বৃন্দাবন করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এমনি বকাসুর সকলকেই বধ করিতে হয়। কিন্তু ভগবান্ ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই,

সে অসুর সংহার করে। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেই তিনি আবির্ভূত হইয়া অসুর নাশ করেন।

শিষ্য। অতঃপর অঘাসুর বধ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বলিতেছি।

অপর এক দিবস বয়স্যগণসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাননমধ্যে বৎস চরাইতে ছিলেন, এমন সময় অঘ নামক এক ভয়ঙ্কর অসুর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল। ঐ দানব অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত—দেবরাজ অমৃতপানে অমর হইয়াও তাহার ভয় করিতেন। অঘাসুর গোপবালকগণকে দেখিয়া তাহাদিগের সংহার বাসনায় বিরাট অজগরদেহ ধারণ করিয়া পথিমধ্যে মুখব্যাদান করিয়া পড়িয়া থাকিল। তাহার বিশাল দেহে পর্ব্বত-গুহাতুল্য আনন প্রসারিত রহিল।

গোপবালক তথায় উপস্থিত হইল। সকল বালকই উহাকে অজগর বলিয়া চিনিতে পারিল,—কিন্তু অভয়দাতার নামে তখন তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে—কাজেই তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে। তাহারা ভাবিল, এ কি আমাদিগকে গ্রাস করিবে? আমরাত বিনষ্ট হই না। এ যদি আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়, বকাসুরের ন্যায় অসুরহন্তা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ক্ষণকাল মধ্যে আপনিই বিনষ্ট হইবে। ইহা বলিয়া বকারি ভগবান্ হরির কমনীয় বদন অবলোকন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া সকলেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভক্তের ভগবান্ তাহা দেখিয়া আপনিও সেই অঘাসুরের বদনমধ্যে প্রবেশ করিলেন;—এবং বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার দেহ বিভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অঘাসুর নিপতিত হইল।

অঘ ধাতুর অর্থ পাপ। বৎসাসুর, বকাসুর প্রভৃতি ইহজন্মের পাতক নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু আরও কত পাতক সূক্ষ্মরূপে আছে। সে

সকল বিনাশ করিতে কাহার সাধ্য? সেই সকল পাতকেইত দুঃখের হাতে জীবকে ফেলিয়া দেয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন :—

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।

ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দুই প্রকার। এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়। অপর অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীরদ্বারা কৃত এবং জন্মান্তরীয় শরীরদ্বারা কৃত।

ক্লেশই কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। ক্লেশ নামক অজ্ঞান—অহন্তা, মমতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি বৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। সে সকল হইতে নিষ্কর্ম্ম হইতে পারে, সমাহিত হইতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিলেই তাহার ফলভাগী হইতে হইবে। তাই পতঞ্জলি প্রভৃতি দর্শনকারগণ বলেন,—জীব ক্লেশের বাধ্য হইয়াই ভালমন্দ কার্য্য করে এবং সেই সকল কার্য্য আবার নূতন ক্লেশের বা নূতন কর্ম্মমূলের সৃষ্টি করে। কৃতকর্ম্মের অনুভব দ্বারা যে চিত্তক্ষেত্রস্থ সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ইচ্ছা প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ হয় বা নূতন নূতন রাগ-দ্বেষাদিরূপ কর্ম্মবীজ জন্মে, সে সকলকে যোগিগণ কর্ম্মাশয় বলেন। যাজ্ঞিকেরা তাহাকে অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট, পাপ-পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে উল্লেখ করেন। কেহ বা তাহাকে সংস্কার বলেন। জীব সেই সকল সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের প্রেরণাতেই পুনর্ব্বার সেই সেই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। মূলকথা এই যে, কর্ম্ম করিবামাত্র জীবের সূক্ষ্মশরীরে বা চিত্ত-ক্ষেত্রে এক প্রকার শক্তি বা গুণ (ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ) উৎ-পন্ন হয়। সেই গুণ বা কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে পুনঃপুনঃ অবস্থান্তর প্রাপ্ত করায় এবং নূতন নূতন রাগদ্বেষাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ উৎপাদন করে। সেই সকল কর্ম্মবীজের নাম কর্ম্মাশয়। ইহার অন্য

নাম পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, শুভাদৃষ্ট ও দুরাদৃষ্ট। কর্ম্ম করিলেই জীবের সূক্ষ্মশরীরে কর্ম্মজন্য আশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ জন্মিলে সে আপন আশ্রয় জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবেই করিবে। কত দিনে বা কোন্ সময় কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। ফলতঃ এক সময়ে না এক সময়ে করিবেই করিবে,—সেই অবস্থান্তর-প্রাপ্তির নাম কর্ম্মফলভোগ।

এখন প্রত্যেক জীবের উপর সংস্কার সংলগ্ন আছেই আছে। বৎসাসুর, বকাসুর বধ হইলে ইহজন্মের সংস্কার মার্জ্জিত হইয়া গেল। কিন্তু কত জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার সঞ্চিত হইয়া আছে,—কত জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার আমরা বহন করিতেছি। যখন আমরা ইহজন্মের পাপ মুক্ত করিয়া উন্নত হইবার চেষ্টা করি, যখনই অন্তঃকরণ পবিত্র করিয়া লই—তখনই পূর্ণিমার আকাশে দূরস্থ মেঘখণ্ডের ন্যায়, নির্ম্মল হৃদয়াকাশে শত জন্মের সংস্কার আসিয়া ছাইয়া বসে। গৃহদাহ জন্য যদি কোন গৃহে বায়ু লঘুতর হইয়া উর্দ্ধগমনশীল হয়, অমনি চারিদিক্ হইতে ঘন বায়ু আসিয়া সেই গৃহকে আক্রমণ করে। এই জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারই জীবের "অঘ।"

এই অঘাসুরকে নিহত করা বড় শক্ত ব্যাপার নয়। বর্ত্তমান জীবনের পশ্চাতে কত সহস্র সহস্র জন্ম পড়িয়া রহিয়াছে—কোথায় গিয়া কোন্ পাপের অঙ্কুর হইয়াছে,—কে বলিয়া দিবে? সৃষ্টির প্রাক্কালে চাহিয়া দেখিলে যদি জীবের পবিত্রতা দেখা যায়। পবিত্রতা বিশুদ্ধতা যাহাই কিছু বল, যদি সেই স্থানে সন্ধান মিলে।

ব্রাহ্মণগণ নিত্যসন্ধ্যাবন্দনায় অঘমর্ষণ করেন। প্রলয়ের অবস্থা কল্পনা করিয়া তাহাতে বিশ্বকে ও সেই বিশ্বে আপনাকে বিলীন

কল্পনা করেন। নিত্য সন্ধ্যায় সেইরূপ কল্পনায় জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার যদি ধ্বংস হয়—যদি প্রবল অঘমর্ষণ হয়। ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যায় 'অঘ-মর্ষণ' মন্ত্র যথা :—

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীধ্যাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎ-সরোঽজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥

"মহাপ্রলয়-সময়ে জগৎ একমাত্র পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল, তৎকালে কেবল রাত্রি অর্থাৎ জগৎ অন্ধকারময় ছিল। পরে সৃষ্টির আরম্ভে অদৃষ্টবলে সৃষ্টির মূলস্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয়। সেই প্রলয়-পয়োধিজল হইতে বিশ্বপ্রকটনকারী বিধাতা জন্মিলেন। তিনি দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনীপ্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসর কল্পনা করেন। তদবধি দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি এবং সর্ব্বলোকাদি কল্পিত হইতে লাগিল।

ব্রজভাবের অঘমর্ষণ অন্য প্রকারের। তাহাতে কল্পনা নাই, চিন্তা নাই। ভগবানের কার্য্য ভগবান্ করুন,—ভক্ত জীব নাচিতে নাচিতে অজগরের মুখে চলিয়া গেল। তাহারা জানিত, ভগবান্ আমাদের—আমরা ভগবানের। অজগর হউক, আর স্বয়ং কালই হউক, হরি-রক্ষিত ব্যক্তিকে কে নষ্ট করিতে পারে—আমাদিগকে নষ্ট করিতে আসিলে সেই-ই বিনষ্ট হইবে। ইহাতে সংস্কারবীজ ভাজা শস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিলে সব আপৎ বিদূরিত হয়।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—"তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব।"

ব্রজের গোপগণ এখন অবমুক্ত হইল। এখন হইতে তাহারা অপার্থিব। কেন না, সংস্কারই জীবকে পাপ ও পুণ্যে আকর্ষণ করে। কাম-কামনার রাজত্বে টানিয়া লয়। সংস্কারই প্রথম, অদৃষ্ট পরে। যাহার সংস্কার গেল, তাহার কর্ম্মফলও গেল, অদৃষ্টও গেল। গোপ-বালকগণ সকলেই এখন তন্ময়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোপবালক ও গোবৎস হরণ।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি,—"তারপরে ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য মায়া দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর একসেট রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম।" * বাস্তবিক কথা কি উহাই?

গুরু। কৃষ্ণকে পরীক্ষাজন্য একদা গোবৎস ও গোপালগণকে হরণ করেন নাই। যে দিবস গোপালগণের অঘমর্ষণ হইল, সেই দিবসই

* বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র;—১২১ পৃঃ।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোপাল ও গোবৎস হরণ হইয়াছিল। উহার অর্থও অত সোজা নয়। আগে ঘটনা শোন, তারপরে অর্থ শুনিও। ঘটনা এই,—

সখাগণের অঘমর্ষণ করিয়া অঘাসুরের নিপাত ও তদীয় কবল হইতে বয়স্যগণকে মুক্ত করিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণ, বৎস ও বয়স্যদিগের সহিত নদী-তীরে গমন করত সকলে ভোজনে বসিলেন। এই সময় বৎসগণ চারি-দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় সখাগণকে ভোজনে বিরত হইতে নিষেধ করিয়া নিজেই বৎসগণকে গুছাইয়া আনিতে গমন করিলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ অঘমর্ষণ দেখিতে আকাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অঘাসুর-মোক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। তারপরে বৎস ও বৎসপাল গোপবালকগণকে হরণ করিলেন। তখন—

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥

বনের মধ্যে কুত্রাপি বৎস ও বৎসপালকদিগকে দেখিতে না পাইয়া বিশ্ববিৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিলেন,—এ সমুদয় বিধিকৃত।

তখন :—

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্‌যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ॥

"যেমন যে বৎসপাল, যেমন বৎসের শরীর, যেমন যাহার হস্ত-পদাদি, যেমন যাহার যষ্টি-বিষাণাদি, যেমন যাহার শীল গুণ ইত্যাদি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলই সেইরূপ হইলেন।"

স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্‌ব্রজম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোবৎস হইলেন। নিজেই গোপবালক হইলেন, এবং নিজেই স্বর্ব্বস্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে এবং বিভিন্ন চেষ্টা করিতে করিতে ব্রজে গমন করিলেন। সারা ব্রজ কৃষ্ণময় হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রকার সর্ব্বাত্মা হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন,—আপনি আত্মরূপী বৎসসকলকে আত্মরূপী বৎসপালদিগের দ্বারা নিবারণ করিতেছিলেন, অর্থাৎ প্রয়োজক ও কর্ম্ম এবং প্রযোজ্য কর্ত্তা আপনিই হইয়াছিলেন। আর আত্মবিহার দ্বারা আপনিই ক্রীড়া করাতে ক্রিয়াকারণও আপনিই হইয়াছিলেন।

এইরূপ একবৎসর ছিল। বৎসরূপ কৃষ্ণ, বৎসপালক গোপবালক কৃষ্ণ। প্রত্যহ গোষ্ঠ হইতে গোবৎস চরাইয়া আসিয়া যাহার যে বাড়ী, সেই বাড়ী যাইতেন—যাহার যে বৎস, তাহার গোশালায় তুলিতেন। সমস্ত ব্রজের রমণীগণের সন্তান তিনি—নারীগণের ক্রোড়ে ক্রোড়ে তিনি। গাভীগণের স্তন্যপানে তিনি। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ—প্রেম, আনন্দ যেন সর্ব্বত্র ছড়াছড়ি। ভগবানের বংশীনাদে—যোগমায়ার বলে সকলেই সে মায়ায় মুগ্ধ। কেহ কিছু জানিতে পারিল না—বুঝিতে পারিল না। বলরামও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্বৎসর গত হইবার পাঁচ কি ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন।

একদা গোপবালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বনমধ্যে বৎস চরাইতে গমন করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সানুদেশে তখন গোপগণ গাভী চরাইতেছিল। বৎসগণের উদ্দেশে চাহিয়া গাভীসকল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল—গোপগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে

পারিল না। তাহারা ধাবমানা গাভীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল।—বলরাম দেখিলেন, গাভীসকল আসিয়া সেই বয়ঃপ্রাপ্ত বৎসগণকে স্তনদান করিতে লাগিল এবং অবলেহন ও নয়নাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাদের সর্ব্বশরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছিল। গোপগণ আপন আপন পুত্রগণকে দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া স্নেহ-বাহুযুগলে তাহাদিগকে বন্ধন করিল। তাহাদেরও শরীরে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াসকল লক্ষিত হইতে লাগিল। ব্রজগোপীদিগের পুত্র লইয়া এই ভাব তিনি ব্রজে দেখিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বিস্মিত হইলেন।

বিস্ময়ের প্রধান কারণ এই যে, গাভীগণ নবজাত বৎস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বকার বৎসের প্রতি এরূপ স্নেহশীলা কেন হইল? কেনই বা তাহাদিগের অশ্রু, কম্প, রোমহর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণের উদয় হইল? গোপ-গোপীগণ কেনইবা পুত্র স্পর্শে আনন্দময় হয়? বলরাম ধ্যানস্থ হইলেন। দেখিলেন, গোবৎস ও গোপবালকগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ।

তখন সাগ্রহে সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

> নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
> ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
> সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদে-
> ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ ॥

"ভাই,—আমি জানিতাম, গোবৎস ও গোপবালকগণ দেবতা ও ঋষি। কিন্তু এখনত আর সে ভেদ দেখা যায় না। এখনত আর ইহারা দেবতা ও ঋষি বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে না। হে ঈশ! সর্ব্বত্র তুমিই প্রতিভাত হইতেছ। অতএব এ সকল কি? কি প্রকারে কি হইল, তাহা আমাকে বল।"

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষয় বলিলে বলরামের পরিজ্ঞাত হইল। তদনন্তর যাহা যাহা হইয়াছিল, বলি শুন। শ্রীকৃষ্ণ মায়াবলে বৎস ও বৎসপাল সৃজন করিয়া ঐ প্রকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এক বৎসর গত হইল, কিন্তু মনুষ্যের এক বৎসর ব্রহ্মার আত্ম-পরিমাণে একটি মাত্র পরিমিত কাল। ব্রহ্মা ঐ কালের পর ঐ স্থানে পুনরায় আগমন করিয়া দেখিলেন,ভগবান্ পূর্ব্ববৎ অনুচরগণসহ মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কি? ব্রজে যত বালক ও গো-বৎস ছিল, বৎস-সহিত সকল বালকই আমার মায়া-শয্যায় শয়ান আছে,—অদ্যাপি তাহাদের পুনরুত্থান হয় নাই। আমার মায়ায় মোহিত সে সকল বালক হইতে বিভিন্ন এসকল বৎস ও শিশু কোথা হইতে হইল? ইহারা এখানে কিরূপেই বা আসিল? ফলতঃ ঐ সকল মায়াকল্পিত বালকই সংবৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। যাহা হউক, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তর্ক-বিতর্ক ও চিন্তা করিয়াও ব্রহ্মা ঐ দ্বিবিধ বালকাদিমধ্যে কোন্‌গুলি সত্য ও কোন্‌গুলি অসত্য—কোন প্রকার নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, সুতরাং মোহশূন্য অথচ বিশ্ববিমোহন ভগবান্ কৃষ্ণকে মায়া দ্বারা মুগ্ধ করিতে আসিয়া আপনিই বিমোহিত হইলেন।

তমিস্রা রজনীতে হিমকণপ্রভ অন্ধকার যদ্রূপ পৃথক্ আবরণকারী হয় না, রাত্রির অন্ধকারেই লীন হয়, এবং রাত্রিকালীন খদ্যোতের জ্যোতিঃ যদ্রূপ দিবসে পৃথক্ প্রকাশ হয় না, সূর্য্য-কিরণেই লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ যে পুরুষ মহৎ পুরুষে আত্মযোগ করেন,তাঁহার প্রতি ইতর মায়া কিছুই করিতে পারে না,—আপনারই সামর্থ্য বিনষ্ট করে। সে যাহা হউক, ঐ সময়ে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। সমুদয় বৎস ও বৎসপাল ও সমস্ত যষ্টি-শৃঙ্গ প্রভৃতি পদার্থ দর্শনকারী ব্রহ্মার সমক্ষে তৎক্ষণাৎ ঘনশ্যাম, পীত-কৌষেয়ধারী, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মহস্ত,

কিরীট-কুণ্ডল-হার এবং বনমালায় অলঙ্কৃত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সকলেরই বাহুতে শ্রীবৎসের প্রভাযুক্ত অঙ্গদ, সকলেরই হস্তে রত্নময় ও কম্বুবৎ ত্রিধারান্বিত কঙ্কণ, সকলেই নূপুর, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গুরীয়ক দ্বারা উদ্দ্যোতিত। আর সকলেরই সর্ব্বগাত্রে বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যশালী ভক্তজনার্পিত কোমল তুলসীর নবীন দাম এবং তাহাদের সকলেরই চরণ ও মস্তক পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইল। অপিচ সকলেই চন্দ্রিকার ন্যায় বিশদ হাস্য ও অরুণবর্ণযুক্ত অপাঙ্গদর্শন দ্বারা রজঃ ও সত্ত্বগুণে আপন আপন ভক্তদিগের মনোরথ সকলের স্রষ্টা পালকবৎ প্রকাশ পাইতেছিল। আর মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় চর ও অচর নৃত্য-গীতাদি বহুবিধ অর্হণ দ্বারা তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতেছিল। সকলেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, অবিদ্যাদি শক্তি এবং মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বেষ্টিত, এরূপ বোধ হইল। অপিচ, কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম ও গুণাদি যে সমস্ত পদার্থ, সে সকলের সহচর ভগবন্মহিমা দ্বারা যাহাদের স্বাতন্ত্র্য তিরস্কৃত হয়, সে সকলও মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঐ সমস্ত ব্যক্তির উপাসনা করিতেছিল। ফলতঃ সত্য জ্ঞান ও সমস্ত আনন্দমাত্রৈকরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই তাহাদিগের মূর্ত্তি হইয়াছিল।

ব্রহ্মা পুলকিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তারপরে ভগবান্ নিজমায়া অপসারিত করিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন, গোপবালকগণ ভোজন করিতেছে—গোবৎসগণ যমুনাতীরে, লতাগুল্মাভ্যন্তরে ও পর্ব্বতের সানুদেশে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করিতেছে—আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভোজনকবল হাতে করিয়া বৎসপাল অন্বেষণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন।

বিধাতা অবাক্ হইলেন। বেদ-বিধিছাড়া তাঁহার সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রেম গদগদকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেনঃ—

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঙ্গং নরভূজলায়নাৎতচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

"প্রভু—তুমি যখন সর্ব্বদেহীর আত্মা, সকলের অধীশ্বর, অখিল লোকসমষ্টি,—তখন তুমি কি মূল নারায়ণ নহ? চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও জল যাঁহার আশ্রয়, সেই নারায়ণ তোমার মূর্ত্তিবিশেষ। সে নারায়ণেরও যদি পরিচ্ছিন্নতা থাকে, তথাপি তোমার লীলা নিত্যরূপ সত্য।"

অনন্তর ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপালক শিশুগণকে ফিরাইয়া দিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ আত্মমায়া অপসারিত করিয়া প্রকৃত বালক ও গোবৎস লইয়া ব্রজমধ্যে গমন করিলেন। ইহাই উপাখ্যান।

এখন এ ঘটনা কি কেবল ব্রহ্মা ও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম,—এইটুকুর জন্য? তাহা নহে।

সাধনব্যাপারে জীবের আগে তন্ময়তা, তারপরে তদ্রূপতা। যখন অঘাসুর তাহার আকাশস্পর্শী করাল বদন ব্যাদান করিয়াছিল, তখন গোপবালকগণ তাহা গ্রাহ্য করে নাই,—তাহাদের তখন তন্ময়তা হইয়াছিল। তাহারা জানিত, শ্রীকৃষ্ণ আছেন,—তিনি রক্ষা করিবেন। আমাদের কে অনিষ্ট করিতে পারে? ইহাতে তাহাদের শত জন্মের সংস্কার কৃষ্ণপদাভিঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল,—তন্ময়তার গুণে সে শত জন্মের স্মৃতি বিস্মৃতির আগুনে পুড়িয়া গেল। এখন তদ্রূপতা।

ব্রাহ্মী সৃষ্টি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। ব্রহ্মা এই তিন লোকের উপরে কার্য্য করিয়া থাকেন।

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ
একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১০।৮

ভগবান্ কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রেরিত ব্রহ্মা পদ্মকোষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই লোকপদ্মকে ত্রিলোকীরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ।
ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ॥

শ্রীমদ্ভাগবত; ৩।১০।৯

ত্রিলোকীর বিভাগের কারণ এই যে, জীবের ভোগস্থানের জন্য তিনলোকের রচনা আবশ্যক।

ব্রহ্মা এই ত্রিলোকীর মধ্যে অবিদ্যাবৃত্তির বা অজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ॥
মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা॥
মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

এই সকল বৃত্তি দ্বারা জীব অধঃপতিত হয়। সৃষ্টিরক্ষার্থেই এই বৃত্তির প্রয়োজন।

এখন বৃন্দাবনের গোপবালকেরা যখন তন্ময় হইল, তখন ব্রহ্মার সৃষ্ট মায়া বা অবিদ্যা তাহাদিগকে বাঁধিবার চেষ্টা করিল। শ্রীকৃষ্ণ-সংস্থাপিত এ ধর্ম্মে জীবের উদ্ধার হইবে,—কৃষ্ণসাযুজ্য লাভ করিবে। বিধাতা মায়াজাল বিস্তার করিলেন। কিন্তু বিধির বিধি নূতনাবর্ত্ত বিস্তার করিতেছেন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" তাহাদের তিনি রক্ষা করিবেন।

গোপশিশু তন্ময় হইয়া ব্রহ্মার মায়া-শয্যায় শয়ন করিল,—কিন্তু ভগবান্ তাহাদের আধারে আধারে আবির্ভূত হইলেন। নিত্য মুক্তভাবে তাহারা ক্রীড়া করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তাহাদিগের পার্থিব দেহ লইতে পারেন না,—সে লোকে পার্থিব পদার্থ যায় না। তিনি তাহাদের সূক্ষ্মদেহ মায়া-শয্যায় পাতিত করিলেন,—কিন্তু সেখানে অনির্লিপ্ত আত্মা প্রতিভাসিত হইল। তারপরে তদ্রূপতা সকল শিশু, সকল গোবৎস শ্রীকৃষ্ণের রূপে প্রতিভাসিত হইল। ব্রহ্মা বেদবহির্ভূত কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন।

বাস্তবিক ব্রজভাবের তন্ময়তা উপস্থিত হইলে বিধির বিধি বিদূরিত হয়। তন্ময় হইতে তদ্রূপতা আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতের অতীত হইয়া পড়িতে হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কালিয়দমন ও দাবাগ্নিভক্ষণ।

শিষ্য। কালিয়দমন গল্পটা খাটি রূপক ;—ইহা বোধহয় আপনিও বলিবেন

গুরু। আমরা যাহা বুঝিতে পরি না, তাহাই রূপক বলি।

শিষ্য। তবে কি আপনি উহাও বাস্তব বলিতে চাহেন ?

গুরু। সূক্ষ্মশক্তি স্থূল হইয়াছিল,—সূক্ষ্ম আকার বিশিষ্ট হইয়াছিল। ভগবান্ কৃষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া যেমন স্থূল মানব হইয়াছিলেন,—জগতের অন্যান্য তত্ত্বও তদ্রূপ স্থূলাকার ধারণ করিয়াছিল। লোকদিগের শিক্ষার জন্য,—ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য দেবতারাও স্থূল হইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন,—অশরীরী শরীর গ্রহণ করিয়াছিল। আমাদিগকে সে সকল তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সূক্ষ্মেরই আলোচনা করিতে হইবে,—কিন্তু তাই বলিয়া তাহা রূপক নহে, ইহা স্মরণ রাখিও। এখন কালিয়দমন ও দাবাগ্নি ভক্ষণের ঘটনাটা এই :—

ইহা শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ডকালের কথা। তখন তিনি বৎস চরান পরিত্যাগ করিয়া বয়স্যগণের সহিত গাভী চরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তখন তাঁহার পাদস্পর্শে ও মধুর বেণুগানে সমগ্র বৃন্দাবন দূরদেশাগত স্বামি-কর-সংস্পর্শে নববধূর হৃদয়ের ন্যায় প্রেমভরে পুলকিত অথচ দুরু দুরু কাঁপিতেছে। বনে বনে কোকিলের গান, বনে বনে কুসুমের স্ফুটন, বনে বনে মলয়মারুতের মৃদু কম্পন, বনে বনে পশু-পক্ষীর নৃত্য।

একদা গাভীপাল লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত কালিন্দী-সমীপে গমন করিয়াছিলেন। কালিন্দীর মধ্যে অন্য একটি হ্রদ ছিল,—তাহার অভ্যন্তরে কালিয় সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার প্রবল বিষে সেই জল দূষিত হইয়া গিয়াছিল,—সে জল পান করা দূরে থাক, তাহার সংস্পর্শমাত্র জীব গতাসু হইত। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের সেই বিষভয় বিদূরিত করিবার জন্য সেই জলে নিমগ্ন হয়েন, এবং জলমধ্যে সর্পের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। তারপরে তাহার ফণার উপরে উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকেন, এবং মধুর বেণুগানে বৃন্দাবনে অভয় আশ্বাস প্রদান করেন। কালিয়পত্নী নাগিনী ক্ষমার্থিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কালিয়কে সমুদ্রবাসের আদেশ করিলেন, কালিয় সপরিবারে বৃন্দাবন ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে অবতরণ করিলে রাখালেরা সে সংবাদ বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিল। বৃন্দাবন হইতে গোপগোপীগণ কৃষ্ণের জন্য

শোকাকুলিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করে। তারপরে রাত্রি হইয়া যায়,—সেদিন ফিরিয়া যাওয়া হয় না,—কিন্তু হঠাৎ রাত্রে দাবাগ্নি জলিয়া ব্রজবাসিগণকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ হরি সেই দাবানল ভক্ষণ করেন।

এখন ইহাতে কথা আছে অনেক।

জীবের কর্ম্মবাসনা প্রবাহের অনাদি ;—সাধন দ্বারা তাহার ভঙ্গ হয়, বিনাশও হয়। যতদিন না তাহার বিনাশ হয়,—ততদিন পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত সংস্কার উৎপন্ন হইবেই হইবে। সুতরাং সংসারও অনিবার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জীব যতদিন না কোন সাধন দ্বারা অনাদি কর্ম্মবাসনা-প্রবাহ ভঙ্গ করিতে পারে, ততদিন নিশ্চিত তাহা প্রবাহিত হইবে। ততদিন তাহার (বাসনার) হেতু, কাল, আশ্রয়, অবলম্বন এ সমস্তই থাকিবে। বাসনার হেতু বা কারণ ক্লেশ এবং কর্ম্ম। দেহপ্রাপ্তি ও আয়ুর্ভোগ তাহার ফল। চিত্ত তাহার আশ্রয়। রূপাদি বিষয় তাহার অবলম্বন। ঐ সকল অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ বাসনার উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু, কাল, আশ্রয় ও অবলম্বন, অবলম্বন করিয়া জীব পুনঃপুনঃ বাসনাজাল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জড়িত হইতেছে ও পুনঃপুনঃ ঐ সকল হেতু, কাল, আশ্রয় ও অবলম্বন ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছে। অপিচ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রমবাসনারূপ অবিদ্যাই অস্মিতার অর্থাৎ "আমি" ভ্রমের অথবা আত্মাভিমানের জনক। সেই অস্মিতা হইতেই 'আমি অমুক' 'আমি জ্ঞানী' 'আমি মানী' 'আমার স্ত্রী' 'আমার ঘর' 'আমার বাড়ী' ইত্যাদি প্রকার মিথ্যাজ্ঞান জন্মে। ঐ সকল মিথ্যাজ্ঞান হইতেই যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষাদি নামক অভিপ্রায় উৎপাদিত হয়। সেই উৎপন্ন অভিপ্রায় আবার পরানুগ্রহ ও পরনিগ্রহাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। সেই স্বকৃত কার্য্য হইতে

পুনরপি ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক সংস্কার,—যাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভবীজ, তাহা উৎপন্ন হয়। সেই বীজ আবার কালে অঙ্কুরিত হইয়া বিবিধ ভোগরূপ বৃক্ষ জন্মায়। সেই সকল ভোগবৃক্ষ হইতে পুনঃ ভবিষ্যৎ ভোগের বীজস্বরূপ বাসনা বা সংস্কারসমূহ জন্মে। সংসার-চক্র এক প্রকারে নিরন্তর চলিতেছে। ইহাকেই বিষের আবর্ত্ত বলা যায়। চিত্তেই ইহার উৎপত্তি ও স্থিতি।

বিনাশবাদিগণের মতে সকল বস্তুই অস্থায়ী; সুতরাং তাহাদের মতে চিত্তও অস্থায়ী অর্থাৎ নশ্বর। কিন্তু দার্শনিকেরা বলেন, বস্তু মাত্রেই স্থায়ী; পরন্তু তাহাদের ধর্ম্ম, গুণ বা অবস্থাগুলিই অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তন অনুসারেই লোকমধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ফলকথা এই যে, যাহা অত্যন্ত অসৎ, অর্থাৎ যাহা কোনকালে নাই,—তাহা উৎপন্ন হয় না। যাহা বাস্তবিক সৎ, অর্থাৎ যাহা সত্য সত্যই আছে, তাহারও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। কেবলমাত্র তদাশ্রিত ধর্ম্মের গুণের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। অভিনব ধর্ম্মাদির (আকৃতির) আবির্ভাব ও বর্ত্তমান ধর্ম্মাদির তিরোভাব হয়। অথবা বস্তুগতির পথের প্রভেদ হয়। ঘটনামক বস্তুর ঘটাকার ধর্ম্ম (ঘটের বর্ত্তমান অবস্থা) অতীত পথে প্রবিষ্ট হইলে "ঘট নাই" বলা যায়। ভবিষ্যৎ পথে থাকিলে "ঘট হইবে বা হইতেছে" বলা যায়, এবং বর্ত্তমান পথে থাকিলে ঘট আছে এইরূপ বলা যায়। ইহারই দ্বারা জানা যায়, ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তনবিশেষের নামই উৎপত্তি, পরিবর্ত্তনবিশেষের নামই স্থিতি এবং পরিবর্ত্তনবিশেষের নামই লয় ও বিনাশ। কাজেই স্থির করিতে হইবে, যাহাকে আমরা "নাই" বলি, তাহা একেবারে নাই, এরূপ নহে। যাহাকে, আমরা "হইবে" বলি, তাহা যে হইবার পূর্ব্বে একেবারে ছিল

না, অর্থাৎ কোন আকার ছিল না, এরূপও নহে। বস্তু আছেই,—আমরা কেবল তাহার ধর্ম্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আছে, নাই ও হইবে বলিয়া থাকি।

এখন কথা হইতে পারে, ধর্ম্মসকল পরিবর্ত্তিত হইয়া কি হয়? কোথায় যায়? তাহা সূক্ষ্ম হইয়া আপন আশ্রয়ে অদৃশ্য হয়, প্রবেশ করে, অর্থাৎ লুকায়িত হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া গেল, ঘট নাই—এ কথার অর্থ এই যে; ঘটাকার ধর্ম্মটি স্বীয় আশ্রয়ে (মৃত্তিকায়) সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম হইয়া লুকায়িত হইয়াছে। ঘট হইতেছে, এ কথার অর্থ এই যে, ঘটধর্ম্ম বা ঘট-অবস্থাটি—যাহা মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীতে শক্তিরূপে ছিল,—লুকায়িত ছিল,—তাহাই কারণ-ব্যাপার দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে,—অথবা বর্ত্তমান-পথে আসিতেছে। এতদ্রূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা নির্ণীত হয় যে, সেই সেই অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত (ভবিষ্যদ্‌গর্ভে অবস্থিত) ধর্ম্ম-বিষয়ের আশ্রয় দ্রব্যাদি এক ও স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী বা চিরস্থিত ধর্ম্মীর উপর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। সেই একই স্থায়ী বস্তুর ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমানপথে আসিয়াছে, কখন বা অতীত-পথে যাইতেছে। কোন দ্রব্যের সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতেছে না। অতএব জীবের চিত্তও এক স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী চিত্তকে এবং তাহার ধর্ম্মনিচয়কে যদি উপায় দ্বারা অতীতপথে প্রবিষ্ট করান যায়,—তাহা হইলে আর তাহার প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। অনন্ত কালের নিমিত্ত তাহারা প্রকৃতিগর্ভে প্রবেশ করে,—লুকায়িত হয়। সুতরাং তখন আর জীবের জীবত্ব থাকে না। জীব তখন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, কেবল ও চিৎস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রজবাসিগণের চিত্ত কালিয়হ্রদে সংস্কারবিদূরিত বা তাহা অতীত অবস্থায় পরিণত করাই কালিয়দমন। কালিয়ের অসংখ্য পরিবার—

অসংখ্য নাগিনী। কৃষ্ণপাদস্পর্শে তাহারা বিদূরিত হইল—সমুদ্রগর্ভে লুকায়িত হইল। সংসারসমুদ্রে—তাহারা না থাকিলে জীবস্রোত থাকিবে কেন ?

কালিয়নাগের তিনটী ফণা—কোন মতে পাঁচ, কোন মতে সহস্র। যে কোন বস্তু আছে, তাহাদের সকলেই দ্বিবিধ- ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্ব অবধি ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। কখনও বা কেহ ব্যক্ত হইতেছে, কখনও বা কেহ সূক্ষ্ম হইতেছে। অপিচ, ব্যক্তই হউক, আর সূক্ষ্মই হইক, সমস্ত বস্তুই গুণময়, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টি বা পরিণাম। সত্ত্ব-রজ-তমোগুণই বিশেষ বিশেষ আকারে পরিণত হইয়া বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ত্রিগুণের বিকার বলিয়াই বস্তুসকল ত্রিগুণ। তাই কলির নাগেরও তিন ফণা। আবার এক, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম ও অবস্থা নানা। কালিয়নাগের ফণাও সহস্র।

তারপরে দাবাগ্নি। গোপগণের অন্য শরণ নাই, অন্য ভজন নাই —তাহারা যাহা করে, যাহা বলে, যাহা দেখে—সমস্তই কৃষ্ণ। কাজেই তাহাদের বাসনার সেই অতীত অবস্থা, লুকায়িত অগ্নি—তিনিই পান করিলেন। মনপোড়া আগুন কৃষ্ণে সমর্পণ না করিলে—তিনি পান না করিলে নির্ব্বাণের উপায় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন-ভ্রমণ।

গুরু। এবার তোমাকে যে কথা শুনাইব, তাহা মধুর-রসাশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ ধরাতলে যে ধর্ম্মসংস্থানের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবার তাহার বিকাশোন্মুখ ভাব ঘটিতেছে—তাহা শুনিবে।

শিষ্য। অনুগ্রহ প্রকাশে তাহা আমাকে বলিয়া জ্বলিত কণ্ঠে শীতল ধারা প্রদান করুন।

গুরু। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখন কিশোরবয়স্ক—কিশোর কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। কিশোর কৃষ্ণ নিত্য গোলোকবিহারী। বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া বৃন্দাবনে রসের লীলা এবং মথুরা কুরুক্ষেত্রাদিতে ঐশ্বর্য্যের লীলা বিকাশ করিয়াছিলেন। এই দুই লীলায় ধর্ম্মসংস্থাপন।

এখন আমাদিগকে আর একবার স্মরণ করিতে হইবে, ভগবান্ পৃথিবীতে কেন আবির্ভূত হয়েন। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন:—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।"

দ্বাপরে জ্ঞানের জ্বালাকণ্ঠ মানব যজ্ঞধূমাচ্ছন্ন নয়নে তাঁহার আগমন কামনা করিয়াছিল,—তাই তিনি প্রেম লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি রসে সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্‌কে জীব কেমন করিয়া আপন করিতে পারে,—কেমন করিয়া তিনি ঐ সকল ভাবে ভক্তের অধীন হয়েন, তাহাই দেখাইবার জন্য—তাহারই আদর্শ হইবার জন্য অবতার। আর অসাধুগণ অর্থে অহঙ্কারদৃপ্ত জ্ঞানমার্গাবলম্বী মানবগণকে একবার মরণপথে উন্নীত করিয়া লইবার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সাধন তাঁহার ইচ্ছাতেই হইতে পারিত, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে তাঁহার সম্পন্ন করাই সামঞ্জস্য-বিধি।

তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥"—অন্যান্য অবতারে অসাধুবিনাশ, সাধু-পরিত্রাণ হয়—কিন্তু পূর্ণাবতার ব্যতিরেকে ধর্ম্মসংস্থাপন হয় না। কিন্তু—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

ব্রহ্মসংহিতা ; ৫।১।

"শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি কেহ নাই। তিনি গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণ মায়ারও কারণ।"

ভগবান্ কৃষ্ণ পূর্ণতম,—গোলোকে তাঁহার নিজ লীলাবিলাস।

ব্রজধামে সেই রস-মাধুর্য্য বিলাইতে প্রকটভাব। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের যাঁহারা সাধক—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিত্য বশীভূত। দাস, সখা, পিতা, মাতা ও কান্তাগণ লইয়া প্রেমাবিষ্ট ভাবে ব্রজলীলা। কিন্তু স্মরণ রাখিও—স্ত্রী-পুরুষ মায়ার ভেদ; ব্রজভাবে সে ভেদ নাই। ব্রজে মায়া দূরিতা—মহামায়া বা যোগমায়া সেখানকার অধীশ্বরী। ভক্তি ব্যতিরেকে কেবল জ্ঞানে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে না—স্বর্গাদি লাভ হ তে পারে। কিন্তু আনন্দময় ভগবান্ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বা বৈধী ভক্তিতে সে পূর্ণানন্দ প্রাণতম ভগবান্ মিলে না—প্রেম-ভক্তিতে তাহা মিলে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে এই জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বেদবিহিত বিধি-পথে সাধন করিয়া মানুষ, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ করিতে পারে; কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সাধন করিয়া নিত্যসুখ লাভ করিতে পারে না। সে সাধন—সে নিত্য আনন্দ লাভ কেবল ব্রজভাবে। তাই ব্রজধামে সেই মধুর ধর্ম্ম—জীবের জলিত কণ্ঠে মধু-সুধা-ধারা ঢালিবার জন্য তাই বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্ব-সেচন। বংশী-দ্বারা গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের তরুলতা, মৃত্তিকায় সত্ত্ব সেচন করিয়াছিলেন। বংশীদ্বারা তিনি বৃন্দাবনের মলিনতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বংশীদ্বারা তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় বৃন্দাবনে জীবের সহিত এক মধুর আকর্ষণময় সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে কেবলই মনুষ্যরূপী জীব নহে—সে কেবল গোপ-গোপী নহে; জীবমাত্রেই বংশীরবে শোধিত, মার্জ্জিত ও আকৃষ্ট হইয়াছিল। পশু পক্ষী, তরু লতা ও মৃত্তিকা, সকলের মধ্যেই জীবশক্তি আছে। সেই জীবশক্তি ঐশ্বরিক শক্তি। ঐ শক্তি আছে বলিয়াই, জীব জীবকে আকর্ষণ করিতে পারে,—জীব জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে; কিন্তু জীবের

উপাধি পরিচ্ছিন্ন। অপর কেহ মানুষ, পশু, পক্ষী ও তৃণলতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। বৃন্দাবন তাঁহার আত্মস্থান বা লীলাকেন্দ্র, অথবা তাঁহার পূর্ণতম রস-মাধুর্য্য প্রকাশের—ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রথম ভিত্তিক্ষেত্র। তাই তিনি বংশীরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া উত্তম হইতে অধম জীব পর্য্যন্ত স্থাবর অস্থাবর সকল প্রাণীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রাণীরই প্রাণে প্রাণে মধুরিমা সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাই :—

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম গোপবালকদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে কুসুমিত বনরাজিস্থিত মদমত্ত ভ্রমরনিকর ও পক্ষিকুল কর্ত্তৃক নাদিত সরিৎ সরোবর ও পর্ব্বতবিশিষ্ট অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বেণুনাদ করিলেন।

আনন্দময় বনে বনে রমণ করিয়া বেণুনাদ করিতেন। বেণুনাদে প্রেমানন্দ, বৃন্দাবনের ধূলিতে ধূলিতে, পত্রে পত্রে, স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল জীবে বিস্তারিত হইয়াছিল। সে নিনাদে গোলোকের অমৃত মর্ত্ত্য-ভূমিতে ধারাকারে পতিত, হইয়াছিল। সে রবে নরনারী, পশুপক্ষী গৃহকাজ ছাড়িয়া, ধ্যান-ধারণা, তপস্যা ছাড়িয়া শিহরিয়া উঠিত।

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরুং,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

জলদপটলকে স্তম্ভিত করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে মুহুর্মুহু চমৎকৃত করিয়া, সনন্দাদি তাপসকুলকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, ব্রহ্মাকে বিস্মিত করিয়া, পাতালে বলিরাজার হর্ষবর্দ্ধন করিয়া, ভূজগপতি অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহের ভিত্তি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বংশীধ্বনি সকল দিকে বিস্তারিত হইল।

সে রব এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। শুনিতে চাহিলে—শোনা যায়। এখনও জলে স্থলে অনন্তে সে বেণুর ধ্বনি হইতেছে। বনরমণে শ্রীকৃষ্ণ যে বেণুনিনাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে জগতের রোমাঞ্চ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনিতে মহামন্ত্র সমন্বিত কলগান করিয়া গোলোকের অপ্রকট মধুর রস প্রকটরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। জীবসমুদায় সেই কলগীতের মোহন আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল।

বনে বনে বংশীধর সম্মোহন বংশীরন্ধ্রে করাঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বংশীমুখে ফুৎকার দিতেন,—আর স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবের মনোমুগ্ধকর বংশীধ্বনি অমিয়লহরী তুলিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া চলিত। সেই মাধুরীবিসারি বেণুনাদ যে শুনিত, সেই মাতিত। জ্ঞানে সে আনন্দ নাই কর্ম্মে সে রস নাই, যাগ-যজ্ঞে সে মাধুর্য্য নাই! আনন্দ গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান্ এই মুরলীসঙ্কেত করিতেন,—এই মোহন গীত গাহিতেন।

বেণুতে কি বাজিত?—"কলং বামদৃশাং মনোহরম্।" জীবের মনাকর্ষণ করিয়া হ্লাদিনী সুখ-সম্ভোগ করানই এই মধুধ্বনির উদ্দেশ্য। এই কলপদামৃত বেণুগীতের তাৎপর্য্য এই—কলং অর্থাৎ ক—ল—ং ইহাতে বামদৃক্ অর্থাৎ চতুর্থস্বর ঈকার যুক্ত করিলে ক্লীং-পদ সিদ্ধ হয়। ইহা মনোহর অর্থাৎ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র বা চন্দ্রবিন্দুকে হরণ

করিতেছে; অতএব ক × ল × ঈ × ৺—সংযোগে 'ক্লীঁ' এই কামবীজ নিষ্পন্ন হয়। ব্রজের অপ্রাকৃত নবীন মদন। করাল মধুররসাশ্রিত জীবকে আকর্ষণ করিবার জন্য মুরলীতে এই পঞ্চমাক্ষরী কামবীজ গান করিলেন। এই কামবীজ প্রণবস্বরূপ এবং গোলোকের চিন্ময় বস্তু।

গোলোক হইতে পার্থিব জগতের উৎপত্তি। গোলোকের কামবীজ হইতে ক্রমে সপ্তলোকের সৃষ্টি। ঐ ক্লীঁ হইতে পঞ্চতত্ত্বের সম্ভব হইয়াছে।

লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ।
ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুঃ প্রজায়তে।
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকং বীজম্॥

ক-কার হইতে জল, ল-কার হইতে পৃথিবী, ঈ-কার হইতে বহ্নি, নাদ হইতে বায়ু ও বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের আদি বীজ।

ক্লীঁ-বীজ কৃষ্ণস্বরূপ। কেন না, মন্ত্র দেবতাময়। কামবীজে কৃষ্ণের সেই পূর্ণানন্দ স্বরূপ বিদ্যমান।

ককারো নায়কঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ঈকারঃ প্রকৃতী রাধা মহাভাবস্বরূপিণী॥
লশ্চানন্দাত্মকঃ প্রেম সুখঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্।
চুম্বনাশ্লেষমাধুর্য্যং বিন্দুনাদং সমীরিতম্।

"ক-কারে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ নায়ক এবং ঈকারে মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধা প্রকৃতি। ল-কার এই নায়ক-নায়িকার মিলনাত্মক

প্রেম-সুখনির্দ্দেশক, এবং নাদ ও বিন্দু উভয়ের বিলাসভাব-দ্যোতক মাধুর্য্যামৃতসিন্ধুকে পরিস্ফুট করে। সুতরাং ক্লীঁ এই মহাবীজ বা বেণু-গান শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষভাবদ্যোতক বিলাস-প্রেমের মহামন্ত্র।

বনভ্রমণের এই মহামন্ত্র বৃন্দাবনে সত্ত্বগুণ সেচন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মসংস্থাপনের মহামন্ত্র জীবের হৃদয়ে আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল।

তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্‌।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্‌॥

সেই বেণুগানে কি এক আকাঙ্ক্ষা জাগে,—কি এক অবুঝভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহা স্থির করা যায় না। সেই আনন্দ-মধুর অনন্দ-মোহনকে যেন প্রাণের পিঞ্জরে পূরিয়া লইতে বাসনা হয়;—যেন ধরি ধরি ধরা যায় না। যেন মিশামিশি করি, কিন্তু কোথায় যায়। মনুষ্য-ভাবে সে দেবভাবের ভাব প্রকাশ করা যায় না। কর্ম্মী তাহা বুঝিবে না, জ্ঞানী তাহা ধারণা করিতে পারিবে না,—কিন্তু প্রেমিককে বুঝা-ইতে হইবে না। ব্রজবাসী সে ভাবে উতলা হইলেন। তাঁহাদের প্রাণে এক নবীন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া বসিল। ময়ূরময়ূরী পাশাপাশি বসিয়া সে রবশ্রবণে ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া রহিল। হরিণী হরিণের সঙ্গে তাহাদের সু-উদাস বঙ্কিম নয়নে আশাপথ চাহিয়া রহিল। কোকিলা তাহার কোকিল-বঁধুর পাশে বসিয়া পঞ্চমতান রুদ্ধ করিয়া রহিল।

শ্যামের বংশীগীত শ্রবণ করিয়া বিমান-পথে গমনকারিণী দেববালা-গণ বিক্ষিপ্তধৈর্য্যা ও মুগ্ধা হইলেন,—তাহাদের কবরীবিচ্যুত নন্দন-কাননসঞ্জাত কুসুম খসিয়া মর্ত্ত্যভূমে পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ-বেণুবিনির্গত গীতামৃত পান করিতে করিতে বৎসসকল স্তন মুখে করিয়া স্থির হইল।

গাভীসকল দর্ভকবল মুখে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বন্য বিহঙ্গকুল কাকলী ভুলিয়া বেণুরবে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখসম্ভোগ হেতু নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিল। সচেতনের কথা কি, অচেতন নদীসকলও শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান শ্রবণ করিয়া উর্ম্মি-ভুজ দ্বারা প্রেম উপহার লইয়া কমলের পদ গ্রহণ করিতেছে।

যে আনন্দ প্রদান করিতে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন,—তাঁহার নিজজনে আগে তাহা গ্রহণ করিবে। গোপীগণ তাঁহার গোকুলের নিজজন। তাহারাই আদর্শ, তাহারা সে প্রেমের আস্বাদ জানে। তাহারা থর থর কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা কৃষ্ণ-প্রেমের জন্য মহাব্রত আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বস্ত্রহরণ।

শিষ্য। গোপীদিগের সে ব্রত কি?

গুরু। গোপীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। তাহারা তাই মহাব্রতের আয়োজন করিল। সে ব্রতের নাম কাত্যায়নীব্রত।

> হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
> চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥

হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীসকল হবিষ্যভোজিনী হইয়া কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করিল।

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীম্॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ॥

তাহারা অরুণোদয় কালে যমুনাজলে স্নান করিয়া, জলসমীপে সিকতাময়ী প্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক সুরভিময় গন্ধ-মাল্য-ধূপ-দীপাদি নানা উপচারে দেবীর পূজা করিতে লাগিল। তাহারা নিত্য নিত্য নিম্ন মন্ত্রে দেবীর পূজা ও জপ করিত। নিত্য নিত্য বলিত :—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিনি! অধীশ্বরি! দেবি! তোমাকে নমস্কার,—নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি কর।

ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥
এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥

প্রাগুক্ত মন্ত্র জপ করিয়া এবং কৃষ্ণময়চিত্ত হইয়া কুমারীগণ এক-মাস যাবৎ উক্ত ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। এবং নিত্য ভদ্রকালীর নিকট প্রার্থনা করিতেন—নন্দসুত কৃষ্ণ আমার পতি হউন।

শিষ্য। গোপীদিগের এ ব্রতাচরণ করিবার উদ্দেশ্য কি? শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বফলপ্রদাতা—স্বয়ং ভগবান্। তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ভাবিলেই তিনি ফলদান করিতেন। অধিকন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্ম

পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে উপাসনা কর, আমি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব।" তবে গোপীদিগের এ ব্রতাচরণ করিবার কারণ কি?

গুরু। কারণ আছে। কৃষ্ণ-প্রেম মায়িকজগতে নহে। মায়া ত্যাগ করিতে না পারিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারা যায় না। আমি মায়াত্যাগী হইয়াছি, একথা সহজে মুখে বলা যায়, কিন্তু বাস্তবিক মায়াত্যাগ করা সহজ নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ৭।১৪।

"অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার এক মায়া আছে, যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।"

এখন সে মায়া অতিক্রম করিতে হইলে তাঁহারই আশ্রয় চাই। আশ্রয়ত চাই—কিন্তু পাই কই? পাইবার উপায় কি? তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন :—

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ১৮।৫৭.

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ;—"তুমি মনোবৃত্তিদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর।"

তুমি আমি কি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি না? কাহার প্রাণে না সে আশা হয়? কে না সেই বংশীবদনের চরণপ্রান্তে চিত্তকে ঢালিয়া দিয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতে বাসনা করে? সকলেই করে। কিন্তু হয় না কেন? আমরা বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিতে পারি না। গোপীগণ কাত্যায়নী-ব্রতাচরণে সেই বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দেবী কাত্যায়নী বুদ্ধিরূপা। তাঁহার অর্চ্চনাই বুদ্ধিযোগ। তিনি দয়া করিলে কৃষ্ণলাভ ঘটে। বুদ্ধিতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতম। যেখানে পর্য্যন্ত কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষা না জাগিলে কৃষ্ণাশ্রয় হয় না।

মূলপ্রকৃতিরূপিণ্যাঃ সংবিদো জগদুদ্ভবে॥
প্রাদুর্ভূতং শক্তিযুগ্মং প্রাণবুদ্ধ্যধিদৈবতম্।
জীবানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং নিয়ন্তৃ প্রেরকং সদা॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবত।

প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা—এই উভয় মূল প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

বুদ্ধিতত্ত্বে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপ্রেম আবির্ভূত না হইলে শ্রীকৃষ্ণ মিলিবে কেন? তাই গোপীর কাত্যায়নীব্রত।

এইবার বড় গুরুতর সমস্যা। শুষ্কজ্ঞানিগণ এই স্থলেই কৃষ্ণচরিত্র কলঙ্কিত দেখেন। কোন কোন পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আবার কৃষ্ণকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য শাস্ত্র-বাক্যাদির অর্থ ও প্রেম-ভক্তিতত্ত্বের মহান্ ভাব না বুঝিতে পারিয়া গোপীদিগের প্রেমকাহিনী ও গোপী-ভজন কৃষ্ণাশ্রয় হইতে বাদ দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এস্থলে আমাকে সভয়ে একটী কথা বলিতে হইতেছে।

গোপীপ্রেমের ভজন মায়িক জগতে আছে। বৃন্দাবনলীলা মায়াতীত। গুণময়ী মায়ার অতীত—মহামায়া বা যোগমায়ার সীমায়। একথা যাহারা বিশ্বাস না করিবেন,—তাঁহাদের এ তত্ত্ব বুঝান বিড়ম্বনা।

শিষ্য। বুঝাইলে বুঝিতে পারে না, এমন লোক কম আছে।

গুরু। না,—ইহা বুঝিতে পারা একটু কঠিন। যেমন জলজীবের পক্ষে স্থলজীবের কথা বলা অনধিকারচর্চ্চা, তেমনি মায়ার জগতে থাকিয়া মহামায়ার অপার্থিব নিয়মের তত্ত্বালোচনা করা দুর্ঘট।

শিষ্য। কথাটায় আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না।

গুরু। কেন?

শিষ্য। যাহা বুঝাইবেন বলিয়া এত আশ্বাস দিলেন, তাহার কাছে আসিয়া এখন একটা প্রহেলিকা বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন?

গুরু। না, উহা প্রহেলিকা নয়। আসল কথা। তবে বুঝিবার গোল হইলেই প্রহেলিকা হয়। সারা বিশ্বরহস্যই আমাদের নিকট প্রহেলিকা। তবে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এবং জগতের আদি কারণ ও সৃষ্টিরহস্য বিষয়গুলি চিন্তা করিয়া এই বিষয় ধারণা করিলে অবশ্যই প্রহেলিকা হইবে না,—সমস্তই সুন্দরভাবে বুঝিতে সক্ষম হইবে।

এখন কথা এই, ভেদ-বিরহিত না হইলে ভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংসার জীর্ণ বাসের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে হয়,—কিন্তু সংসারে থাকিয়া,—সংসারের কাজ করিয়া কৃষ্ণাসক্তি মধুর। তবে জোর করিয়া চেষ্টা করিয়া সে ভাব হইলে চলিবে না। যখন হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ,—প্রাণে প্রেম ও কামের লড়াই, তখন এভাব হইবে না। সহজ ভাবই গোপীভাব। আত্মার প্রতি যেমন প্রতি

মানুষের সহজ অনুরাগ,—আত্মাময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদ্রূপ সহজ অনুরাগ হওয়া প্রয়োজন। সে সহজ অনুরাগে কাজেই ভেদমূলক সংস্কার থাকিতে পারিবে না বা থাকে না।

মানবের ভেদমূলক সংস্কার সমাজ লইয়া। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, দেবতা, মনুষ্য ইত্যাদি ভেদসকল ভেদের প্রবর্ত্তক,—তাহা লইয়াই শাস্ত্র-বিধি। এ বিধিতে গোপীপ্রেম লাভ হয় না। পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম,—ইহা ভেদ। পাপ-পুণ্য বুঝি না,—ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখি নাই। তোমায় চাই,—তাতে ধর্ম্ম হয় হউক, অধর্ম্ম হয় হউক; পাপ হয় হউক, পুণ্য হয় হউক,—সে সকল চিন্তা, সে সকল কথা মনে আনিতে যায় কে? তোমায় না পাইলে বাঁচিব না,—তোমার বিরহে প্রাণ আকুল-ব্যাকুল; তোমায় চাই। প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ, আত্মা সবই তুমি। ইহাতে ভেদ নাই, বিতর্ক নাই, শাস্ত্র নাই, বেদ নাই, বিধি নাই।

মায়া কর্ত্তৃকই ভেদ বিরচিত হয়। বৈকুণ্ঠের নীচে মায়ার অধিকার। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে গোলোকে বিষ্ণুমায়া বা যোগমায়া। জলচর জীবের প্রকৃতি স্থলে আসিলে যেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়; মায়িক জগতের আমরা,—আমরা যোগমায়ার জগতে অপ্রকৃতিস্থ হই। আমাদের সে জ্ঞান সহজে হয় না।

মায়া গুণময়ী। রজস্তমোগুণ অতিক্রম করিলে, শুদ্ধসত্ত্বে ভগবৎ-সত্তা প্রতীতি হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের যে সম্বন্ধ, সে গোলোকগত সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধে মায়ার অধিকার নাই। ভেদের স্পর্শ নাই। রজোগুণ ও তমোগুণের সেবা নাই। সে সম্বন্ধ শুদ্ধসত্ত্বময়। শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবী। যিনি বৈকুণ্ঠে ও গোলোকে মায়ার স্থান অধিকার করিয়াছেন,—তাঁহার নাম মহামায়া, যোগমায়া, কাত্যায়নী। তাঁহারই

প্রসাদে জীব ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে। তাই গোপীগণ তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণরূপে লাভ করিতে হইলে সেই মহাদেবীর সাধনা করিতে হয়। বেদের বিধান,—শাস্ত্রীয় কার্য্য সেখানে খাটে না। সে সম্বন্ধের যে বিধি-নিষেধ, তাহা ভদ্রকালীই অবগত আছেন। তাই গোপীগণ মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া মহামায়ার শরণাগত হইয়াছিলেন। আর :—

উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্॥

গোপীগণ উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর পরস্পরের মৃণালবাহু ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে তাঁহারা প্রত্যহ কালিন্দীর জলে স্নান করিতে গমন করিতেন। কাহাকে লুকাইয়া যাইতেন না,—কেহ অপবাদ রটাইবে, সে ভয় করিতেন না। ভেদ ছিল না,—দ্বেষাদ্বেষী ছিল না। সকলেই কৃষ্ণকাঙ্ক্ষিণী,—কিন্তু সকলেই একপ্রাণ,—কেহ কাহারও প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ করিত না। সহস্র সহস্র নদী, সাগরাঙ্কে শায়িত হইতে ছুটিয়াছে। আপন আপন উদ্দেশ্যে,—আপনি ধাবিতা।

ব্রতপূর্ণদিনে তাহারা দেশাচারমতে নদীকূলে বস্ত্রসকল রাখিয়া কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে নদীতে অবগাহন করিয়াছিল।

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে॥

যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের কর্ম্মসিদ্ধি জন্য বয়স্যদিগের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। পরমাত্মা জীবাত্মার আনন্দদানে অভিলাষী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা পরমেশ্বর। গোপীগণ

জীব,—প্রেম ভক্তির সাধনপথে সমগ্রবর্ত্তী জীব,—তাই ভগবান্ তাহাদের ব্রতফল প্রদানে উদ্যত হইলেন। তিনি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর,—তাই তিনি মহাযোগিনীর ব্রতকারিণী গোপীগণের যোগফল প্রদান করিতে গমন করিলেন। কিন্তু তথাপিও পরীক্ষা বাকি আছে,—গোপীদিগের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই রসরাজ রসাস্বাদ করাইবার আগে আর একবার পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা অতি ভয়ঙ্কর। তুমি আমি মায়ার চক্ষুতে,—ভেদের নয়নে সে বড় অভদ্র পরীক্ষা বলিয়া বিবেচনা করি।

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীদিগের পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি লইয়া সত্বর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বালক সকলে হাস্য করিতে লাগিল। তিনিও হাসিতে হাসিতে গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্‌যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ॥

"হে অবলাগণ, এইস্থানে আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর। তোমরা ব্রতশ্রান্ত। আমি তোমাদের সহিত পরিহাস করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি।"

কথাটা অতি সত্য। পীতবাস তাহাদের বাস গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ থাকিলে,—জাতিধর্ম্ম, লজ্জা থাকিলে, কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ হয় না। একান্তে,—একমনে আপন ভুলিয়া তন্ময় না হইতে পারিলে প্রাণের বন্ধু প্রাণে মিলে না। ভেদ ভুলিতে হইবে,—তন্ময় হইতে হইবে। কাজে কথায় করিতে হইবে—

ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়ামি ॥

তবে লজ্জা বলিতে,—গোপন বলিতে থাকিবে কেন? কৃষ্ণকে ভাবিতে ভাবিতে সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেম-ধর্ম্ম জগতে বিস্তার করিতে আবির্ভূত;—তিনি জীবের মায়া-বস্ত্র,—ভেদের বসন হরণ না করিলে, কে করিবে? ভেদমূলক বৈধ ধর্ম্মের দ্বারা রসিকশেখর আনন্দমূর্ত্তি মিলে না। যদি তোমরা সকল পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ চাও,—তবে ভেদের বসন ফেলিয়া দাও। স্ত্রী-পুরুষ, মায়ার আচরণ বৈ ত নয়—সে আচরণ পার্থিব,—পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবে। জীবাত্মা সবই শ্রীকৃষ্ণের। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন :—

ন ময়োদিতপূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ।

"আমি মিথ্যা বলি না। এই বয়স্যগণ—তাহা জানে।" তোমরা একে একে কিম্বা একত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।"

তস্য তৎ ক্ষেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥

গোপীগণের হৃদয় প্রেম-রসে উথলিয়া উঠিল। মহামায়ার ব্রত করিয়া তাহাদের মায়ার ভেদ বিদূরিত হইয়াছে,—কিন্তু তথাপি খুলিল

খুলি খুলি না,—একের দর্শনে অপরের লজ্জা বাধিতে লাগিল। আবেগকম্পিত কণ্ঠে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে॥

"হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী। তুমি যাহা বলিবে, আমরা তাহাই করিব। ধর্ম্মজ্ঞ,—আমাদের বস্ত্র দাও। আর যদি না দাও, তোমার এই সকল কথা আমরা রাজাকে বলিয়া দিব।"

প্রেমে একটা অভিমান আছে। তাই এই অনুযোগ। কৃষ্ণ গম্ভীর স্বরে বলিলেন :—

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ॥

"যদি তোমরা আমার দাসী,—যদি যাহা বলিব, তোমরা তাহাই কর,—তবে এই স্থানে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।"

গোপীদিগের অনুযোগ ভাঙ্গিয়া গেল। বৈধধর্ম্ম দূর হইল,—রাজা-প্রজাসম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা ব্রজের পত্রকুঞ্জ হইতে মর্ম্মর-ধ্বনি শুনিতে পাইল :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পাইল—তাই তাহারা সর্ব্বভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিল। তাহারা লজ্জা ভুলিয়া, আপন ভুলিয়া,

স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ ভুলিয়া তন্ময় হইল। তীরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বস্ত্র চাহিয়া লইল।

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতা।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥

তাহারা বস্ত্র পরিধান করিল। প্রিয়তমের সঙ্গমদ্বারা তাহাদের চিত্ত একেবারে অবশ হইয়া পড়িল। আর গমনে সামর্থ্য নাই, প্রাণে বল নাই,—কেবল এক একবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই প্রিয়তমের সঙ্গম কি? গোপীহৃদয়ে ভগবানের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা।

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, গোপীদিগের ব্রত করা কেবল তাঁহার চরণ স্পর্শ নিমিত্ত। তাহাদের সঙ্কল্প অবগত হইয়া দামোদর শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন :—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যং ভবিতুমর্হতি॥

"হে সাধ্বীগণ, তোমাদের সঙ্কল্প, আমার অর্চ্চনা করা। আমি সেই সঙ্কল্পের অনুমোদন করিলাম। তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

ইহাতে সহসা বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের কামাসক্তি নিবৃত্তি করিবেন। কিন্তু গোপীদিগের এ বৃত্তি কাম নহে।

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমার প্রতি চিত্ত আবিষ্ট হইলে, যে আসক্তি জন্মে, তাহা কাম নহে। কামের স্বভাব ভোগদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর আমার প্রতি আসক্তি জন্মিলে কামের নাশ হয়। আমাতে অর্পিত কাম, কাম নহে;—প্রেম। ধান ভাজিয়া কিম্বা সিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে না। যেমন তাপস্পর্শে বীজের বীজত্ব থাকে না, তেমনি আমাকে স্পর্শ করিলে কামের কামত্ব থাকে না।"

মায়া-বাস অপহৃত হইল,—গোপীর প্রেম এখন নির্ম্মল। বৈধী-জগতের অতীত।

হায় জীব! সে কত দিনের কথা। এখনও আমাদের সে বাস সর্ব্বাঙ্গে জড়িত। এখনও আমরা গোপীর বস্ত্রহরণ অত্যন্ত অশ্লীল বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করি। এখনও তাহার পরিক্ষীণ মর্ম্ম আমাদের হৃদয়ে অনুমোদিত হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রজগোপী।

শিষ্য। ব্রজলীলায় গোপীতত্ত্বই বিষম সমস্যা। বিষয়টা আমাকে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে দিন।

গুরু। যতক্ষণ তোমার সন্দেহ থাকে, এই বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে পার।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, গোপীদিগের কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষা কাম নহে,

উহা প্রেম। অধিকন্তু উহা ঈশ্বর-সাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় ;—কথাটা আরও একটু বিশদ করিয়া বলুন,—আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। এই তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, আগে ব্রজগোপীর বিষয় বুঝিতে হইবে, পরে "গোপীপ্রেম বুঝিতে হইবে।"

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া তবে ব্রজগোপীর কথাই আগে বলুন।

গুরু। গোপী জীব—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর। কথাটা আরও পরিষ্কার করিতে হইতেছে।

ঈশ্বরের তটস্থা শক্তি জীব ; আর অন্তরঙ্গা শক্তি স্বয়ং। নিজশক্তি পূর্ণ, জীবশক্তি অপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, সুতরাং জ্বলন্ত অগ্নিরাশি ; আর জীব তাঁহার স্ফুলিঙ্গের কণামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ পরম পুরুষ, আর জীব অণু প্রকৃতি। জীব অবিদ্যা মায়া দ্বারা আবরিত হইয়া সংসারে নিত্যবদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ মায়াপারে গুণবর্জ্জিত ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিত।

জীব সেই সচ্চিদানন্দরসের আকাঙ্ক্ষা করে।—জীবের সেই রসাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় গোপীভাবে। "সোহহং" "আমি সেই"—এ অত্যুচ্চ কথা বলিতে ভাল, কিন্তু কাজে কিছুই নয়। সমুদ্রের বুদ্বুদ, আর সমুদ্র এক নহে। "তত্ত্বমসি" বড় মজার কথা। "তাঁহার তুমি"—তৎশব্দ অব্যয়, তস্য পদের ষষ্ঠীবিভক্তি লোপ করিয়া ব্যবহৃত ;—সুতরাং "তস্য ত্বং অসি।" অতএব জীব আর কৃষ্ণ বিভিন্ন। জীব ঈশ্বরের চিৎকণ হইলেও তাঁহা হইতে বিভিন্ন।

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

ঈশ্বর হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দশক্তি এবং সম্বিদা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি

সমন্বিত বলিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিন শক্তি বিশুদ্ধভাবে বিরাজ করে; হ্লাদ ও তাপ-করী মিশ্রা শক্তি তাঁহাকে আবৃত করে না। কিন্তু জীব মায়াশক্তিতে আবৃত হইয়া জরামরণাদি অশেষ ক্লেশের নিবাস হইয়াছে।

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

জীবাত্মা, কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার একভাগকে শতাংশ করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় সূক্ষ্ম এবং অসংখ্য এবং সেই চিৎ-স্বরূপ শ্রীভগবানের কণাসমূহের এক কণামাত্র।

অতএব মায়িক জীব "সেই আমি" এভাব ভাবিলে কি হইবে? তাহাতে প্রত্যবায় ভিন্ন আর কি হইতে পারে! জীব পরমেশ্বর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সোঽহং মা বদ সেব্য-সেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং,
তেন স্যাৎ তব সদ্গতির্ধ্রুবমধঃপাতো ভবেদন্যথা।
নানাযোনিষু গর্ভবাসবিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে,
স্বর্গে বা নরকে পুনঃপুনরহো! জীব ত্বয়া ভ্রাম্যতে॥

হে জীব! "সোঽহং মা বদ"—"তিনিই আমি" একথা বলিও না। বলিলেও "অহং সঃ—দাসস্তদীয়ঃ"—আমি তাঁহার দাস, এই কথা স্মরণ রাখিও। সেব্য-সেবকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য ভাবনা কর। তাহা করিলে তোমার নিশ্চয়ই সদ্গতি হইবে। তাহা না করিলে স্বর্গে বা নরকে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

"সোঽহং" কথাটা মুখে বলা খুব সহজ,—সে অনেক দিনের কথা।

এখন জীবের সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি-পথ ভক্তি।

জীব দুই প্রকার, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহারা চিন্ময় গোলোকধামে কৃষ্ণ-পারিষদ নামে অভিহিত এবং তাঁহারা নিত্য কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া নিত্য সেবা-সুখ উপভোগ করেন। আর নিত্যবদ্ধ জীব নিত্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া সংসারে নিত্য স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধাম হইতে মর্ত্তাভূমে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ধর্ম্মসংস্থাপন। যজ্ঞাদিদ্বারা মানুষের স্বর্গাদি লাভ হয়, কিন্তু বদ্ধজীব মুক্তজীব হইতে পারে না। নিত্যমুক্ত জীব হইয়া বদ্ধজীব যাহাতে নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশে ভগবান্ গোলোকের স্বজনগণসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গো-গোপ-গোপীগণ সেই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তাঁহার সহিত মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভগবান্ বলিয়াছেন:—"ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ মানবদেহ গ্রহণ করিয়া এমন ক্রীড়া করিব, যাহা শ্রবণ করিয়া জীব তৎপর হইবে।"

কিন্তু শক্তিমান্ শক্তি লইয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভাব বা রসের লীলা প্রচারার্থে বৃন্দাবনে তাঁহার নিত্যজন অর্থাৎ নিত্যমুক্ত গোলোকের জীবসকল আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ব্রজগোপীসকল নিত্যমুক্ত জীব,—আমাদের মত বদ্ধজীব নহেন,—

তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কৃষ্ণলীলার সহায় হইয়া আমাদের আদর্শ হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠজন যাহা আচরণ করে, ইতরজনে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। এই জন্যই তাঁহারা আদর্শ হইয়া কৃষ্ণসহ বৃন্দাবনলীলা করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের লীলার নিবৃত্তি হয় নাই;—তবে এখন প্রাকৃত বৃন্দাবনে, বদ্ধজীবের সন্নিকট নহে। এখন সে লীলা নিত্য-বৃন্দাবনে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের ভক্তিবলে ভগবান্ লাভ হয়। সেই ভক্তি-সাধানকার্য্যে তিনটি বিষয় আছে। সেবক, সেবা ও সেব্য বস্তু। ভক্তি সেবক বা ভক্তের সহিত পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে প্রিয়বস্তু বলিয়া উপাসনা করেন, এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ বলিয়াও অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তিসাধনে সাধক প্রীতিময়, সেবা প্রীতি ও সেব্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ।

সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছেন:—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তবন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৪ অঃ ১১।

"যাহারা যেরূপভাবে আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই-রূপেই অনুগ্রহ করি। পার্থ! যে যাহা করুক, সকলেই আমার সেবা-পথে আগমন করিতেছে।"

ভগবানের সেবা সকলেই করে,—কেন না, এই জগৎ সমস্তই তিনি। ভালও তিনি, মন্দও তিনি। কামও তিনি, প্রেমও তিনি। যে কামের ভজনা করিতেছে, সে কাম লইয়া জ্বলিয়া মরিতেছে; যে প্রেমের উপাসনা করিতেছে, সে প্রেমানন্দে পুলকিত হইতেছে।

ভক্তি ভজনপথের শ্রেষ্ঠ ধন। ভক্তিমান্ জন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী রসের, কি একটির অথবা কয়েকটির আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। এই পঞ্চ রসের মধ্যে শান্ত ও দাস্যরস ভক্তির অন্তর্গত ও ঐশ্বর্য্যময়। এই ঐশ্বর্য্যগত রসে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলে ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া সর্ব্বেশ্বররূপে দেখা দেন ;—কেন না, শান্ত ও দাস্যরূপের ভজনায় তিনি প্রভু, আমি দীন—তিনি মহৎ, আমি ক্ষীণ,—তিনি ঐশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ, আমি তাঁহার দাস—এইরূপ ভাবনা হয়, তিনিও তদ্রূপভাবে অনুগ্রহ করেন। ইহাতেই মানব উপাসনা করিয়া আসিতেছিল। নারদাদি ঋষিগণ, প্রহ্লাদ ধ্রুবাদি ভক্তগণ এই ভাবেই ভক্তির উপাসনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু ব্রজভাব তখন ছিল না। যাহাতে জীব তাঁহাকে প্রাণতম রূপে আপন করিতে পারে, লালসার বন্ধনরজ্জুতে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে, প্রাণের আনন্দধারায় মিলন করিতে পারে—মজিতে পারে, মজাইতে পারে, সেই ভাবের—সেই সাধনের আদর্শলীলা ব্রজে। ব্রজ-গোপগোপী তাঁহার সেই আদর্শ-লীলার সহায়। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রস আশ্রয়ে এই উপাসনা।

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে ভগবান্‌কে নিজজন ভাবিয়া ভজনা করা হয়। ভগবান্‌ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, বিভূতি বিদূরিত করিয়া সখা, সুত বা কান্তরূপে ভক্তের নিকটে আবির্ভূত হন। এ ভক্তের উপাসনায় স্বার্থ-সংস্রব বা প্রার্থনা নাই—কেবল আদ্যন্ত নিষ্কাম, কেবল সেবা।

সেবায় ভগবানের আবশ্যকতা নাই। ভক্ত সেবা করিয়া সুখী হয়। শত দাস-দাসীর সেবা-সন্তুষ্ট স্বামীকে সতী স্ত্রী সেবা করিয়া সুখী হন বলিয়া সেবা করেন। ভগবানের সেবা সকলেই করে—ভগবান্ যে

বিশ্বময়। ব্রজভাব আর বৈধীভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈধীভাবে কামনা—ব্রজভাব নিষ্কাম। বৈধীভক্তির গতিস্থান বৈকুণ্ঠ,—ব্রজভাবের পরম মাধুর্য্যময় গোলোক। গোলোকের রস জলিতকণ্ঠ জীবে প্রদান করিতেই গোপীপ্রেমের আদর্শলীলা। ইহা অত্যন্ত মধুর।

শিষ্য। মধুররসকে লোকে আদিরসও বলে।

গুরু। হাঁ, তাহা বলে।

শিষ্য। যাহা জীবের নিকট নরক বলিয়া ত্যাজ্য ;—শাস্ত্র যাহাকে নরকস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রসে ভগবানের উপাসনা ? এখনও আমি সন্দেহ মিটাইতে পারি নাই।

গুরু। মধুররসের জৈবী ক্রিয়া বা দৈহিক ক্রিয়া ঘৃণ্য, কিন্তু বাস্তবিক সে রস কি ঘৃণ্য ? জগতের মধুর আস্বাদ, মধুররসেই পাওয়া যায়। কবিত্ব বল, আনন্দ বল, উদ্দীপন বল, আকুলতা বল, আর আত্মসমর্পণ বল, সকলই ঐ রসে ঘটিয়া থাকে। কাজেই সকল রসের মধ্যে মধুররসই শ্রেষ্ঠতম। এই মধুররসেই উদ্দাম আবেগ আকুলতা ও বিশ্ববিস্মারক সুখ আনিয়া দেয় এবং জীবকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া রাখে। পরকে আপন করিতে—পরের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে এই রসই একমাত্র পারগ। দাসের দাস্যে, সখার সখ্যে, জননীর বাৎসল্যের মধ্যে এত আত্মবিসর্জ্জন—এমন আকুলতা নাই। তাই মধুররস সকল রসাপেক্ষা সুধাময় ও উন্মাদময়। পঞ্চগুণ যেমন একাদিক্রমে পর পর ভূতে মিলিত হইয়া পরিশেষে পৃথিবীতেই সকল মিলিয়াছে, সেইরূপ মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গাররসে সকল রসের সার সমাবেশ আছে বলিয়া ইহা মধুর হইতেও সুমধুর হইয়াছে। মধুররস সকল রসের আদি ও শীর্ষস্থানীয়, তাই ইহার নাম আদিরস। ইহার নিকট সকল রস হীনপ্রভ, সেই জন্য ইহাকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে উজ্জল রস বলে। ইহাতে প্রাকৃত কাম

মিশ্রিত হইলে অশুচি হয়,—নতুবা মধুররস পরম পবিত্র। ইহাতেই পরিপূর্ণ অখণ্ড আনন্দময় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

ব্রজগোপীগণ ভগবানের নিজজন,—এই রসের ভজন প্রচারার্থ আদর্শ হইয়া বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গোপী-প্রেম।

শিষ্য। গোপীদিগের সম্বন্ধে যাহা প্রেমভক্তি বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা অনেকে কাম বলিয়াই বিবেচনা করেন। কামে আর গোপীপ্রেমে কোন পার্থক্য আছে কি?

গুরু। কাম হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইত কি? কাম হইলে গোপী-ভাবের উপাসনা ভক্তের গ্রহণীয় হইত কি?

শিষ্য। গোপী-প্রেমতত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। গোপী-প্রেম বুঝাইতে হইলে, আগে সাধারণ প্রেমের লক্ষণ বলি। শাস্ত্র বলেন :—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যুনো স প্রেম পরিকীর্ত্তিতঃ॥

"বিনাশের কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও যাহা সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত, অর্থাৎ কোন প্রকারেই যাহার বিনাশ হয় না, যুবক-যুবতীর এরূপ সরল ভাবকে প্রেম বলে।"

কথাটা বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ যে,—প্রেমিকের রূপ নষ্ট হইলে, গুণ নষ্ট হইলে, আদর সোহাগ নষ্ট হইলে,—প্রেমিক অন্তকে ভাল-

বাসিলে, কলহ করিলে,—শত দোষে দোষী হইলেও যে প্রেম নষ্ট হয় না, তাহাই প্রকৃত প্রেমবাচ্য। অন্যত্র আছে :—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়ান্বিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম নিগদ্যতে॥

"যাহা দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ হয় এবং প্রিয়জনের প্রতি অতিশয় মমতা জন্মে, আত্মার সেই নিবিড় ভাবকেই পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া থাকেন।"

আর কাম ও প্রেমের সম্পর্ক—কাছাকাছি। কিন্তু কামের আকর্ষণ, কামের নেশা—দুদণ্ড স্থায়ী—মুহূর্ত্তের খেলা। রূপের নেশা ছুটিলে—আপন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইলে প্রেমিকে অনাদর করিলে, রূপের আকর্ষণ ঘুচিয়া গেলে, তাহা ছুটিয়া যায়।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

গোতমীয় তন্ত্র।

গোপিকাদিগের শুদ্ধ প্রেমের নাম কাম হইলেও উহা প্রকৃত কাম নহে, অপিচ বিশুদ্ধ প্রেমমাত্র। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদি মহাত্মা ঐ কামই অভিলাষ করিয়া থাকেন। কেন না, উহা কাম নহে,—প্রকৃত প্রেম।

শিষ্য। কাম আর প্রেমের সাধারণ বিভিন্ন লক্ষণ আছে কি?

গুরু। উভয়ের স্বরূপ লক্ষণ বিস্তর বিভিন্ন আছে। লৌহ আর কাঞ্চনে যে প্রভেদ, কাম আর প্রেমে সেই প্রভেদ। আপনার ইন্দ্রিয়ের সুখ-ইচ্ছা কাম, আর ঈশ্বরের প্রীতি-ইচ্ছা প্রেম। আপনার সুখ-তাৎপর্য্যভাব কাম,—আর ঈশ্বরের সুখতাৎপর্য্যভাব প্রেম। কাম অন্ধতম—প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।

গোপীপ্রেম সেই নির্ম্মল ভাস্কর। তাহারা নিজ সুখের জন্য কিছুই করিত না—কৃষ্ণ-সুখই তাহাদের লক্ষ্য এবং আনন্দ। আপন ভুলিয়া, আত্মসুখ ভুলিয়া—বৈধী ক্রিয়া-কলাপ ভুলিয়া, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও বৈধীমার্গ ভুলিয়া তাহারা কৃষ্ণসুখের জন্য উন্মত্ত হইত। কৃষ্ণ সুখী হইলেই তাহাদের সুখ হইত। সেই জন্যই গোপীপ্রেম আদর্শ—গোপী-ভাব জীবের উন্নত ও চরম ধর্ম্ম।

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

অনন্তর গোপরামাগণ প্রেমধর্ষিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"প্রিয়তম! ত্বদীয় যে কোমল পাদপদ্ম আমরা স্তনোপরি সম্মর্দ্দনাশঙ্কায় ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই পদদ্বারা তুমি অধুনা বনে বিচরণ করিতেছ; ত্বদীয় সেই পাদপদ্ম কি সূক্ষ্ম প্রস্তরাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? বোধ হয়, অবশ্য বেদনা বোধ হইতেছে;—ইহা চিন্তা করত আমাদিগের বুদ্ধি অতীব বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে;—কেন না, তুমিই আমাদিগের পরমায়ু।"

ইহাতে কি বুঝিলে? ইহা কাম, না আত্মবিসর্জ্জনাকাশের বিশুদ্ধ হৈমপ্রেম? গোপীগণ সুখ-দুঃখ বিচার করিতেন না,—কেবল কৃষ্ণ-সুখহেতু সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন;—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ॥

"হে বন্ধো! তাঁহাদিগের (গোপীদিগের) চিত্ত মৎপ্রতিই আসক্ত;—আমিই তাঁহাদিগের প্রাণস্বরূপ। আমার জন্যই তাঁহারা পতি-পুত্র প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, আমিই তাঁহাদিগের প্রিয়;—শ্রেষ্ঠ ও আত্মা-স্বরূপ। তাঁহারা চিত্তযোগে আমাকেই লাভ করিয়াছেন।"

শিষ্য। ইহাতে বোধ হয়, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে;—তাঁহারা সর্ব্বদাই নিজাঙ্গরাগ ও দেহশোভা বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহারা দধি দুগ্ধ মাখনাদি ভোজন করিতেন;—বনের সুগন্ধি কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতেন,—কবরীর ভূষণ করিতেন। ভাগবতাদি গ্রন্থে এমন পরিচয় পাওয়া যায়।

গুরু। গোপীগণ উহা ভগবানের সুখের জন্যই করিতেন;—আত্ম-সুখের জন্য নহে।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"পার্থ! যে সমস্ত গোপিকা আপনাদিগের অঙ্গকেও মদীয় ভোগ্য বলিয়া যত্ন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত গোপিকা ব্যতীত মদীয় নিগূঢ় প্রেমপাত্র আর অন্য কেহ নাই।"

গোপী-ভাবের স্বভাব আরও এক অদ্ভুত;—যাহা সাধারণবুদ্ধির গোচর নহে। গোপীগণ যখন কৃষ্ণদর্শন করেন, তখন তাঁহাদের নিজসুখ-বাঞ্ছা না থাকিলেও কোটিগুণ সুখ অনুভব করিতেন। ভক্তের দর্শনে ভগবানের আনন্দ হয়,—আবার ভগবান্ দর্শনে ভক্তের অনন্তগুণ আনন্দ লাভ হয়। গোপীর সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান—আবার তত্ত্বমসি জ্ঞানানন্দে বিভোর ভক্তদর্শনে ভগবানে প্রফুল্লতা—তদ্দর্শনে

অর্থাৎ 'আমায় দেখিয়া আমার কৃষ্ণ সুখী' এই ভাবিয়া গোপীর অপর্য্যাপ্ত আনন্দ। গোপীর রূপ-গুণে কৃষ্ণ আনন্দিত হন—কৃষ্ণানন্দে গোপীর প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে। এই প্রকারে গোপীশোভা ও কৃষ্ণশোভা পরস্পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

গোপীপ্রেমের আর এক স্বাভাবিক ভাব এই যে, তাহা কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টিবিধান করে—এবং বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ বৃদ্ধি করে। কিন্তু আত্মসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ না থাকায় তাহা নিরুপাধিক ও কামানন্দশূন্য।

আমি তোমাকে এস্থলে এই সম্বন্ধে একটী কবিতা শুনাইব। ভরসা করি, তুমি তাহাকে বৈষ্ণব পদাবলি বলিয়া উপহাস করিও না। তাহা কোনরূপ প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করিতে বলিতেছি না; উহা কেবল গোপীপ্রেমের মহাভাব বুঝাইবার জন্য বলিব।

কৃষ্ণপ্রেম-ভিখারিণী পাঁচটি রমণী কৃষ্ণকে না পাইয়া একদা নিকুঞ্জে বসিয়া তাঁহার জন্য ভাবিতেছিল। সেই পথে এক বৈধীভক্তিপরায়ণ সাধুপুরুষ গমন করিতেছিলেন। গোপীপ্রেমভজনকারিণীগণের সহিত সাধুর সাক্ষাৎ হইলে যে কথোপকথন হয়, তাহাই প্রেমিক কবি কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠ করিলে গোপী-প্রেমের উপাসনা ও বৈধী ভক্তির উপাসনাগত পার্থক্য বুঝিতে পারিবে।

নিকুঞ্জে বসিয়া, সেই সব নারী।
সকলে কালার, পীরিতি ভিখারী॥

* * * *

হেনকালে সেই, পথে চলি যায়,
মহাসাধু তপধারী।
কৌপীন পরেছে, মাথা মুড়ায়েছে,
অঙ্গে লেখা "কৃষ্ণহরি॥"

নিকুঞ্জ-তলায়, দেখে সব বালা,
রূপেতে করেছে আলো।
বদন কমল, সরল নির্ম্মল,
প্রেমে আঁখি টলমল॥
সাধুরে দেখিল, সকলে উঠিল,
প্রণমিল তাঁর পায়ে।
বলে—"কৃষ্ণধনহারা, বেড়াই বিপিনে,
বল, পাব কি উপায়ে॥"
তাদের বদন, করি নিরীক্ষণ,
সাধু-আঁখি ছল ছল।
বলিছে দুঃখেতে,— "শুন অবোধিনি,
কৃষ্ণ কোথা পাব বল॥
সহস্র বৎসর, তপস্যা করিয়া,
ধ্যানে নাহি মিলে যাঁরে।
নিকুঞ্জে বসিয়া, কুসুম গাঁথিয়া,
কিসে পাবি তোরা তাঁরে?"

কুলকামিনী বলিতেছেন :—

"কৃষ্ণহেন ধন, অমনি না মিলে,
তাহা মোরা বেশ জানি।
যা তুমি বলিবে, সকলি করিব,
কৃষ্ণলাগি দিব প্রাণী॥"

সাধু কহিতেছেন॥—

"উপবাস করি, শরীর শুখাও,
তবে কৃষ্ণ-কৃপা পাবে।

কৃষ্ণের করুণা, ক্রমে বাড়ি যাবে,
যত দেহ শীর্ণ হবে ॥"

* * * *

অবাক হইয়া, যত নববালা,
মুখ চাহা-চাহি করে।
"মোরা দুঃখ পাব, কৃষ্ণ সুখী হবে,
এ'ত কভু হ'তে নারে ॥
দুখের কাহিনী, শুনিলেই তিনি,
কান্দি হন আত্মহারা।
দুখ মোরা নিব, তাঁরে কান্দাইব,
এ ভজন কেমন ধারা?"

* * * *

সাধু হাসিয়া কহিতেছেন ঃ—

"কেশের মমতা, ঘুচাইতে হবে,
মুড়াইতে হবে মাথা।
তুলসী-তলাতে, মস্তক কুটিলে,
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ পিতা ॥"

* * * *

চমকি শুনিয়া, মুখ চাহাচাহি
করে সব নববালা।
যে রস-রঙ্গিণী, বলে—"সাধু শুন,
একি কথা শুনাইলা?
কেশ ঘুচাইব, বেণী না বাঁধিব,
কোথা গুঁজি থোব চাঁপা

মালতীর মালা, চিকণ গাঁথিয়া,
কেমনে বেড়িব খোঁপা ?
সে ভঙ্গিম বেণী, রসিক-শেখর,
দেখি যত সুখ পাবে।
তার মন জানি, রসে যত সুখ,
উপবাসে তা না পাবে॥"

কাঙ্গালিনী কহিতেছেন;—
"রাঙ্গা পদ ধুই, নয়নের জলে,
মুছাইয়া থাকি কেশে।
কেশ মুড়াইব, বন্ধু-পদ ধুয়ে,
মুছাইব বল কিসে ?"

কুলকামিনী কহিতেছেন,—
"যোগ-যাগ করি, তারে ভুলাইব,
সেতো মোর পর নয়।
স্নেহ সেবা করি, তাহারে তুষিব,
সে যে মোর স্বামী হয়॥"

প্রেমতরঙ্গিণী কহিতেছেন:—
"বিরহে যখন, বড় দুঃখ পাই,
কেশ এলাইয়া দেখি।
সেই কেশ মোর, কৃষ্ণেরে স্মরায়,
মুড়াতে নারিব সখি॥"

সজলনয়না কহিতেছেন:—
"কেশ মুড়াইয়া, কৌপীন পরিয়া,
ধরিলে দুঃখিনী-বেশ।

কান্দিয়া আকুল, হবে কালাচাঁদ,
আমি তারে জানি বেশ॥"

রসরঙ্গিণী বলিতেছেন :—

"শুন সাধু শুন, সন্দেহ হ'তেছে,
তুমি কৃষ্ণ বল কারে।
সেই কৃষ্ণ বা কে, তোমার সহিত,
কিবা সে সম্বন্ধ ধরে ?"

সাধু কহিতেছেন,—

"শুন অবোধিনি, কৃষ্ণ নহে দুই,
তিনি হন সর্ব্বেশ্বর।
তুষিলে সম্পদ, রুষিলে বিপদ,
সবাপরে দণ্ডধর॥
তাঁহারে তুষিতে, কত দুঃখ পাই,
তবু না তুষিতে পারি।
নিয়ম তাঁহার, পাছে ভঙ্গ হয়,
এই ভয়ে ভেবে মরি॥"

*   *   *   *

সাধুর বচনে প্রফুল্ল বদন।
বিনয়ে সকলে কহিছে তখন॥
"তোমার বচনে প্রাণ গিয়াছিল।
এখন বুঝিনু, পরাণ আইল॥
যাঁর কথা তুমি কহিলে এখন।
তিনি যিনি হৌন প্রাণনাথ নন॥

আমাদের পতি শ্রীকৃষ্ণ যে হন।
দণ্ডধারী কিবা বরদাতা নন॥
মোরা নিজ জন তাঁর পরিবার।
সকলি মোদের যত কিছু তাঁর॥
তাঁর কাছে চাব কিবা কারণেতে।
ভাণ্ডারের চাবি আমাদের হাতে॥
দণ্ড কথা শুনে, ভয় লাগে মনে।
মোরা সব তাঁর, দণ্ড দিবে কেনে?
যদি অত্যাচার করি রোগ হয়।
নিজ জনে তিক্ত ঔষধ খাওয়ায়॥
কখন বা ব্রণে ছুরিকা হানয়।
কেবা বল তারে দণ্ড বলি কয়?
কেবল মঙ্গল সেই প্রাণনাথ।
কত করি তাঁর উপরে উৎপাত॥
নিজজনে যদি না করে শাসন।
তবে বল আর করে কোন্ জন?
স্নেহে যদি দণ্ড করে প্রাণনাথ।
দণ্ড সে'ত নয় পরম প্রসাদ॥

আরও শুন—

তোমরা পুরুষ রাজসভা যাহ।
স্বার্থের লাগিয়া তাঁর কর দেহ॥
আমাদের কর যদি দিতে হয়।
আমাদের পতি দিবেন নিশ্চয়॥

কিবা করে দণ্ড কিবা পুরস্কার।
পতি জানে, তাতে নাহি অধিকার॥
যদি কাজ থাকে সে রাজার সনে।
আমরা রমণী প্রাণনাথ জানে॥
আমাদের দায় বঁধুরে দিয়াছি।
দেহ প্রাণ মন সে পদে স'পেছি॥
সেই কৃষ্ণ রাজা সেবিতে নারিব।
রাজসভা গেলে ভয়েতে মরিব॥
পুরস্কার লাগি রাজসভা যাব।
সরলা রমণী নাহি জানি স্তব॥
তুমি সাধু ঋষি কিবা হও মুনি।
তোমার চরণে কি বলিতে জানি?
আমরা সংসারী পতি-ঘর করি।
সংসার বাহিরে যাইবারে নারি॥
কৃষ্ণ প্রাণনাথ গিয়াছে ছাড়িয়া।
বেড়াই তাঁহারে বিপিনে খুজিয়া॥
এই বনমাঝে লুকাইয়া থাকে।
কহ কৃপা করি দেখেছ কি তাঁকে॥
তখন, বালাগণে দেখি নির্ম্মল সরল।
সাধুর আইল নয়নেতে জল॥
বলে,—"বালাগণ, করি নিবেদন।
ভাল নাহি বুঝি তোদের বচন॥
তোমাদের পতি কিবা তার রূপ।
বুঝাইয়া বল কি তার স্বরূপ॥"

একথা শুনিয়া যত সখীগণ।
আনন্দে মগন, প্রফুল্ল বদন॥

রসরঙ্গিণী কহিতেছেন,—

"কমলনয়ন, সুচাঁদ-বদন,
মোর পতি বনমালী।
সেই! সেই! সেই! মজাইল কুল,"
সবে দেয় করতালি॥
"শুন সাধু শুন, অগণন গুণ,
কেমনে বলিব তায়।"
"কৃতার্থ করিলে," বলি কাঙ্গালিনী,
ধরে রঙ্গিণীর পায়॥
সজল-নয়না, গুণ কহিবারে,
কণ্ঠরোধ হ'ল তার।
প্রেম-তরঙ্গিণী, ধরিয়া তাহারে,
চুম্বে মুখ বারে বার॥
কুলবালা উঠি, বলে, সখি শুন,
একবার নৃত্য করি।
তোমরা সকলে, করতালি দিয়ে,
মুখে বল হরি হরি॥"
হেলিয়া দুলিয়া, নাচিতে লাগিল,
ভূমে এক পদ রাখি।
নিজ দুঃখ ভুলি, দিয়া করতালি,
নাচে যত সব সখী॥

সেই সঙ্গে সাধু, নাচিতে লাগিল,
ভববন্ধ গেল তার।
বলরাম দাস, লিখিয়া লিখিয়া
শুধিল গৌরাঙ্গ-ধার ॥

এই কবিতাটির আদ্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছ কি?

শিষ্য। সমস্ত না পারিলেও কিছু কিছু পারিয়াছি।

গুরু। যদি কিছু পারিয়া থাক, তবে গোপী-প্রেমের সাধনা ও স্বরূপও কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছ। কি বুঝিয়াছ, বল দেখি?

শিষ্য। যিনি সাধু, তিনি শাস্ত্রের শাসন মানিয়া বিধিবিহিত ক্রমে কৃষ্ণের উপাসনা করেন। এ উপাসনার উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়। তিনি শাসক, পালক ও বরদাতা। আর গোপীভাবে ভজনকারিণী রমণীগণ প্রেমে তাঁহাকে কান্তরূপ ভাবেন—বনে তাঁহাদের ভজন। এ ভজনের উপাস্য দেবতা রাসেশ্বর রসিকশেখর দ্বিভুজ মুরলী-ধর শ্যামসুন্দর। তিনি তাহাদের সখা ও পতি। তাহারা তাঁহাকে প্রাণের মানুষ বলিয়া জানে,—প্রিয়তম বলিয়া ভাবে। গোপীপ্রেম মধুরতর। এই ভজনই জীবের বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ স্থলে আমার একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে।

গুরু। তাহা কি?

শিষ্য। তাহা এই যে, গোপীপ্রেম স্ত্রীজনেরই সাধন-পথ, না পুরুষেরও ঐ পথে সাধন হইতে পারে?

গুরু। একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

শিষ্য। রমণীগণই পত্নী হইতে পারে। পুরুষগণ কি হইবে?

গুরু। এই বুদ্ধিতে তোমরা জগতের রহস্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে

চাও? মূর্খ! পুরুষ কে? পুরুষত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। জীব পুরুষ হইলেই মুক্ত। স্ত্রী-পুরুষ, কথার ভেদ মাত্র। জগতে স্ত্রী-পুরুষের পীরিতি হয় —পীরিতি-বসে পুরুষ গড়িয়া ভজন হয়। পুরুষনামে অভিহিত জীব আপনাকে গোপী বানাইয়া এ ভজন করিতে পারে। রমণীরাও পারে।

ঈশ্বর পুরাণ পুরুষ। জীব তাঁহার নিজ দাস। স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, ভেদমূলক প্রাণ লইয়া কেহই সে পথে যাইতে সক্ষম হয় না।

স্ত্রী পুরুষ ভুলিয়া যাইতে হয়। তারপরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইহার যে কোন ভাবে বা কায়মনোভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হয়। সে সকল তত্ত্ব ইহার পরে বলা যাইবে, এক্ষণে তাহা অনধিকার চর্চ্চা। কারণ, জ্ঞান না দিলে অধিকার হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঋষিপত্নী।

শিষ্য। অতঃপর কৃষ্ণলীলাত্মক অন্য প্রধান ঘটনার কথা বলুন।

গুরু। একদা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও বয়স্যগণের সহিত যমুনাপুলিনের পথ দিয়া অতি দূরে গোচারণার্থ গমন করিতেছিলেন। তখন নিদাঘ-কাল; মধ্যাহ্নকাল অতিক্রম হয় হয়,—সঙ্গে কোনরূপ আহার্য্য ছিল না। অন্যান্য গোপবালকগণ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তাঁহারা যেখানে গোরু চরাইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার অদূরে ব্রাহ্মণগণ আঙ্গিরস সত্র নামক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণকে বলিলেন,—"যজ্ঞস্থলে গমন কর এবং আমার

ও দাদা বলরামের নাম করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অন্ন চাহিয়া আন, আমরা সকলে তাহা ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিব।"

কৃষ্ণবাক্যে কোন বিচার না করিয়া গোপবালকগণ যজ্ঞস্থলে গমন করিল এবং কৃষ্ণ বলরামের নাম করিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল। ব্রাহ্মণগণ ক্রমভঙ্গভয়ে তখন অন্ন দিতে সক্ষম হইলেন না। গোপবালক বলিয়া কোন কথা বলাও প্রয়োজন মনে করিলেন না। বালকেরা ফিরিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিল, এবং সমুদয় কথা নিবেদন করিল।

কৃষ্ণ বলিলেন,—তোমরা আর এক কাজ কর। অন্তঃপুরে যাও, ঋষিপত্নীগণের নিকট আমার নাম করিয়া অন্ন প্রর্থনা করিয়া আন। তাঁহারা স্নেহময়ী ও কোমলহৃদয়া, আমাদের ক্ষুধার কথা শুনিলেই অন্ন দান করিবেন।

ব্রজবাসীদের কাছে কৃষ্ণবাক্য বেদবাক্য হইতে প্রধান। কৃষ্ণ-আজ্ঞায় তাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে—সাপের মুখে, বাঘের মুখে যাইতে পারে। তাহারা সে আজ্ঞা পালন করিবেন।

ঋষিপত্নীগণ গোপবালকদিগের নিকটে শুনিতে পাইলেন,—নবনট-বর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আবাসের অদূরে আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল,—কৃষ্ণরাগে হৃদয় রঞ্জিত ছিল। তাঁহারা প্রচুর অন্নব্যঞ্জন গোপবালকদিগের দ্বারা পাঠাইয়া দিয়া সমুদ্রসঙ্গমে প্রবাহিতা নদীর ন্যায় আপনারা কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইলেন। গমনকালে তাঁহাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতৃ ও বন্ধুগণ সকলেই নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন হইতে তাহারা বলরাম শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তদগতপ্রাণা হইয়াছিল,—তাহারা কাহারও কথা শুনিল না, কাহারও বাধা মানিল না। তাহারা কৃষ্ণসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া সে রূপসুধা পান করিল। তাহারা দেখিল ;—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য-বর্হং
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজ্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥

"তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ, পরিধান পীতাম্বর। বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু এবং প্রবাল এই সকলে বেশ নটবৎ; অনুব্রতি সখার স্কন্ধে এক হস্ত বিন্যাস করিয়া আছেন। অন্য হস্তে লীলা হেতু লীলাকমল ঘুরাইতেছেন। কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপালে অলকা, এবং মুখকমলে মনোহর হাস্য বিকশিত।"

সে রূপ-সুধাপানে চকোরীগণের পরিতৃপ্তি হইল। তাহারা পরম আনন্দে বহির্জগৎ ভুলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণরূপ-সাগরে সমাধিস্থ হইল।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত। তাহাদের হৃদয় জানেন। তাহারা যদিও তদ্গতপ্রাণা, কিন্তু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মধুরের পথে যাইতে পারে নাই। তাহারা দাস্য পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥

মহাভাগাগণ, আপনাদের শুভাগমন হউক। আপনারা উপবেশন করুন। আমি আপনাদের কি করিতে পারি বলুন? আপনারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমার দর্শন-ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন, তাহা এখন সম্পন্ন হইল। আর এরূপ ইচ্ছা সঙ্গত বটে। কেননা—

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ।
অহেতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥

"যে সকল ব্যক্তি বিবেকী, বিবেকদ্বারা আপনার অর্থ দেখেন, তাঁহারা প্রিয় আত্মাস্বরূপ আমাতে সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধানরহিত নিরন্তরা ভক্তি করিয়া থাকেন।"

প্রাণ-বুদ্ধি-মনঃ-স্বাত্মদারাপত্য-ধনদায়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বপরঃ প্রিয়ঃ॥

"আত্মার সম্পর্কেই প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জাতি, দেহ, দার, অপত্য ও ধনাদি প্রিয়। সেই আত্মা অপেক্ষা আর কি প্রিয় হইতে পারে?"

রমণীগণের সহিত কথা কহিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মভাব ধারণ করিতেন—প্রকৃতির দর্শন মাত্র করিতেন না। অর্থাৎ দেহাদি সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের আত্মার সহিত সম্ভাষণ করিতেন। তিনি নারীদিগকে নারী বলিয়া জানিতেন না—মানব মানবী সকলকেই তিনি জীবাত্মারূপে গ্রহণ করিতেন। আর নিজে পরমাত্মভাব ধারণ করিতেন। এই কারণেই তিনি মহাযোগেশ্বরেশ্বর। জীবাত্মা যে পরমাত্মার মিলনাশায় উন্মত্ত হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন নিত্য ও নিত্য সুখাবহ।

কিন্তু যে সকল রমণীর নিজদেহ বলিয়া জ্ঞান আছে, প্রাকৃতিক গন্ধ যেখানে বিদ্যমান আছে,—সেখানে মিলন অসম্ভব। নরনারীর ভেদ থাকিলে, সে ভেদের রাজ্যে এ মধুর মিলন অসম্ভব। বিশেষতঃ ঋষি-পত্নীদিগের তখনও দাস্যভাবের অবস্থা,—তখন তাঁহার সাযুজ্যলাভের অধিকার তাহাদের হয় নাই। ভেদভাব তখনও তাহাদের যায় নাই। তাই ভগবান্ বলিলেন :—

তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥

"এখন তোমরা দেবযজ্ঞস্থানে গমন কর। তোমাদের পতিগণ গৃহমেধি ব্রাহ্মণ। তাঁহারা সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিবেন।"

তখনও ঋষিপত্নীগণের কুলের আশঙ্কা ছিল, স্বামী পুত্রের ভাবনা ছিল,—মানাপমান জ্ঞান ছিল। বিধি-নিষেধের ভয় ছিল। তাঁহারা কৃষ্ণ-আজ্ঞায় গৃহে ফিরিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে একটু ভয় হইতেছিল। তাই তাঁহারা পরমাত্মা কৃষ্ণকে বলিলেন :—

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং,
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদামপদাবসৃষ্টং,
কেশৈর্নিবোঢ়ুমবিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥
গৃহ্নন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতো বা,
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো,
নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্বিধেহি॥

"হে বিভু, আপনি এরূপ নৃশংস বাক্য বলিবেন না। বেদের বাক্য সত্য করুন। আমরা সমস্ত বন্ধুবর্গকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দাসী হইবার নিমিত্ত আপনার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছি। "ন পুনরাবর্ত্ততে" এ ত আপনারই বাক্য। "ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি" এ ত আপনারই প্রতিজ্ঞা। এখন যদি আমরা গৃহে গমন করি, তাহা হইলে আমাদের মাতা, পিতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, সুহৃৎ কেহই আমাদিগকে গ্রহণ করিবে না। আমরা আপনার পদাগ্রে পতিত। আমাদের স্বর্গাদি না হউক,—

আমরা তাহা প্রার্থনাও করি না ; আপনার দাসীবৃত্তিই এখন আমাদের একমাত্র গতি। এখন সেই গতি আমাদের বিধান করুন।”

ভগবান্ বলিলেন,—তোমাদের সে ভয় নাই। যোগমায়া আমার সঙ্গে সঙ্গে। তোমাদের স্বামী পুত্র ও বন্ধুগণ তোমাদিগকে কিছু বলিবেন না,—তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। আর এক কথা--

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥

তোমরা দাসী হইয়া আমার নিকট থাকিতে চাহ। হয়ত তোমরা আমার অঙ্গসঙ্গের প্রার্থী। কিন্তু অঙ্গসঙ্গে সুখ কোথায়? প্রেম মনের কাজ। মনের মিলনই মিলন। শরীরের সম্বন্ধ মুহূর্ত্ত স্থায়ী—মায়িক। তাহাতে অনুরাগেরও বৃদ্ধি হয় না। তোমাদের মন আমা ছাড়া করিও না। মনে মনে সর্ব্বদা আমাকে ভাবনা করিও—মনোমধ্যে নিয়ত আমার মূর্ত্তি ধ্যান করিও। ইহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

ঋষিপত্নীদিগের ভেদভাব দূর হয় নাই—মায়ার আবরণ অপসারিত হয় নাই—দৈহিক সুখ-দুঃখ কৃষ্ণে অর্পিত হয় নাই। এতদবস্থায় মধুরলীলা সম্ভব নহে। দাস্যভাবে মাধুর্য্যভাব আসে না। তাই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। ঋষিপত্নীরা গৃহে গমন করিলেন।

এখন হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, মাধুর্য্যরসে ভগবান্‌কে সাধনা করা বড় সহজ কথা নহে। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা চাই—তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া জ্ঞান হওয়া চাই। মায়িক জগতের সমুদায় তত্ত্ব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

শিষ্য। যদি অপরাধ ক্ষমা করেন, একটি কথা বলি।

গুরু। বল। সংশয় অপনোদনের জন্য গুরুর নিকট শিষ্য সকল কথাই বলিতে পারে।

শিষ্য। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সে কথাটা বলিতে ও শুনিতে যেন একটু মন্দ। কিন্তু অনেকে সে কথা বলে।

গুরু। অসঙ্কোচে সে কথা বলিতে পার।

শিষ্য। কথাটা এই যে, অনেকে বলে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম যেমন স্ত্রীলোকের হইত, এমন পুরুষের হইত না। ঋষিগণ তাঁহার নাম শুনিয়া গ্রাহ্যও করিল না,—কিন্তু ঋষিপত্নীগণ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রদান করিল, তার পরে তাঁহার জন্য ছুটিয়া মাঠে আগমন করিল। আবার কৃষ্ণবাক্যে বুঝিতে পারা গেল, তাহাদের কৃষ্ণ-অঙ্গসঙ্গ কামনাও ছিল।

গুরু। কথাটা সকলে বলে—কিন্তু ভাবিয়া দেখে না, তাই বলে। পুরুষাপেক্ষা রমণীহৃদয় স্নেহ দয়া মায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণে মণ্ডিত। তাহারা সহজেই পুরুষাপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণা। সহজ ভাব তাহাদের হৃদয়ে পুরুষাপেক্ষা অধিক। পুরুষগণ শুষ্কজ্ঞানে বিতর্কী—আত্মহারা। এখনও তুমি আমাদের গৃহে গৃহে সন্ধান কর,—দেখিবে, পুরুষগণ ধর্ম্মহারা—ব্যভিচারী, কিন্তু স্ত্রীলোক এখনও ক্রিয়াকর্ম্মে সুনিপুণা। এখনও যে হিন্দুর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, ধূপদীপ প্রজ্বলিত হয়,—তাহা রমণীর গুণে। এখনও যে গৃহে গৃহে কুক্কুটমাংস রন্ধন হয় না, তাহা রমণীর গুণে। এখনও দেবপূজা ব্রত নিয়ম সম্পাদিত হয়, রমণীর গুণে। তাই রমণী মহামায়ার অংশ।

আরও এক কথা আছে। রমণীগণ সাধারণতঃ পরের জন্য কাজ করে। তাহাদের হৃদয় সাধারণত পরাধীন। পিতার বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী, কিন্তু তাহার বাড়ী কোথায়? স্বামীর সংসার—স্বামীর কাজ,—তাহার কাজও তাই। রমণী আপনার বলিয়া সারা সংসারকে জড়াইয়া লয় না।

কাজেই রমণী-হৃদয়ে সহজভাব সাধারণ। তাই রমণী আগেই কৃষ্ণ-প্রেমে মজিয়া পড়ে। তাই রমণীর আত্মবিসর্জ্জনতা লইতে পুরুষ রমণীর পূজা করিয়া থাকে—তন্ত্র তাই রমণীপূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

পুরুষগণ যখন আমির ছায়া ভুলিয়া রমণীর মত হৃদয় গ্রহণ করিতে পারিবে, তখনইত গোপীভাবের পথে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইবে। রমণী ধর্ম্মের সহায়—রমণী না থাকিলে পুরুষগণ অধর্ম্মের আগুনে নিত্য দগ্ধ হইত। রমণী মধুররসে পুরুষকে আপ্লুত করিয়া তাহার আদর মধুর করে—তারপরে দুইয়ে এক হইয়া ঈশ্বরসাধনে তৎপর হয়।

জগতে তখন শুষ্কজ্ঞানের সাধনা। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যজ্ঞের বৈধী শুষ্ক ব্যাপারে লিপ্ত—আকাশ দেবোপাসনার যজ্ঞধূমে তখন সমাচ্ছন্ন। তাহাদিগকে মাধুর্য্যরসের পথে ফিরাইতে হইলে তাহাদের ধর্ম্মসহায় রমণীগণকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। তাঁহারা নিত্য সহজ—তাই রমণীগণ তাঁহার চরণসমীপে আশ্রয় লইল।

যখন তাহারা পরমাত্মার নিকট হইতে ফিরিয়া গেল,—তখন তাহাদের স্বামী বিপ্রগণও বুঝিতে পারিল—বৃথা যজ্ঞধূমে চক্ষু কলুষিত করা। বৃথা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। বৃথা মানবজন্ম ধারণ করা। শ্রীকৃষ্ণ এই মধুর ধর্ম্ম অনবদ্যভাবে প্রকট করিবার জন্য ঋষিদের চিত্তে আপন অধিকার বিস্তার করিয়া যথোচিত ভাবে প্রেরণা করিলেন। সেই প্রেরণায় তাঁহারা পত্নীদিগের দোষ দর্শন করিলেন না, তাহাদিগকে আদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আপনাদিগের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন :—

ধিগ্ জন্ম ধিক্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিক্কুলং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥

অতঃপর তাঁহারা হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের মধুর ভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রযজ্ঞ ও গোবর্দ্ধন ধারণ।

শিষ্য। এইবার ইন্দ্রযজ্ঞ ও গোবর্দ্ধন ধারণের কথা বলুন।

গুরু। হাঁ, বলিতেছি—শ্রবণ কর।

গোপগণ বর্ষে বর্ষে ইন্দ্রযজ্ঞ করিত। ইন্দ্র বর্ষণ করেন, তাহাতে গাভীসকলের আহার্য্য জন্মে,—ভূমি শস্যশালিনী হয়। ইন্দ্রযজ্ঞ করিবার সময় উপস্থিত হইল। নন্দাদি গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন,—বৃন্দাবনে এক মহা উৎসবের আয়োজন হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপতি নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কার্য্যতাং মে পিতঃ কোহয়ং সংভ্রমো ব উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ॥

"হে পিতঃ! সারা বৃন্দাবন জুড়িয়া কাহার উদ্দেশ্যে এই মহা উদ্যোগ হইতেছে? এই যজ্ঞ করিলে কি ফললাভ হইবে? আর কি প্রকারেই বা এই যজ্ঞ সাধন করিতে হইবে?"

নন্দ বলিলেন—

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ॥

তং তাত বয়মন্যে চ বার্ম্মুচাং পতিমীশ্বরম্।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ॥
তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জ্জন্যঃ ফলভাবনঃ।
য এবং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্॥

নন্দ কহিলেন—"হে তাত! ভগবান্ ইন্দ্র পর্জ্জন্যরূপী; মেঘসকল তাঁহার প্রিয়মূর্ত্তি। সেই সকল মেঘ প্রাণিগণের প্রীতিজনন এবং জীবন-কারণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা এবং অন্যান্য মানবগণ মেঘপতি ঈশ্বর সেই ইন্দ্রকে তাঁহারই বর্ষণ করা বারিতে সমুৎপন্ন দ্রব্যজাত দ্বারা যজ্ঞ করত অর্চ্চনা করিয়া থাকি। তাহার অবশিষ্ট অংশ দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ নিমিত্ত সকলের জীবিকা কল্পিত হয়। হে বৎস! কৃষ্যাদি দ্বারা জীবিকা হয়, এমত বলিতে পারা যায় না। কারণ পর্জ্জন্য পুরুষদিগের পুরুষকার সকলের ফল সাধন অর্থাৎ বারিধরের বারিবর্ষণ ব্যতিরেকে কৃষ্যাদি কদাপি সফল হইতে পারে না। হে তাত! এই ইন্দ্রার্চ্চন ধর্ম্ম পারম্পর্য্যাগত আচারপ্রাপ্ত,—যে মানব কাম অথবা দ্বেষ কিম্বা ভয় বা লোভ হেতু এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার কথনই কল্যাণ হয় না।"

ভগবানের সে যজ্ঞ অভিপ্রেত নহে। তিনি যে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, সে ধর্ম্মে যাগ-যজ্ঞ নাই। কাম-কামনা নাই। সেখানে নির্ব্বেদ অহৈতুকী প্রেম। তাই তিনি যজ্ঞের বিরোধী হইয়া নন্দাদি গোপগণকে বলিতে লাগিলেন :—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥

"জীবমাত্র কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং কর্ম্মদ্বারাই বিলয় পাইয়া থাকে। কর্ম্মদ্বারাই তাহার সুখ-দুঃখ, ভয় ও মঙ্গলবিধান হয়।"

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপী ন কর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥

"স্বয়ং কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়াও অন্য জীবদিগের কর্ম্মফলদাতা কোন ঈশ্বর যগ্যপি থাকেন, তিনিও কর্ম্মফল দান দ্বারা কর্ত্তারই ভজনা করেন। কেন না, যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করে, তিনি তাহার প্রভু নহেন, অর্থাৎ তাহাকে ফল দিতে পারেন না।"

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্॥

"মানুষ স্ব স্ব কর্ম্মের অনুবর্ত্তী। ইন্দ্র তাহাদিগের কি পারে? দেবতারা শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি প্রদান করেন, এবং মানুষ সেই প্রবৃত্তির সাহায্যে উত্তম কর্ম্ম করিয়া থাকে,—একথা বলিতে পার; কিন্তু তাহা নহে। দেবতারাও প্রাক্তন সংস্কারের অন্যথা করিতে পারেন না। সংস্কারানুযায়ী প্রবৃত্তিই তাঁহারা প্রদান করিতে সক্ষম।"

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

"মানবের প্রবৃত্তি সংস্কারাধীন। মানুষ সংস্কারের অনুবর্ত্তন করে। দেবতা, অসুর, মনুষ্য সকলেই আপন সংস্কারে অবস্থিত।"

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎস্বজতি কর্ম্মণা।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥

"কর্ম্মদ্বারাই জীব উচ্চ নীচ দেহ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মদ্বারাই আবার দেহের বিনাশ সাধন হয়। শত্রু, মিত্র, উদাসীন সমস্তই কর্ম্ম। কর্ম্মই গুরু, কর্ম্মই ঈশ্বর।"

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥

"অতএব স্বভাবস্থ হইয়া স্বীয় কর্ম্মকারী পুরুষের কর্ম্মেরই পূজা করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যে যাহার দ্বারা বর্ত্তমান হয়, তাহার তাহাই দেবতা।"

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্য্যসতী যথা॥

"নতুবা যে ব্যক্তি একভাব অবলম্বন করিয়া অসতী রমণীর জার-সেবনের ন্যায় পুনরায় অন্যভাব সেবা করে, তাহার ঐ ব্যভিচারী ভাব কখনই কল্যাণকর হয় না।"

বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা-কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

"ব্রাহ্মণের বৃত্তি বেদাধ্যাপনাদি; ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি পৃথিবী রক্ষা; শূদ্রের বৃত্তি দ্বিজসেবা। বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ গ্রহণ—এই চারিপ্রকার বৃত্তি। কিন্তু আমাদের এক গোবৃত্তিই অবলম্বন।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবে।
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ ॥
রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥

"সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু। রজোগুণদ্বারা বিশ্ব উৎপন্ন হয়—তদনন্তর পরস্পর হইতে অন্যান্য বিবিধ জগৎ হইয়াছে। ঐ রজোগুণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মেঘসকল সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। প্রজাগণ সেই মেঘদ্বারাই জীবিত থাকে। মহেন্দ্র কি করিবেন ?"

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥

"পিতঃ! আমরা বনবাসী। বন ও পর্ব্বতে বসতি করি। গ্রাম-নগর গৃহ এসকলের বন্ধন আমাদের নাই। অতএব আমাদের কর্ম্মই বা কোথায় ?"

তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥

"অতএব যদি যজ্ঞ করিতেই হয়, তবে ইন্দ্রযজ্ঞ জন্য যে সকল দ্রব্যের আয়োজন হইয়াছে, তদ্দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও গোবর্দ্ধন গিরির যজ্ঞ আরম্ভ করুন। এই পাহাড়ের নামে যজ্ঞ করুন। ইন্দ্রযজ্ঞে কোন• আবশ্যকতা নাই।"

গোপগোপীগণ বেদ জানে না, কৃষ্ণবাক্যই তাহাদের বেদ বা পরম ধর্ম্ম। তাহারা কৃষ্ণবাক্যে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন গিরির

পূজা করিল। যে সকল উপচার ইন্দ্রযজ্ঞার্থে আহরণ করিয়াছিল,—তাহা পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে প্রদান করিল, এবং ব্রাহ্মণ, গো ও দরিদ্র-দিগকে দান করিল। বৃন্দাবন হইতে যজ্ঞবিধি বিদূরিত হইল।

শিষ্য। ইহা কি প্রকার হইল? শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে বলিয়াছেন :—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৩ অঃ, ৮—১৬ শ্লোঃ।

"পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হে প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও যজ্ঞ তোমাদিগের

কামনা পরিপূর্ণ করুক। এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর,—সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন;—এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে। দেবগণ যজ্ঞদ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভিলাষিত ভোগসকল প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবগণপ্রদত্ত ভোগ্যসকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া উপভোগ করে, সে চোর। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন; যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত (অন্ন) পাক করে, সেই পাপাত্মগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন বৃষ্টি হইতে, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে। কর্ম্ম বেদ হইতে, বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে;—অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে লোক ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, তাহার আয়ু পাপময় ও জীবন বৃথা।”

কিন্তু এক্ষণে ব্রজবাসিগণকে কি প্রকারে সেই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্তি করিলেন ?

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ। শাস্ত্রের কতক কথা মনে কর, কতক মনে কর না—ইহাইত তোমাদিগের দোষ। শাস্ত্রের সামঞ্জস্য না করিয়া তর্ক কর। উহাই যত জঞ্জালের মূল। যে শ্লোকগুলি তুমি আবৃত্তি করিলে, উহার পরের শ্লোক দুইটি আবৃত্তি কর, সকল গোল—সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে।

শিষ্য। হাঁ, আবৃত্তি করিতেছি।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ৩ অঃ, ১৭—১৮।

"আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ এবং আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহাকে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না। কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহার পুণ্য হয় না, কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার পাপ হয় না ;—তাঁহাকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না।"

গুরু। তবে বল, বৃন্দাবনবাসীর আবার দেবযজ্ঞ কেন? শ্রীকৃষ্ণই অন্যত্র বলিয়াছেন ;—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ৯ অঃ, ২৩ - ২৫।

"হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অন্যদেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থত বিদিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতপরায়ণ

ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূতসেবকেরা ভূত-সকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়। অতএব—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ৯ অঃ। ২৭।

"হে কৌন্তেয়! তুমি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যেরূপ তপঃসাধন করিয়া থাক, তৎ সমুদয় আমাকে অর্পণ করিও।"

এখন তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, যজ্ঞ কাহার জন্য, আর যজ্ঞ পরিত্যাগ কাহার জন্য। অধিকারী ভেদে কার্য্য;—বৃন্দাবনে যে ধর্ম্মবীজ রোপিত হইতেছে, তাহাতে যাগযজ্ঞ কর্ম্ম আদি কিছুই নাই। সেখানে কেবল প্রেম আর ভক্তি। সেখানে কেবল সর্ব্বস্ব লইয়া কৃষ্ণ-পদে অর্পণ।

কর্ম্মকাণ্ড—বৈদিক ক্রিয়া, ভেদের সংসার। কৃষ্ণসংসারে সে সকল কেন? বেদের যথার্থ অর্থ—বেদের লক্ষ্য – বেদের তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণ। তবে নিম্নস্তরে—অধম অধিকারীদিগের জন্য কর্ম্মকাণ্ড। যাহারা কৃষ্ণপদে সব সমর্পণ করিয়াছে—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুররসে যাহাদিগের কৃষ্ণোপাসনা, তাহাদিগের মধ্যে আবার দেবার্চ্চনা কেন? শ্রীকৃষ্ণের সংস্থাপিত ধর্ম্মে দেবযজ্ঞাদি নাই—সেখানে কেবল সর্ব্বস্ব লইয়া কৃষ্ণপদে অর্পণ।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ১৮। ৬১—৬২।

"যেমন সূত্রধর দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতসকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহরই শরণাপন্ন হও,—তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।"

ভক্ত নন্দাদিকেও তাহাই বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—যদি যজ্ঞ করিতেই হয়, তবে ঐ গোবর্দ্ধন পাহাড়ের পূজা কর। গো-ব্রাহ্মণাদি প্রাণিগণকে দান কর, - দেবার্চ্চন কেন? ভূতে ভূতে ভগবান্। বৃক্ষে লতায় ভগবান্। ভগবান্ নাই কোথায়?

ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণবাক্যে বেদবিধি পরিত্যাগ করিল,—তাহারা তাঁহার আদেশমতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ পাহাড়ে পর্ব্বতে, জলে স্থলে, অনলে অনিলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ভগবান্ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—ভক্তমনোরথ পূর্ণ করিতে—ভক্তের পূজোপহার গ্রহণ বরিতে তিনি "শৈলোঽস্মি" বলিয়া বৃহৎ বপু ধারণ করিলেন এবং ভক্তের দান গ্রহণ করিলেন। গোপগণ বিশ্বাস করিল—গোবর্দ্ধনগিরি তাহাদের পূজোপহার গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন,—গোপগোপীকে পবিত্র করিলেন,—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সত্ত্বময় করিলেন।

ইন্দ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলেন। দেবতা ক্রুদ্ধ হইলে প্রজার অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। ইন্দ্রদেব মেঘসমূহকে লইয়া ব্রজ ও গোপগোপীগণের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন।

যে সকল মেঘ প্রলয়াভিপ্রায়ে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা দেবরাজের ঐ প্রকার আজ্ঞায় বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া মহাবলে ধারাসম্পাত করত নন্দের গোকুল নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। বিদ্যুৎসমূহ দ্বারা বিদ্যোতন ও ভূরি ভূরি অশনি দ্বারা গর্জ্জন করত আবহ প্রবহাদি প্রবল বায়ুসমূহে প্রেরিত হইয়া করকা বর্ষণ করিতে লাগিল। জলধরসকল স্থূণাবৎ স্থূল জলধারা অজস্র বর্ষণ করিতে থাকিল, সুতরাং ভূমি জলরাশিতে আপ্লাবিত হইল,—তখন কোন্ স্থান নিম্ন এবং কোন্ স্থান উন্নত,—তাহা দৃষ্ট হইল না। অত্যর্থ বারিধারা পতন ও প্রবলতর পবনবহনে যাবতীয় পশু কাতরকলেবর এবং গোপ-গোপীগণ শীতে সাতিশয় আর্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল। গোপ-গোপীগণ অন্য দেবতার আশ্রয় চাহে না,—অন্য দেবতার সহায়তা চাহে না। তাহারা জানে শ্রীকৃষ্ণ। তাই আর্ত্তস্বরে কৃষ্ণকে বলিল;—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল॥

"হে কৃষ্ণ! হে প্রভু! হে মহাভাগ! তুমিই একমাত্র গোকুলের নাথ। ভক্তবৎসল,—কুপিত ইন্দ্র হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

অনন্তদেব আজি অনন্ত হইলেন। এক দিকে দিক্‌পাল—একদিকে দেবশক্তি—অপরদিকে ভক্ত গোপ-গোপী। একদিকে বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও বেদের দেবতা—অপরদিকে বেদাতীত ভগবান্ ও বেদাতীত ভক্ত। ঈশ্বরদত্ত অধিকার ও ঈশ্বর—উভয়ে বিরোধ। হুঙ্কার করিয়া মেঘমন্দ্রস্বরে ভগবান্ বলিলেন;—

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ॥

"আমি আত্মযোগ দ্বারা ইহার সম্যক্ প্রতিকার করিব। যাহারা মূঢ়তাবশতঃ লোকপাল বলিয়া অভিমান করে—আমি তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য-অভিমান নাশ করিব।"

কেন না, রসাশ্রয়ে জগৎ সুশীতল হউক,—ইহাই ভগবদিচ্ছা। এই ইচ্ছায় জগতের রজোগুণ বিনাশ।

ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরানামীশ বিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে॥

"সত্ত্বগুণে দেবতা। ঈশ্বরের অভিমান করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমিই অসদ্ভাবাপন্নের অভিমান নাশ করি। এই মানভঙ্গের দ্বারাই তাহারা শান্তি লাভ করে।"

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপয়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥

"এই গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন—আমি ইহার আশ্রয় ও নাথ। আপনার আত্মা দিয়াও ইহাকে রক্ষা করিব—প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রতিজ্ঞা সর্ব্বকাল। যে সর্ব্বস্ব ভগবানে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত—আত্মা দিয়াও ভগবান্ তাকে রক্ষা করেন। ভগবানের আত্মদান অর্থে ঐশীশক্তি প্রদান।

অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া বালকে যেমন ছত্র ধারণ করে, তাহার ন্যায় ধারণ করিলেন এবং ব্রজবাসিগণকে স্ত্রীলোক ও গাভী বৎস লইয়া তাহার তলদেশে গমন করিতে বলিলেন,—তাঁহারা কৃষ্ণ-আজ্ঞা পালন করিল।

ব্রজবাসিগণ গো-বৎস, রমণী বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া এক সপ্তাহ কাল গোবর্দ্ধনতলে বাস করিতে লাগিল,—উপরে সেই প্রলয়কারী

দুর্যোগ বহিয়া যাইতে লাগিল—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে পর্ব্বত ধারণ করিয়া সেইভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রজবাসিগণ বালকের সেই শক্তি স্তব্ধবিস্ময় নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই যোগানুভব অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন—তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি যে সকল মেঘকে বর্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

আকাশ নির্ম্মল হইল। দিবাকর প্রকাশ পাইলেন, এবং দারুণ বাত-বৃষ্টি উপরত হইল অবগত হইয়া গোবর্দ্ধনধারী ভগবান্ হরি গোপ-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আর ভয় নাই, তোমরা বাহির হইয়া সুখে বিচরণ কর।"

তাহারা বাহির হইল,—কিন্তু কৃষ্ণের এই কার্য্যে, এই সৃষ্টিছাড়া লীলাদর্শনে সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের বয়স সাত বৎসর মাত্র। গোপবৃদ্ধ নন্দকে বলিলেন,—

ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে॥

"হে ব্রজনাথ! তোমার এই পুত্রের উপর আমাদের শঙ্কা হই-তেছে—জানি না, ইনি কি! কোথায় সাত বৎসর বয়স্ক বালক—আর কোথায় মহাদ্রি ধারণ!"

নন্দ বাৎসল্যানন্দে বিভোর। তিনি গোপদিগের সমক্ষে গর্গের গুপ্তকথা বলিয়া ফেলিলেন:—

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

"প্রতিযুগে ইনি শরীর ধারণ করেন। অন্যযুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ছিলেন। এখন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন।"

ব্রজের সকলেই জানিলেন—কৃষ্ণ ঈশ্বর। যিনি অপ্রকট ছিলেন, তিনি বৃন্দাবনে প্রকট হইলেন। গোমাতা সুরভি ও ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ বলিয়া অভিষেক করিয়া গেলেন।

সাত বৎসরে কৃষ্ণ পূর্ণতম ঈশ্বর—সাত বৎসরে তিনি কিশোর।

শিষ্য। ঈশ্বর যখন মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তিনি ঐশীশক্তিতে কাজ করিতে পারেন কি না?

গুরু। কেন পারেন না? যদি না পারেন, তবে তাঁহার পূর্ণতা রহিল কোথায়? মুখে তাঁহাকে পূর্ণ বলিব—আর ক্ষমতায় তাঁহাকে অপূর্ণ মানব গড়িব,—ইহা কোন্ দেশী পাণ্ডিত্য?

শিষ্য। মানিলাম, তিনি পূর্ণশক্তিমান্—ইচ্ছা করিলে তিনি সবই করিতে পারেন,—কিন্তু মানুষ হইয়া জন্মিয়া অতি প্রাকৃত কাজ কেন করিলেন?

গুরু। কেন করিলেন, কথাটার কৈফিয়ৎ তাঁহার নিকট লইলেই ভাল হয়,—ভরসা করি, তিনি মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস বুঝি কর না। কিন্তু শক্তি থাকিলে সামান্য শক্তিমানে যখন তাহা প্রকাশ করে, আর তিনি যে তাহা করিয়া কেন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইবেন, তাহা বুঝিতে পারি না। যোগের বিভূতি দ্বারা এখনও কতলোক কত অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন করিতেছেন—আর তিনি যোগেশ্বরেশ্বর হইয়া, যোগমায়ার অধিপতি হইয়া কেন যে তাহা না করিবেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারি না।

শিষ্য। ভাল, যদি তিনি অমানুষিকী ক্ষমতা দ্বারা কোন কাজ করিবেন, তবে অর্জ্জুনের সারথি-পদে নিযুক্ত হইয়া দিবারাত্র পরিশ্রম

না করিয়া অলৌকিক শক্তিবলে দুর্য্যোধনাদিকে ধ্বংস করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজত্ব প্রদান করিলেই পারিতেন।

গুরু। এইরূপেই কি তোমরা কৃষ্ণচরিত্র বুঝিয়াছ? যদি সেরূপ বুঝিয়া থাক, তবে বঙ্গদেশের মহা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরই বা তাঁহার কে, আর দুর্য্যোধনই বা তাঁহার কে? অরণ্যই বা তাঁহার কষ্টের কিসের? রাজত্বই বা তাঁহার সুখের কিসের? যে উদ্দেশ্যে—যে অভি-প্রায়ে তাঁহার অবতার গ্রহণ, তাহারই সংসিদ্ধিই প্রয়োজন। সেখানে তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা—ঐশ্বর্য্যলীলার অপ্রকটভাব। সে সকল কথা ঐশ্বর্য্যলীলায় সবিস্তারে বলিব। তবে এস্থলে বলিয়া রাখি যে, ধর্ম্মের এই নূতন ভিত্তিস্থাপনে ঐশীশক্তির প্রকাশ না করিলে, অপ্রকট মূর্ত্তিকে প্রকাশ না করিলে তাহা হইবে কেন?

মানুষের প্রতি কৃপা করিয়া গোলোকনাথ ঈশ্বররূপে প্রকট হইলেন। গোলোকপতির সহিত জীবের নিজ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল, জীবের জ্বলিত কণ্ঠে রসের ধারা পতিত হওয়ায় উপকার হইল। আর দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা থাকিল না—আর বেদবিধির সীমা—গভীর বাধাবিঘ্ন থাকিল না, মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের সকল জ্বালা বিদূরিত হইবে। জীব জানিতে পারিল—তিনিই মনের গতি, প্রাণের পতি।

জীব আনন্দে নৃত্য করিল। রসধারা উজান বহিল—ধরাজ্বর উপশমিত হইবার উপক্রম হইল। অপ্রকট রসিকশেখর রামকৃষ্ণ প্রকট হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাসের উদ্দেশ্য।

গুরু। এইবার আমরা অতি কঠিন সমস্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যাহা লইয়া কাম-কলুষিত জীবের বিবেচনায় কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা দূষ্য ও অশ্লীল ; যাহা লইয়া জ্ঞানী জীবের—কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্বধর্ম্মের সংস্থাপন ;—যাহা লইয়া প্রেম-ভক্তিসাধকের অনন্ত আনন্দ—সেই রাসলীলায় উপস্থিত হইয়াছি। ইহা তোমাকে একটু স্থিরচিত্তে—একটু প্রেমভক্তিমাখা হৃদয়ে শুনিতে হইবে। রাসলীলা বুঝিবার জন্ত আগে সেই রসিকশেখর রাসেশ্বরকে মনে মনে প্রেম-ভক্তিভরে ডাকিয়া লও—ভাবিয়া বল—"দয়াময়! প্রেমময়! গোপীজনবল্লভ! আমাকে তোমার মধুর লীলা বুঝিতে শক্তি দাও।" ভগবানের কৃপা ভিন্ন এ লীলা বুঝিবার শক্তি জন্মে না। আর প্রাণের মধুর স্বরে মাধুর্য্যময়ী গোপীশ্বরী প্রাণাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী রাধাকে ভাবিয়া বল,—"গুহ্যাতিগুহ্য রাসের রস আস্বাদনে আমায় ক্ষমতা দাও"—তিনিই হ্লাদশক্তি প্রদায়িনী বা স্বয়ং হ্লাদিনী।

শিষ্য। আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। রাধাকৃষ্ণ আমায় দয়া করুন।

গুরু। এখন তোমার নিকটে রাসের কথা পাড়িব। কিন্তু লীলা-কথা বলিবার আগে আর একটি কথা বলিতে চাই।

শিষ্য। আমার অজ্ঞানান্ধকার অপনোদন করিতে আপনি যাহা বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন।

গুরু। রাসের কথা বলিবার আগে শ্রীভগবান্ কেন রাস করিয়া-

ছিলেন, সে কথাটা বলা ভাল। রাসের উদ্দেশ্য না বলিয়া লীলার কথা বলিলে তোমার প্রীতিকর নাও হইতে পারে।

শিষ্য। দয়া করিয়া তাহাই করুন। আগে রাসের উদ্দেশ্যই বলুন।

গুরু। তোমাকে ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের অধঃস্রোত বিনিবারণ করিয়া ঊর্দ্ধগতি প্রদান করিতে—জীবের জ্ঞানের শুষ্ককণ্ঠে রসধারা ঢালিতে—ধরা-জ্বর বিদূরিত করিতে ভগবানের অবতার। ইতঃপূর্ব্বে অনেক অবতার হইয়াছে,—কিন্তু তাহার মধ্যে কেহ অংশ, কেহ কলা—তাঁহাদের এ শক্তি ছিল না। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সেই সাধন সিদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলে অবতার গ্রহণ না করিয়াও এ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতেন,—এ প্রশ্ন অনেকে করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র মানুষের আদর্শ অন্যথা হইতে পারে না,—আকাশের অঙ্কুরণে পুকুর কাটা যায় না। ভগবান্ একথা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন :—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ; ৩।২১—২৪।

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুবর্ত্তী হয়; অতএব তুমি ধর্ম্মরক্ষণার্থে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। হে পার্থ! দেখ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত নাই,—সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্য নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। হে পার্থ! যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদায় লোক আমার অনুবর্ত্তী হইবে। অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইবে।"

এই জন্যই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তবে যখন যেরূপ প্রয়োজন, সেই ভাবেই শরীর গ্রহণ করেন। ইদানীং জীবের উর্দ্ধগতি প্রদানের আবশ্যক, তাই পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই উর্দ্ধগতি প্রদান জন্য জীব তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল। জীবজননী ধরা জরগ্রস্তা হইয়া তাঁহাকে সাধিয়াছিল—দেবতারা কাঁদিয়া ডাকিয়াছিলেন,—তাই তিনি আসিয়াছিলেন।

এই লীলার জন্য তাঁহার বৈকুণ্ঠের নিত্যমুক্ত ভক্তগণ ও দেবতাগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাসের লীলা সমাধান জন্য নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোকে আর ঐশ্বর্য্যের লীলা-সহায় হইবার জন্য দেবগণ মথুরাদিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদ্ধ জীবের আদর্শ হইয়া ভগবান্ ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—আর লীলা-সহায় জন্য নিত্যমুক্ত জীব ও দেবতাগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকলেই জীব হইতে শ্রেষ্ঠ—সকলেই আদর্শ।

শিষ্য। দয়া করিয়া এখন আমায় বলুন,—কোন্ ধর্ম্মের স্থাপন করিতে, কিরূপ আদর্শ হইয়া ভগবান্ লীলা করিয়াছিলেন?

গুরু। জীবের নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রদান করিতে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে জীব পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়া সেই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

শিষ্য। কথাটা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। জীবের সুখের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। জীব মাত্রেই সুখ চাহে। ধর্ম্ম সুখের উপায়,—ধর্ম্মাচরণ ব্যতিরেকে সুখলাভ হইতে পারে না—ইহা সকল দেশের সকল জ্ঞানীই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদিকযুগ হইতে আর দ্বাপরের আদ্যযুগ পর্য্যন্ত সে আকাঙ্ক্ষা জীবের মিটে নাই। অনেক বৈদিক—অনেক দার্শনিক—অনেক বৈজ্ঞানিক 'সুখলাভের উপায়' আবিষ্কারে চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু মিলে নাই। কিন্তু কাল আসিয়াছিল—উর্দ্ধগতি বিধানের সময় হইয়াছিল,—তাই ভগবান্ সকলের আহ্বানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমার বোধ হয় মনে আছে, মহর্ষি কপিলপ্রণীত সাঙ্খ্যদর্শনে এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ই পরম পুরুষার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল সাংখ্যদর্শন নহে, সকল দর্শনের—সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য দুঃখনিবারণ। সাঙ্খ্যদর্শন এই কথা লইয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

যথা :—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।

আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হওয়ার নাম অত্যন্ত (পরম) পুরুষার্থ। কখন কোন প্রকার দুঃখ হইবে না, অনন্তকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ। এই পরম পুরুষার্থকে মুক্তি বলা যায়।

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপ্যত্যন্তা-
সম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্র।

লৌকিক উপায়ে সকল দুঃখের প্রতিকার হয় না। হইলেও তাহা আত্যন্তিক নহে। (কেন না, সেই দুঃখ আবার হয়), সেই কারণে প্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ বিবেকী লোকেরা লৌকিক উপায় ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করেন।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ।

লৌকিক ধনাদি ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড উভয়েই সমান। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ধনাদি দ্বারাও হয় না, যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারাও হয় না। কেননা, বৈদিক ক্রিয়াদি দ্বারা যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাতে আবার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

তবে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি?

দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়, প্রকৃতি ও পুরুষের প্রেমলীলা সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহাদের লীলারসে আত্মা অভিভূত করা। তাহাতে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্ভব হয়। ফলে ফুলে, লতা পত্রে, অনলে অনিলে, জলে স্থলে, মানবে এবং অপর জীবে, সর্ব্বত্রই সেই পুরুষ প্রকৃতির নিত্য রাসলীলার রস অনুভব হয়। সকলের সহিত আত্মার মিশ্রভাব উৎপন্ন হয়।

জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়,—জীব চৈতন্যে মিলন হয়। ভেদ ভুলিয়া যায়। জীবের কণ্ঠে নিত্য রসধারা পতিত হয়।

মানবের মস্তিষ্ক আছে, অন্য জীবে তাহা নাই। মানুষ তাই ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারে। যদি সুখেচ্ছা মানবেই কেবল আবদ্ধ

থাকিত,—তবে বুঝিতে পারা যাইত, সুখেচ্ছা বুদ্ধিরই গোচরীভূত। কিন্তু তাহা নহে,—সুখেচ্ছা জীব মাত্রেরই সহজ জ্ঞান। কেবল জীবেই বা বলি কেন, স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থেরই সুখেচ্ছা আছে। বৃক্ষ লতাদি জল পাইলে সুখী হয়,—বৃদ্ধি পায়,—এইরূপ সর্ব্বত্র। ভগবান্ সৃসৃক্ষু হইয়া সুখাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। সুখাকাঙ্ক্ষা না করিলে কাজে প্রবৃত্তি হইবে কেন? সেই মূল সুখ অনুভূত হইয়া জীবে সংক্রমিত হইয়াছে। সুখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় রস। রসে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে,—মনের শান্তি করে। চিত্তবৃত্তিসমূহের একাগ্রতা সম্পাদন করে।

মুখে বলিলাম, চিত্তবৃত্তি নিরোধ কর, উপদেশ দিলাম, কর্ম্মাচরণ কর,—শাস্ত্রে পাঠ করিলাম, নিষ্কাম কর্ম্ম কর। কিন্তু কামের আগুন যে চারিদিকে ছড়ান। কে কবে সে আগুনের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে? যে মুক্তিকামী, সেও কামের হাত হইতে উদ্ধার পায় নাই। আর যে, সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপদে অর্পণ করিয়াছে,—তাহার সকল কামনা কাজেই বিদূরিত হইয়াছে।

কিন্তু তাও হয় না,—শুধু কৃষ্ণ কামবিজয়ী নহেন। 'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।' রাধা পরা প্রকৃতি—প্রকৃতি পুরুষের মিলন-রসে আত্মাকে ঢালিয়া দিতে না পারিলে, কাম যায় না। প্রকৃতি লইয়াইত কাম। প্রকৃতির পরিণাম হইতে আমাদের কাম্য পদার্থ সমুদ্ভূত। অতএব চৈতন্য পুরুষ, আর চিচ্ছক্তি প্রকৃতির সম্ভোগ লইয়া রাস—আর সেই রাস-রসোপভোগ করাণই রাসলীলা।

সাংখ্য বলেন,—

তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।

যে কোন প্রকারেই হউক্, প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরম পুরুষার্থ।

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন :—

তেন নিবৃত্তপ্রসবমর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ॥

যে আত্মার প্রকৃতি দর্শন হয়, প্রকৃতি আর সে আত্মার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য, জ্ঞানাজ্ঞান প্রসব করেন না। সুতরাং আত্মা তখন রজঃ কি তমঃ কি অন্য কোন গুণে কলুষিত হন না। কেবল হন।

মানুষ ঐ প্রকারে কেবল হইতে পারে কি না? সমুদায় যোগী ঋষি ও দর্শনজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—পারে। কি প্রকারে পারে, তাহাই বিচার্য্য। কিন্তু আর বিচারের আবশ্যকতা নাই। ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া পরিণামপ্রদায়িনী মূলা প্রকৃতিকে লইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিয়াছেন,—তিনি আত্মারাম হইয়া প্রকৃতি রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। এস ভক্তবৃন্দ,—এস, প্রেমিকাগণ, রাসলীলা দর্শন কর। ঐ শুন, কামবীজে বাশি বাজিয়াছে,—ঐ শুন, ঋষিগণ কামগায়ত্রী পাঠ করিতেছেন। ঐ শুন, কামদমনার্থ মদনমোহন রাসলীলা আরম্ভ করিয়াছেন। সব ভুলিয়া যাও,—রসধারায় কণ্ঠ শীতল কর। আনন্দ-সাগরে ভাসমান হও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাস-পঞ্চাধ্যায়।

শিষ্য। এক্ষণে রাসলীলার কথা বলুন। আমি শুনিয়াছি, ভাগবতের দশমস্কন্ধে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়, এবং উহা

আমি পুনঃপুনঃ পাঠও করিয়াছি,—আমাকে ঐ রাসপঞ্চাধ্যায়ের কথা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। রাসের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাসের প্রথম শ্লোক :—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

শারদীয় রজনী, প্রফুল্ল মল্লিকা,—ভগবান্ তাহা দর্শন করিয়া, যোগমায়াকে আশ্রয় করত গোপীদিগের সহিত রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

কিন্তু ভগবান্ নির্গুণ, আনন্দময়, নির্লিপ্ত, বিশ্বের আদি কারণ, এবং সমস্ত কার্য্য-কারণের বীজ। তাঁহার আবার রমণ-ইচ্ছা কেন?

রমণ-ইচ্ছা সহজ ভাব। ইহা সুখের পূর্ব্বরাগ। ভগবান্ যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তখনই রমণেচ্ছা বা সুখানুরাগ হইয়াছিল। তাই তিনি গোলোকে রাধা-সঙ্গে নিত্য রমণশীলা। কিন্তু বলা বাহুল্য, ঐ রমণ ইন্দ্রিয়াতীত। কেন না, মূলহীন মূল প্রকৃতি এবং অনাদি পুরুষের আবার ইন্দ্রিয় কি? প্রাণ আর ভাবের মিলন। প্রাণ আর ভাব লইয়াই প্রেম। ইন্দ্রিয়প্রীতি কাম। শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা অপ্রাকৃত কাম বা নবীন মদন,—কামবীজ তাঁহার উপাসনার মন্ত্র। শ্রীমতী রাধিকা সেই কামবীজের স্বরূপ। অর্থাৎ কামবীজের বিষয় রাধা এবং আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। গোপীদিগের ঈশ্বরী শ্রীরাধিকা—রাধিকা মূল; গোপীগণ শাখা-প্রশাখা।

জীবহৃদয়ে সেই সুখেচ্ছা,—সেই রমণেচ্ছা প্রবলা। প্রেমের আশায়

কামের সেবা করিয়া জীব জন্ম জন্ম বিদগ্ধ হইতেছে। তাই ভগবান্ কাম-বিষ বিনাশের জন্য এই মধুর রাসলীলা করিয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত শ্লোকের সুবিখ্যাত টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন :—

ননু বিপরীতমিদং, পরদারবিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্ব-প্রতীতেঃ নৈবং "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়াখ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বং; কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ।

শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,—"কামবিজয়ের জন্য কথার ছলে রাসের লীলা। এই পাঁচ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আমি তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিব।"

শিষ্য। কথাটা কিছু বিপরীত রকমের হইয়া পড়িল। কোথায় পরদার-বিনোদ, আর কোথায় কন্দর্প-বিজয়!

গুরু। হাঁ, অনেকে নিজের অজ্ঞানতা জন্য প্রভুপাদ টীকাকারগণকেও উপহাস করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই যে, "যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া" "আত্মারাম হইয়া রমণ করিয়াছিলেন" "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ" "আপনাতেই অবরুদ্ধ-সৌরত" এতগুলি কথা বলিবার কারণ কি ছিল? টীকাকারগণ কি প্রলাপবাক্য বলিয়া থাকেন? ঐ বাক্যগুলির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্রতা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

শিষ্য। সে সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমি এখনও সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই যে, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিলেন কেন?

গুরু। তুমি বোধহয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহ, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণাভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য কি?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। সে কথা জানিতে হইলে গোপীতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে হয়। পূর্ব্বে একথা তোমাকে বলিয়াছি। এস্থলে আরও একবার বলিতেছি, শোন।

ঈশ্বরের শক্তি আর জীবের শক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঈশ্বর পূর্ণ; জীব অপূর্ণ, তাঁহার কণামাত্র।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণ।

"বিষ্ণুর স্বরূপ শক্তিই পরা শক্তি। এই অন্তরঙ্গ শক্তি সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ এবং আনন্দ অংশে হ্লাদিনী। জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি তটস্থা। তৃতীয় শক্তির নাম অবিদ্যা বা মায়া।"

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনু সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

বিষ্ণুপুরাণ।

"ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সর্ব্বগত হইলেও অবিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অখিল

সংসার তাপ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়াতেই, ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সকল প্রাণীতে তারতম্য ভাবে অবস্থান করে।"

অবিদ্যা সংসার লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু সংসার বিকারময় ও বহু। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় জীব আচ্ছন্ন। কখনও সুখে, কখনও দুঃখে জীব অভিভূত হয়। তাহার কারণ মায়া। যতদিন মায়া থাকে, ততদিন জীবের এইরূপ আকারই থাকে। ঈশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে এবং একান্ত অবলম্বন করিতে পারিলে তবেই জীব মায়ার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

"আমার দুরত্যয়া মায়া উত্তীর্ণ হওয়া জীবের সাধ্যাতীত। যে আমার শরণাগত হয়, সেই দুস্তর মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।"

ইহার কারণ এই যে, সর্ব্বপ্রকারে ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত হইলে, জীব ঈশ্বরের স্বরূপশক্তিতে পরিণত হয়। তাহারা ঈশ্বরের প্রকৃতি হয়। তখন তাহাদের সত্তা, শুদ্ধ-সত্তা;—তাহাদের জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান;—তাহাদের আহ্লাদ, ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক আহ্লাদ, তাহাদের শক্তি, ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি। তাহাদের শক্তি তখন আর অবিদ্যা-অভিভূত ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি থাকে না।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।

"হে সর্ব্বাধার! তোমার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ বিশুদ্ধভাবে কেবল রূপে আছে। যে হেতু তুমি গুণবর্জ্জিত; হ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রিত শক্তি তোমাতে নাই।"

যাহারা ভক্ত, তাহাদিগের স্বরূপশক্তি প্রকাশ পাইলে. তিনি সেই শক্তি ভগবান্‌কে অর্পণ করেন। ভগবান্ ভিন্ন ভগবৎশক্তি গ্রহণ করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। ভক্তের স্বরূপশক্তি ভগবানে অর্পিত হইলেই সেই শক্তি জগতে প্রত্যর্পিত হয়। ভগবান্‌ই বিশ্বময়। বিশ্ব ব্যতিরেকে তাঁহার নিজ প্রয়োজন কিছু নাই,—তিনি বিশ্বের ঈশ্বর ; ভক্তের ভগবান্। তাঁহার সমস্তই বিশ্বের জন্য—ভক্তের জন্য। হ্লাদিনী প্রভৃতি যে শক্তি তাঁহাতে অর্পিত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ জীবকে তাহা প্রতিদান করেন। ভক্তের শক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করে। ভক্তের শক্তি, তাঁহার স্বরূপশক্তি। সেই স্বরূপশক্তি আবার তিন প্রকার। সম্বিৎ শক্তি, সন্ধিনী শক্তি এবং হ্লাদিনী শক্তি। ভক্তের ঐ তিন স্বরূপ শক্তিই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ তিন শক্তির প্রধান শক্তি হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তিরূপে যাহারা ভগবানকে আলিঙ্গন করে,তাহারাই গোপী। শ্রীরাধিকা গোপীশ্বরী। সন্ধিনীশক্তির সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব—ইহাতে ভগবানের সত্তা বিশ্রাম লাভ করে। পিতা মাতার বাৎসল্যাদি ভাব শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার। সম্বিৎ শক্তি ভগবানে ভগবত্তা জ্ঞান। আর হ্লাদিনী শক্তির সার—প্রেম ও ভাব, ভাবের পরাকাষ্ঠার নাম মহাভাব। রাধাঠাকুরাণী মহাভাব স্বরূপা। রাধিকা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার, এবং তিনি স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, হ্লাদিনী কৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদ করান, এবং কৃষ্ণ সেই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা ভক্তের পোষণ করেন। যাঁহা হইতে নিত্যানন্দ অনুভব হয়,তাঁহাকে সেই আনন্দ অর্পণ করা জীবের প্রধান করণীয়। হ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণে অর্পিত হইলেই বিশ্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়,—আনন্দধারা জগতে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই আনন্দে ভক্তের অখণ্ড আনন্দ সমুদ্ভূত হয়। আনন্দময় ও আনন্দময়ীর প্রতিবর্ষণে বিশ্ব আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়।

আনন্দ-বিস্ময়-রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা।

"সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। যিনি আনন্দ চিন্ময় রস দ্বারা প্রতিভাবিত। অতএব আত্মস্বরূপা, আত্মকলারূপিণী, গোপীদিগের সহিত গোলোকে বাস করিতেছেন। সেই গোবিন্দ সকল জীবের আত্মা।"

গোপিকা নাম সংরক্ষণী। কুতঃ সংরক্ষণী? লোকস্য নরকাৎ মৃত্যোর্ভয়াচ্চ সংরক্ষণী।

লোকদিগকে মৃত্যু ও নরকভয় হইতে গোপীগণ রক্ষা করেন।

গোপায়তি সকলমিদং গোপয়তি পরং পুমাংসমিতি গোপী প্রকৃতিঃ।

শিষ্য। গোপীতত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আর একটু সন্দেহ আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। গোপীতত্ত্ব যাহা—তাহা সূক্ষ্মতত্ত্ব। সর্ব্বশেষ তত্ত্ব গোলোকধামে সে তত্ত্বের লীলা-খেলা। ভগবান্ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে—তাঁহারা কেন আসিলেন?

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ। একথা আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছি। ভগবান্ ঐশ্বর্য্যের জন্য দেবগণ, এবং রসের জন্য গোলোকের

নিজ জনদিগকে সঙ্গে লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন কথা এই যে, ভগবান্ জীবে আনন্দ প্রদান করিবেন—কিন্তু তিনি বিশ্বময়; তিনি আনন্দিত হইলে বিশ্ব আনন্দিত হইবে। তাই হ্লাদিনীশক্তি রাসে তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন,—তাই ভূতলে রাসবিহার করিয়া রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তাই রাসে হ্লাদিনীশক্তির সহিত সংঘর্ষে যে আনন্দ উপজিল, সেই আনন্দে ধরাভার অপনোদিত হইয়াছিল, এবং জীবের ঊর্দ্ধগতি হইয়াছিল। যে দিন রাস হইল, সেই দিনই এই অখণ্ড আনন্দধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাসের প্রথম শ্লোক।

শিষ্য। এখন আমাকে রাসের প্রথম শ্লোক সম্বন্ধীয় কথাকয়টী বুঝাইয়া দিন। ভগবান্ সেই আনন্দধারা পৃথিবীতে ঢালিয়া দিতেন,—আনন্দময় ও আনন্দময়ীর আলিঙ্গনে জগতে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইবে, ইহাতে যোগমায়ার আশ্রয় কেন?

গুরু। যোগমায়াকে ভগবান্ ইচ্ছা করিয়া আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বিষ্ণোর্ম্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থং সম্ভবিষ্যতি॥

যোগমায়া বিষ্ণুমায়া। যাহারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পিত, তাহারা এই বৈষ্ণবী মায়ায় অর্পিতপ্রাণ। তাহাদিগের নিকট আর শ্রীকৃষ্ণ-মায়া

উপস্থিত হইতে পারে না। প্রকৃত মায়া বিদূরিত হইলে তবে বিষ্ণুমায়া উপস্থিত হয়।

শিষ্য। মায়া কি দুই প্রকার?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কি কি?

গুরু। মায়া, আর যোগমায়া।

শিষ্য। মায়া আর যোগমায়ার পার্থক্য কি?

গুরু। শাস্ত্রে আছে—

চিদানন্দময়ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে॥

পঞ্চদশী।

"চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসংযুক্ত, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি সত্ত্বগুণের শুদ্ধির তারতম্যে "মায়া" এবং "অবিদ্যা" এই দুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বগুণ যখন তম ও রজ এই দুই গুণ দ্বারা কলুষিত না হয়, তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের শুদ্ধি বা শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান বলে; এবং যখন সত্ত্বগুণ তম ও রজ এই দুই গুণ দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের অবিশুদ্ধ বা মলিনসত্ত্বপ্রধান বলে। ইহাতেই বুঝা যায় যে,—ব্যষ্টীভূত মলিনসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই 'অবিদ্যা' এবং সমষ্টীভূত শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই মায়া। অবিদ্যা বা মায়া, দুই-ই এক, কেবল মাত্র ব্যষ্টি ও সমষ্টি।"

এই মায়া-বৃত্তি দ্বারাই জীবের অধঃপতন হয়। আর যোগমায়া— "ভগবতী। সা চ বিষ্ণুমায়া।"

অবিদ্যা বা মায়াভারাক্রান্ত পৃথিবী—অবিদ্যা বা ভারাক্রান্ত জীব—এতদিন কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া ফিরিতেছিল—অধঃপতনের মহাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। তাই ভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্ম যখন আবির্ভূত হইবেন বলিয়া স্থির হইল, তখন যোগমায়াকে ধরাতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই—

বিষ্ণোর্ম্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥

মায়ার আবরণে যোগমায়ার শুদ্ধসত্ত্ব-জ্যোতি মর্ত্ত্যভূমে বিকীর্ণ করিবার জন্ম ভগবান্ আবির্ভূত হইবার সময় যোগমায়াকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন :—

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।

সেই জন্মই :—

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥

মায়ার আবরণ দূর করিয়া ভগবৎসত্তা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম—তাই গোপীগণ বলিয়াছিলেন :—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

মায়ার জগতে—ভেদময় জগতে, ভক্তে ও ভগবানে—আনন্দময় ও

আনন্দময়ীতে এক হইয়া জগতে সেই ধর্ম্মের আনন্দধারা অর্পণ করিবার জন্য,—তাই—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকা।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

এই যোগমায়ার—এই বিষ্ণুমায়ার—এই মহাযোগিনী কাত্যায়নীর আবরণে যে রাসলীলা সংঘটিত হইয়াছিল - তাহা তুমি আমি মায়ার জীব বুঝিতে পারিব কেমন করিয়া? যোগমায়ার অভেদ-জগতে মায়ার ভেদ-জগতের জীব কোথায়? তাই কৃষ্ণের জন্মবার্ত্তা কংসের প্রহরিগণ জানিতে পারিয়াছিল না। তাই ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণাগমন বা যশোদাকে কৃষ্ণার্পণ অবগত হইতে পারে নাই। তাই ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণসত্তা অনুভব করিতে পারে নাই। তাই মায়ার জীবে রাসের বংশীনাদ শুনিতে পায় নাই।

আর যাহারা এখনকার পণ্ডিত, তাহারা রাস-লীলা বুঝিবে কি প্রকারে?

গোপীতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, আর রাসলীলার সম্যক্ ভাব বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইহা সাধনসাপেক্ষ। সে সাধনা যোগমায়ার। তাই গোপীগণ আগেই সে সাধনা করিয়াছিল। তাই যোগমায়াপ্রভাবে তাহারা শয়নে স্বপনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিত। তাই তাহাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ অনুভব করিত। তাই তাহারা আনন্দময়ী হইয়া আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল।

শিষ্য। আপনি বলিলেন,—'ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন।' কিন্তু এ কথার অর্থ আমি ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। যাঁহার ভাবে জগৎ বিমোহিত; যাঁহার সত্তায় জগতে সত্তা;

যাঁহার জ্ঞানে জীবের জ্ঞান; যাঁহার আনন্দে জীবের আনন্দ;—যিনি বিশ্বের অতীত; মায়ার অতীত, কার্য্য-কারণের অতীত,—যিনি জীবগণকে নিষ্কাম হইতে উপদেশ দেন, যিনি বেদের প্রসবয়িতা, যিনি আত্মারাম, যিনি জীবের হৃদয়স্থ—তাঁহার আবার রমণেচ্ছা কি? তিনি আবার মায়ার অধীন হইয়া রমণে ইচ্ছুক হইবেন কেন?

গুরু। ভুলিয়া যাও, ঐত দুঃখ। পূর্ব্বে তোমাকে তিন শক্তির কথা বলিয়াছি। ঐ শক্তিত্রয় যথা,—স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গশক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থশক্তি এবং মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গশক্তি। স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি, এই দুই শক্তির মধ্যে জীবশক্তি ব্যবস্থিত। মায়াশক্তিতে নিপীড়িত হইতে হইতে জীব ক্রমশঃ স্বরূপশক্তির পথে অগ্রসর হয়; ইহাই জীবের ক্রমোন্নতি।

কত দীর্ঘদিনের মায়া-অবসাদগ্রস্ত জীব ভগবান্‌কে ডাকিয়া পাইয়াছিল। তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া ভগবান্ মানুষ হইয়াছিলেন। মানুষ না হইলে মানুষ তাঁহার স্বরূপশক্তি বুঝিতে পারিত না। মায়িক জীব, মায়াতীত ভগবান্‌কে বুঝিবে কি প্রকারে? এক জাতীয় জীব অপর জাতীয় জীবের তত্ত্ব যখন কিছুই বুঝিতে পারে না, তখন মায়িক জীব, অমায়িক তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে কি প্রকারে? তাই তিনি মায়িক জগতে—মনুষ্যসমাজে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মানুষ মায়ার জীব, তিনিও মায়ার জগতে অবতীর্ণ মানুষ—মানুষ তখন তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে, তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাই ভগবানের অবতার—তাই পূর্ণ পরমেশ্বর কৃষ্ণ মানুষ। মানুষ হইয়া ভগবান্ জীবের জীবত্ব বিনাশ করেন—জীবের ক্ষেত্রস্থশক্তি নাশ করেন। অর্থাৎ জীব চেষ্টা করিলে তাঁহার আদর্শে তাহার মিশ্রভাব দূর করিতে পারে, ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাবে মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না। তাঁহার শঙ্খচক্রগদাপদ্ম দেখিয়া মানুষ ভীত হয়,—সৎপথে যাইবার চেষ্টা করে। নীতি-পথ ও ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারে;—কিন্তু প্রাণের মানুষ ভাবিয়া, প্রাণের পতি ভাবিয়া আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। দ্বিভুজ মুরলীধর নবনীরদ শ্যামরূপ ভালবাসিতে পারে—প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে। আপন তটস্থ শক্তির সহিত তাঁহার স্বরূপশক্তির রমণ করাইয়া এক হইতে পারে। তাই কৃষ্ণ অবতার—তাই স্বরূপশক্তি ও তটস্থ শক্তির রমণ।

স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্।

স্ব এব ধামন্ স্ব স্বরূপ এব রমমাণম্ অতএব ঈশ্বরম্॥ শ্রীধর।

"তিনি আপনার স্বরূপেই রমমাণ। এই জন্যই তিনি ঈশ্বর।"

এই রমণ তটস্থশক্তি ও স্বরূপশক্তির। কেবল তটস্থশক্তির সহিত তটস্থশক্তির মিলন হইলে তাহা মায়ার জগতে,—আর স্বরূপশক্তি ও তটস্থশক্তির মিলনে যোগমায়া।

যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া হ্লাদিনী শক্তিগণের সহিত ভগবানের রমণ, ইহা জগতের হিতার্থ—এ মিলন অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন—ভগবান্ ভক্তের প্রিয়, ভক্ত ভগবানের প্রিয়—"তত্ত্বমসি"—বেদের এই মধুর বাক্য—বেদের অনলবাক্য স্বরূপগত মিলন—স্বরূপে স্বরূপ মিলন—অভেদাত্মক মিলন;—এই মিলনে ঝলকে ঝলকে আনন্দ উদ্ভূত হইবে—প্রতি মিলনেই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইবে—আনন্দ উথলিয়া পড়িবে ও সেই আনন্দে ত্রিলোকের ভক্তের পোষণ হইবে—মধুরতার বিকাশ হইবে,—প্রেমের প্রবল স্রোতে জীবের স্বার্থ ভাসিয়া যাইবে,—কঠোরতা তিরোহিত হইবে—জীবের

জীবন মধুর হইবে। গোলোকের মধুর লীলা মর্ত্ত্যভূমে প্রকট করিবার জন্য আত্মারাম হইয়াও এই রমণ।

আত্মাহঙ্কারী জীব মায়ার ঘোরে ভগবানের এই মিলনকে ব্যভিচার বলে। এই মিলন লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট ও পারদারিক বলে। মায়ার জগতে থাকিয়া কেহ যদি আপনাকে "ব্রহ্মাস্মি" বলে, তবে সে যেমন ব্যভিচারী, মানবশরীর বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাও সেইরূপ ব্যভিচার। "তত্ত্বমসি" বলিয়া জীব যদি আত্মহারা হয়, তাহাও যেমন ব্যভিচার, ইহাঁও সেই প্রকার ব্যভিচার।

জীবের মায়া ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়, ক্রমে ক্রমে ব্রজলীলার ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। অন্যান্য অবতার অংশ বা কলা,—কৃষ্ণ পূর্ণতম। কৃষ্ণ অবতার ভিন্ন এ রস—এ ধর্ম্ম জগতে অর্পণ করা অন্য কাহারও সাধ্য নাই—তাই রাসে তটস্থশক্তির সহিত স্বরূপশক্তির রমণ,—তাই আত্মারাম হইয়াও ভগবান্ রমণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে,—

> এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
> ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

ভগবান্ প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও প্রাকৃতিক গুণের সহিত সংযুক্ত হন না। আর যাঁহারা ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারাও প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃতিক গুণে অভিভূত হন না।

শিষ্য। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ভগবান্ রমণ করিয়া কি প্রকারে জীবের কামবিজয়ের উপায় করিয়াছিলেন,—কি প্রকারে তিনি মদন-মোহন হইয়াছিলেন?

গুরু। তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ"—তাঁহাতে "অবরুদ্ধসৌরত",

সেই জন্য তিনি কামবিজয়ী। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি শোন। প্রলয়ের অন্তে যখন ভগবান্ ইচ্ছা করিয়াছিলেন—"একোঽহং নানা স্যাম্"—তখনই তাঁহার সেই ইচ্ছা মায়া হইয়া বিচরণ করিল। সেই মায়া দ্বারাই ভেদের জগৎ সৃষ্টি হইল,—সে ভেদ হইতেই প্রজা সৃষ্টি হইতে লাগিল।

যখন ভেদ হইল, তখনই কাম হইল। কাম ঈশ্বরের আনন্দময় সন্তান। কাম সৃষ্টিকার্য্যের সহায়ক। কাম সৃষ্টির আদিকাল হইতেই হইয়াছে। কিন্তু যখন যেমন জগৎ, তখন কামও তদ্রূপ। জগৎ যখন জড়ভাবাপন্ন,—কামও তখন জড়ভাবাপন্ন। জীব তখন সকলেই জড় ছিল, কামও জড়। তারপরে মহামায়া পর্ব্বতনন্দিনী হইয়া জড়ের ঊর্দ্ধগতি করিলেন,—জড়কামও মহাকালের যোগাগ্নিতে ভস্ম হইয়া নূতন কাম হইল। সেই কামের বেগে স্বর্গ মর্ত্ত্য কম্পিত হইয়া উঠিল। জীব স্থাবরতা পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিল। প্রজা উৎপাদনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। হর-পার্ব্বতীর মিলন হইল,—সেই মিলনে জগতে মিথুন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল,—কাম তাহার মধ্যবর্ত্তী দেবতা হইলেন। কাম তখন অশরীরী—মনসিজ। মনসিজ কামের মিথুনভাবে জীব এক মহান্ আনন্দ অনুভব করিল। সে অনেক দিনের কথা। সেই মিথুনভাব হইতেই সমাজ। সমাজ হইতেই সামাজিক ধর্ম্ম। সামাজিক ধর্ম্ম হইতে যজ্ঞ। যজ্ঞ হইতে নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে আরাধনা। আরাধনা হইতে জ্ঞান।

যে মিথুনভাবের কথা বলা হইল, সেই মিথুনভাব হইতেই ভালবাসা সৃষ্টি। ভালবাসা হইতে প্রেমের উদ্ভব। প্রেম হইতে ভগবানের রতি।

কাম জ্ঞান বিনাশ করিয়া জীবের জীবত্ব রক্ষণে প্রযত্ন।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥
ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩। ৩৭—৪১।

"এই কামই প্রতিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় ও অতিশয় উগ্র—ইহাকেই মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া জানিবে। যেমন ধূমদ্বারা অগ্নি, মলদ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। জ্ঞানিগণের চির-বৈরী, দুষ্পূরণীয় অনলস্বরূপ কাম, জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি; ইহারা (কামের) আবির্ভাব-স্থান। এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। হে ভরতর্ষভ! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।"

এই দুষ্পূরণীয় কাম বিনাশ কর—এ উপদেশ সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু কেবল সংযমে ইহা বিনাশ হয় না।

কত দীর্ঘ দিনের সংযম—কত দীর্ঘদিনের তপস্যা ঘৃতাচী কিম্বা মেনকা রম্ভা দেখিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন—এবং কাম বিনাশের আদর্শ হইয়াছেন। তাই তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ।"

কামকে প্রেমে পরিণত করিতে পারিলেই কাম বিনাশ হয়। কাম বিষ-মিশ্র মধু, প্রেম স্বর্গীয় সুধা। কামে মুহূর্ত্ত পরে দুঃখ। প্রেমের প্রতি কণ্টক বিন্ধনেই সুধা স্মরণ। কামে আত্মজ্ঞান, আত্মতৃপ্তি, আত্ম-চরিতার্থতা। প্রেমে তন্ময়তা—আত্মসম্পূর্ত্তি।

কাম খণ্ড—প্রেম অখণ্ড। কাম ও প্রেমে জগৎ সুন্দর হয়। জীব সুন্দর হয়, জীব বলবান্ হয়—কবিত্বশক্তি বিশিষ্ট হয়—কিন্তু কাম ক্ষয়শীল। আত্মেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি মাত্র সমস্ত বিনষ্ট হয়,—আর প্রেম অখণ্ড—ক্রমে বর্দ্ধনশীল। কামে বিষয়-তৃষ্ণা, প্রেমে বিষয়-বিস্মরণ। কাম আপন লইয়া, বিষয় লইয়া নশ্বর। প্রেম আপন ভুলিয়া, বিষয় ভুলিয়া অবিনশ্বর।

যথার্থ ভালবাসায় কাম বিনষ্ট হয়। ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারিলে জীবে জীবে প্রেম হয়,—সকল জীবের হৃদয়দেশে ঈশ্বর অবস্থিত—সকল জীবে প্রেম হয়। চিত্ত নির্ম্মল হয়,—ঈশ্বরের বংশীনিনাদ শুনিয়া আকুল হইতে হয়। তাঁহার বংশীনাদ নিত্য হইতেছে।

শিষ্য। ভাল না বাসিয়া সংযমের পথে কাম দূর হইতে পারে না কি?

গুরু। না। যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম—কাম হইতেই কর্ম্ম। তার-পরে কাম জীবের সহজ-সংস্কার,—এ সংস্কারের বিনাশ করা সাধ্যা-তীত। লোহাকে সোণা করিয়া লইতে হয়। কামকে প্রেমে পরিণত করিতে হয়।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; ১৮।৪৮।

"যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্মই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে, অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না।

তবে কি করিবে? যাহাতে সেই সহজ ভাব ভগবানে অর্পিত হয়, তাহাই করিতে হইবে। কামকে মিথুনভাবে লইয়া—তারপরে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলে—যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ করিলে, তবে কাম ভালবাসা হইতে প্রেমে পরিণত হয়। ভগবান্ দণ্ডদাতা, বরদাতা, নরকত্রাতা, সুখ-দুঃখের কর্ত্তা ভাবিয়া তাঁহাকে আরাধনা বা উপাসনা করিলে, তাহা সকাম উপাসনা। আর ভালবাসিয়া—আত্মহারা হইয়া—যথাসর্ব্বস্ব দিয়া—লালসা বাসনায় ব্যাকুল হইয়া—কান্তভাবে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলে তাহাই প্রেমের উপাসনা—তাহাই নিষ্কাম সাধনা।

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ প্রেমরূপে—প্রেমের নায়করূপে জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন, তখনই মদনমোহন। পরিণামিনী প্রকৃতির দক্ষিণে দাঁড়াইয়া যখন তিনি বেণুনাদ করেন, তখন তিনি মদনমোহন। প্রেম-পুলকিত প্রাণে—গোপীভাবে—যখন জীব দেখিল, যুগল,—দক্ষিণে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বামে পরমা প্রকৃতি রাধিকা,—প্রকৃতি-পুরুষ দেখিয়া প্রকৃতিকে চিনিতে পারিলে, পুরুষকে বুঝিতে পারিলে,—তাহার কাম বিনাশ হইল ; কাজেই যখন তিনি একা, তখন মদনমোহন হইবেন কি প্রকারে? কাজেই—"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" কাজেই হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে রাসলীলা করিয়া কামবিজয় হইয়াছিল।

শিষ্য। "আপনাতে অবরুদ্ধ-সৌরত"—কি প্রকারে?

গুরু। হ্লাদিনী শক্তির শক্তিমান্ তিনি, কাজেই তাঁহাতে অবরুদ্ধ-সৌরত।

অতএব ভগবানের এই রমণাভিলাষ আপনার জন্য নহে, পরদার-বিনোদের জন্য নহে, গোপীগণের অনল নিবারণের জন্য নহে,—জগতের জীবের কামনাশের জন্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাস।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে যাহা "রাস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, হরিবংশে তাহাই "হল্লীষ" বলিয়া কথিত হইয়াছে, অতএব রাস ও হল্লীষ এক। ইহা কি যথার্থ?

গুরু। না। শাস্ত্রে আছে,—

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্ম্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীষকং বিদুঃ॥
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা।
রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥

"মণ্ডলচারিণী অনেক নর্ত্তকীর সহিত একমাত্র নটের যে নৃত্য, তাহার নাম হল্লীষক। ঐ হল্লীষক নামক নৃত্য যদি আবার নানাপ্রকার তালবন্ধ ও গতিভেদে সম্পাদিত হয়, তবে তাহাকে রাস বলা যায়। তাদৃশ স্বর্গেও দৃষ্ট হয় না, ভূতলের ত কথাই নাই।

শিষ্য। এক্ষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে রাসলীলা করিয়াছিলেন—কি প্রকারেই বা রাসলীলা-রস পৃথিবীতে অর্পিত হইয়াছিল, দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর সম্বন্ধকৃত বৃত্তিস্ফুরণই লীলা। আশ্রয়তত্ত্বকে বিষয়ী বলা যায় এবং আশ্রিততত্ত্বকে বিষয় বলা যায়। আশ্রয়তত্ত্বে শ্রীভগবান্ বিষয়ী এবং আশ্রিততত্ত্ব তদীয় শক্তিবর্গ বিষয়। শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর ভেদ নাই; অতএব শক্তিমান্ বিষয়ী শ্রীভগবান্ ও তদীয় শক্তিবর্গ বিষয়ের পরস্পর ভেদ নাই। বিষয়ী শ্রীভগবান্ এক—অদ্বিতীয়; বিষয় বা শক্তিবর্গ বিষয়ী শ্রীভগবানেরই লীলাসামর্থ্য, তাঁহা হইতে অভিন্ন। শ্রীভগবানের লীলা প্রধানতঃ ত্রিবিধ;—নিত্যলীলা, সৃষ্টিলীলা ও সংসারলীলা। নিত্যধামের নিত্য ক্রিয়ার নাম নিত্যলীলা; বিশ্বোৎপাদন ক্রিয়ার নাম সৃষ্টিলীলা এবং জন্মাদি মোক্ষান্ত ক্রিয়ার নাম সংসারলীলা। তন্মধ্যে সংসারলীলা-সামর্থ্যের নাম জীবশক্তি, সৃষ্টিলীলা-সামর্থ্যের নাম মায়াশক্তি ও নীত্যলীলা-সামর্থ্যের নাম স্বরূপশক্তি। উক্ত ত্রিবিধ শক্তিরই আবার শক্তিরূপ ও অধিষ্ঠাতৃরূপ নামক দুইটি দুইটি রূপ আছে। তন্মধ্যে শক্তিরূপটি শ্রীভগবানের স্বরূপেরই অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটি ভিন্নাকারে প্রকাশিত, স্বরূপশক্তির শক্তিরূপটি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটি নিত্যলীলার পরিকর সকল। মায়াশক্তির শক্তিরূপটি শ্রীভগবানের আবির্ভাব বিশেষের বা অন্তর্য্যামী পরমাত্মার অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটি মহামায়া। জীবশক্তির শক্তিরূপটি শ্রীভগবানের অপর আবির্ভাবের বা সত্তামাত্র ব্রহ্মের অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটি জীবসমষ্টি।

নিত্যলীলায় আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের এবং তদীয় শক্তিরূপ ও শক্ত্যধিষ্ঠাতৃরূপ দ্বিবিধ বিষয়তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধকৃত বৃত্তিস্ফুরণ স্বভাবতঃ

সিদ্ধ হয়। ঐ নিত্যলীলা আবার যাহাতে রসতা ও আস্বাদযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই রাসলীলা বলা যায়। এই লক্ষণ সামান্য লক্ষণ। নিত্যলীলা যাহাতে আস্বাদযোগ্যতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তাহাই রাসলীলার বিশেষ লক্ষণ। *

বিষয়তত্ত্ব ও আশ্রয়তত্ত্বের স্বাভাবিক বৃত্তিস্ফুরণরূপ নিত্যলীলায় দুইটি উদ্দেশ্যের সিদ্ধি দেখা যায়। একটি উদ্দেশ্য—সাধক জীবের আকর্ষণ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—নিত্যসিদ্ধ পরিকরবর্গের মনোরথ পরিপূরণ। সাধক জীব জ্ঞানী ও ভক্তভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে জ্ঞানীর প্রেম না থাকায় আকর্ষণ সম্ভব হয় না, ভক্তের প্রেম থাকায় উহা সম্ভব হয়।

মায়িক প্রেম গৌণ-মুখ্য ভেদে দ্বিবিধ। অমায়িক প্রেমও গৌণমুখ্য ভেদে দুই প্রকার শ্রবণ করা যায়। মায়িক মুখ্যপ্রেম শান্তাদিভেদে পঞ্চবিধ দেখা যায়। অমায়িক মুখ্যপ্রেমও শান্তাদিভেদে পাঁচ প্রকার। মায়িক কান্তাপ্রেমই সকল প্রেমের সার; কারণ উহা অধিক গুণবিশিষ্ট বলিয়া অধিকতর স্বাদু; অমায়িক কান্তাপ্রেমও তদ্রূপ। মায়িক কান্তাপ্রেম পরকীয়াত্ব ঘৃণিত হয়; অমায়িক কান্তাপ্রেমের পরকীয়াত্ব ঘৃণিত হয় না,—পরন্তু পূজিতই হইয়া থাকে। পরকীয়ভাবে রসের উল্লাস হেতু ভগবৎসংসারে ব্রজদেবীগণের প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃ ব্রজদেবীগণের প্রেম সীমান্তপ্রাপ্ত—উচ্চতম অবস্থায় অবস্থিত। মধুরা রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিপাকে প্রেম, স্নেহ, মান, রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভাবের পরাকাষ্ঠাই মহাভাব। ঐ মহাভাব কেবল ব্রজদেবীনিষ্ঠ;—কেবল ব্রজদেবীগণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ প্রেমিক সাধক ভক্তগণের আকর্ষণ ও প্রেমিক সিদ্ধ ভক্তগণের মনোরথ পরিপূরণের নিমিত্তই সমস্ত

* শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।

লীলা করিয়া থাকেন এবং ঐ সকল লীলাও তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী বৃত্তির স্ফুরণমাত্র। অতএব এই রাসলীলা ভক্তজীবের আকর্ষণ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপানন্দ।

ভগবান্ বিশ্বময়—ভক্তাকর্ষণে ভক্তহৃদয়ে যে স্বরূপানন্দ হইয়াছিল, তাহা আবার তাঁহাতেই অর্পিত হইয়াছিল—এই স্বরূপানন্দ শক্তির ক্রীড়া জগতে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল।

শিষ্য। জগতে কি প্রকারে স্বরূপানন্দ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।

গুরু। তুমি বোধ হয় জান, জগতের যে কোন শক্তি শক্তিমান্ হইতেই আসিয়া থাকে। এক এবং অদ্বিতীয় তিনি,—তাঁহারই শক্তি পৃথিবীতে আবির্ভূত। কিন্তু সেই শক্তি সাধনা দ্বারা—ভক্তের দ্বারা পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। জীবের অধঃস্রোত চলিয়া আসিতেছিল—তখন উর্দ্ধস্রোত চলিবে—সে কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এত দিন জীব যে অখণ্ডানন্দের অনুভব করিয়া আকুল হৃদয়ে ছুটাছুটি করিতেছিল, এখন সেই অখণ্ডানন্দ চাই। কিন্তু নাটাই হইতে সূতা টানিয়া না লইলে তাহা যেমন নাটাই প্রদান করে না, তদ্রূপ শক্তিমান্ হইতে শক্তি টানিয়া না হইলে তাহা পাওয়া যায় না। তাই মর্ত্ত্যজীবের শুষ্ক কণ্ঠে অখণ্ডানন্দ প্রদান করিবার জন্ত ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং হ্লাদশক্তি টানিয়া লইবার জন্ত নিত্যমুক্ত স্বজনগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন—তাহারা হ্লাদশক্তি টানিয়া লইয়া, তদ্গতপ্রাণ হইয়া আবার তাঁহাতেই অর্পণ করিত—তাহাদের নিজের সুখ—নিজের আনন্দ বলিয়া জ্ঞান ছিল না। সে আনন্দ—সে সুখ তাহারা ভগবানে অর্পণ করিত,—ভগবান্ বিশ্বরূপ; বিশ্বে তাহা বিকীর্ণ হইয়া পড়িত। সেই শারদ-পূর্ণিমা রাত্রে—সেই প্রফুল্লমল্লিকা-গন্ধামোদিত দিঙ্মুখে যে আনন্দ-

ধারা ছুটিয়াছিল, এখনও তাহা মর্ত্ত্য জগতের প্রাণে প্রাণে লাগিয়া আছে। সে আনন্দ পাইবার জন্য ইচ্ছা করিলে সেই যুগলের রাস করিতে হয়.—তাহা হইলে হৃদয় অখণ্ড আনন্দে পূর্ণ হয়, মানবজন্ম সার্থক হয়,—আর জগতেও সেই আনন্দধারা প্রবাহিত করিতে পারা যায়। কেমন করিয়া পারা যায়, সে কথা বলিবার ইহা স্থান নহে,—তাহা সাধনা-সাপেক্ষ। এস্থলে আমি সাধনার কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। কেননা, আগে বিষয় বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ কিছুই নাই। কিন্তু শ্লোকাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, রাসলীলায় গোপীগণের ও শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ আছে। অতএব রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে,—এবং ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহাতে কামবিজয় হয়। যাহাতে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ নাই, তাহা আমাদের জ্ঞান-গোচরও নহে। ইন্দ্রিয়গম্য বিষয় না হইলে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ না হইয়া যদি কামবিজয় হইতে পারিত, তাহা হইলে ভগবান্‌কে মানুষীদেহ আশ্রয় করিয়া অবতার গ্রহণ করিতে হইত না। তিনি যখন অপ্রকট, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ;—তাইতে ত ভগবানের মানবদেহ ধারণ,—তাইতে ত অপ্রকটের প্রকটভাব। নতুবা দুই একটা কংস-শিশুপাল বধ, যুধিষ্ঠিরাদি দুই একজন ভক্তের পোষণ, আর আদর্শ চরিত্র বিকাশ করিয়া কাজ করিতে তাঁহার অবতীর্ণ হইতে হইত না। যাঁহার ইচ্ছায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে—তাঁহার মানবদেহ ধারণের কি প্রয়োজন ছিল? মানুষের ইন্দ্রিয়গোচরে তাঁহার হ্লাদশক্তি প্রেরণ, স্থাপন ও পরিপোষণ করাই তাঁহার অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে কি প্রকারে কামজয় হয় ?

গুরু। যাহাতে ও যাহাদ্বারা রত্যাদি আস্বাদিত হয়, তাহার নাম বিভাব। বিভাব উদ্দীপন ও আলম্বন ভেদে দ্বিবিধ। ভগবান্ আশ্রয়ালম্বন ও ভক্তগণ বিষয়ালম্বন। দেশ, কাল ও গুণাদিকেই উদ্দীপন বলা যায়। ফলতঃ যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসের উদ্গম হয়, তাহাই আলম্বন এবং যাহারা সেই আলম্বনকে স্মরণ করাইয়া ভাবের উদ্দীপন করে, তাহাদিগেরই নাম উদ্দীপন।

রাসপ্রসঙ্গে শারদীয়া রজনী, প্রফুল্ল মল্লিকা, শীতল সমীরণ, পূর্ণচন্দ্রের মধুর কিরণমালা প্রভৃতি উদ্দীপন। এই উদ্দীপনে গোপীহৃদয় কি যেন কি চায়—বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল। তোমার আমারও উঠে—কিন্তু তাহা কাম। তখন গোপীহৃদয়েও কাম। কিন্তু সেই শোভা-সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণু বাজিয়া উঠিল। সে বাঁশীতে গীত হইল,—"কামং বামদৃশাং মনোহরং।"—"ক্লীং" এই কামবীজ।

উদ্দীপনায় কামবীজ উপ্ত হইল। তোমারও হয়, আমারও হয়, কামে আত্মহারা করে,—কাম শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় সন্তান। আনন্দে প্রাণ পুলকিত হয়। হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে যে কাম ভস্মীভূত হইয়াছিল,—সে পরিশোধিত ও জড়ত্ববর্জ্জিত হইয়া মানবে আশ্রয় করিয়াছে—তাহাতে তিনি জড়ভাব নাই, চৈতন্যভাব মিশিয়াছে। কিন্তু কামে পূতিগন্ধ আছে—কাম এইবার রাস হইবে। মায়ার জগৎ হইতে কামকে সরাইতে পারিলে কামই রাস। তাই শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া কামবর্দ্ধন করিলেন। যোগমায়া বিষ্ণুশক্তি। ভক্তগণ বলেন ;—

যোগস্য সংযোগস্য মায়ঃ মানং পর্য্যাপ্তিঃ যস্যাং সা যোগমায়া শ্রীরাধিকা। অথবা যোগস্য সংযোগস্য মা

লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ যোগমা, তাং যাতি প্রাপ্নোতি যা সা যোগমায়া শ্রীরাধিকা,—তাং মনসা উপাশ্রিতঃ।

যাঁহাতে সংসারের পর্য্যাপ্তি বা যিনি সংযোগ-সম্পত্তিশালিনী, সেই শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিয়া জীবের কামজ্বালা বিদূরিত করিতে মানস করিলেন।

ইহার ভাব এই যে, জীবের হৃদয়ের যে উদ্দীপন প্রভাবে কাম উদ্ভূত হয়, তাহাতে আত্মপ্রসাদ বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা হয়, আর ভগবানের সংযোগে প্রভাবময়ী রাধাশক্তি উপাশ্রিত হইলে জীবেও শ্রীকৃষ্ণের মিলনেচ্ছা উপস্থিত হয়। কাম উদ্ভূত হইলে জীবের প্রাণ কিছু চায়—মায়াশ্রিত হইলে জীবে জীবে মিলনবাসনা হয়—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা জন্মে। আর যোগমায়াশ্রয় হইলে ভগবান্‌কে প্রাণ চায়;—তখন কাম হেয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। তাই—"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" তাই রাসে কামবিজয় হয়—ভগবৎপ্রেম জাগিয়া পড়ে

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বংশীগীত।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন শুনিয়া গোপীগণ কি করিয়াছিলেন?

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুন্তলাঃ॥

অনঙ্গবর্দ্ধন সেই গান শুনিয়া ব্রজরমণীগণের হৃদয় একান্ত কৃষ্ণাসক্ত হইয়া পড়িল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের উদ্যম লক্ষ্য না করিয়াই, যেখানে কান্ত, সেই স্থানে আগমন করিলেন।

শিষ্য। যদি তাহাদিগের অনঙ্গবর্দ্ধন হইল, তবে তাহারা স্বামী বা অন্য প্রিয় ব্যক্তির নিকটে ধাবিতা না হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করিল কেন?

গুরু। ভুলিয়া যাইতেছ, এইমাত্র সে কথা তোমাকে বলিয়াছি। তাহার মধ্যে যোগমায়া বা শ্রীরাধিকা উপাশ্রিত ছিলেন। তিনি হ্লাদিনী,—তিনি অখণ্ডানন্দ প্রদান জন্য কামীকে প্রেমী করিয়া ভগবানের দিকে আনয়ন করেন। তাই সে গীতে—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরং,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মায়য়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্।
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

"জলদসমূহ স্তম্ভিত করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে পুনঃপুনঃ বিস্ময়ান্বিত করিয়া, সনন্দাদি ঋষিগণকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, প্রজাপতিকে বিস্মিত করিয়া, পাতালস্থ বলিকে ঔৎসুক্যাদি দ্বারা আকুলিত করিয়া, নাগরাজ অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের মূল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশী-রব সমন্তাৎ বিস্তারিত হইল।"

সে রব ভক্ত শুনিল,—অভক্ত পাপী-তাপী শুনিতে পাইল না। এখনও নিত্য ভক্তের কাণের কাছে সেই 'ক্লীং' বীজ ধ্বনিত হইতেছে। এখনও ভক্তজন রাসমণ্ডল সমীপে নিত্য ধাবিত হইতেছে,—এখনও ভক্তের অনঙ্গবর্দ্ধন ও অনঙ্গবিজয় হইতেছে।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং,
স্বরিত-বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাং,
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥

"হে বীর! তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধক, শোকনাশক এবং শব্দায়মান বেণুতে সুন্দররূপে চুম্বিত,—উহাতে মানবগণের অন্য সমুদয় সুখেচ্ছা বিস্মরণ হয়, অতএব আমাদিগকে তাহা দান কর।"

বাঁশীর স্বরে জীবের অন্যরস বিস্মরণ করায়। লজ্জা ধৈর্য্য কুলমান ভুলাইয়া দেয়। জীব অন্য রসে গভীর নিমগ্ন,—বেণুর মধুর রবে সেই পার্থিব তুচ্ছরস ভুলিতে পারা যায়। যে শুনিয়াছে, সেই মজিয়াছে, তাহারই সমস্ত ইন্দ্রিয়,—সমস্ত প্রাণ,—কেবল ঐ একভাবে, এক চিন্তায় নিমগ্ন। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত বৃত্তি একমুখী,—একগতি।

কামের পথেই আত্মবিস্মৃতিময় প্রেম জন্মে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ,—কামের পথেই হয়। তুমি আমি মনে করিলাম, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিব,—কিন্তু সে কি সহজ কথা? তুমি আমি মনে করিলাম, কৃষ্ণাদর্শে কাজ করিব, তা কি হয়? গৃহত্যাগ করিলেই কি ত্যাগী হইতে পারে? তা হয় না। সংসারে থাকিয়া সংসার ভুলিতে হইবে। জগতের মধ্যে থাকিয়া জগতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে এবং জগতের ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ভগবানের সেবার জন্য,—ভগবানের প্রীতির জন্য নিজের সমুদায় সুখ, সমুদায় আনন্দ, এমন কি, নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে হইবে। এমন কেহ থাকিতে পারেন, যিনি জীব, ঈশ্বর ও জগৎ-প্রবাহ এই তিনকেই মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে

পারেন ;– কিন্তু তাহার সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি কম। হয়ত তিনি জীব নহেন,—হয়ত তিনি মায়িক জগতের অনেক উপরে। তাঁহাদের কথায় আমাদের কোন কাজ নাই। আমাদের রাস-অভিসার,—আমরা যদি রাস-অভিসারে যাইতে পারি,—আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হয়,—হ্লাদ শক্তিতে জীবন অমৃতার্ণবে ভাসিয়া ফিরে।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গাঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

"মদীয় গুণ শ্রবণ মাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্র-গামী গঙ্গাজলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন, অহৈতুকী, অব্যবহিতা মনোগতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগ।"

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ভগবান্ বলেন,—"আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না।"

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

"ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে অভিহিত। ইহাদ্বারা জীব ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম পূর্ব্বক মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।"

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

"মৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল গুণ ও দোষবিধায়ক ধর্ম্মসকল জানিয়াও যিনি কেবলমাত্র ভক্তির দৃঢ়তা নিবন্ধন সে সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।"

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

"আমার স্বরূপ জানিয়া বা না জানিয়া যাঁহারা একান্তভাবে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা ভক্ততম।"

ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন কি না, তাহা অনালোচ্য। কিন্তু তাঁহার জন্য তাহারা উন্মাদ হইয়াছিল,—কিসে তাঁহাকে পাইবে, কিরূপে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সুখী হইবে, এই চিন্তায় দিন কাটাইতেছিল। সহসা শ্যামের বাঁশীতে তন্ত্রময় কামবীজ বাজিয়া উঠিল। গোপীরা আকুল হইয়া পড়িল। কেহ কেহ গাভীদোহন করিতেছিল, তাহাদের আর দোহন করা হইল না। কেহ কেহ উননে দুগ্ধ জ্বাল দিতেছিল, তাহাদের উননের দুগ্ধ উননেই থাকিল। কেহ অন্নপাক করিতেছিল, অন্ন সুসিদ্ধ দেখিয়াও তাহা নামাইল না,—গৃহকর্ম্ম গোপীদের কৃষ্ণদর্শনের প্রত্যবায় হইল না, তাহারা সব ছাড়িয়া, সব পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত বিশ্ব ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ছুটিল। পতি, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব নিষেধ করিল, কিন্তু নিষেধ শুনিবে কে? জীব-হৃদয়ে অপ্রাকৃত নবীন কামবীজ জাগিয়া উঠিয়াছে, কে তাহাদিগের গতিরোধ করে? যাহাদের মন শ্রীকৃষ্ণময়, তাহাদিগের ইহকালের বন্ধন কোথায়? তাহারা চলিয়া গেল।

দুই একজন যাহারা রহিয়া গেল, তাহারাও রুদ্ধ গৃহ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান করিতে লাগিল। তাহাদের কর্ম্মবীজের অঙ্কুর ছিল,—সকলে সমান ফল প্রাপ্ত হয় না।

যাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বনমধ্যে ধাবিতা হইল, তাহারা তখন কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী,—কৃষ্ণময়ী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে গোপীদিগের সাক্ষাৎ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা-দিগকে কিরূপে গ্রহণ করিলেন?

গুরু। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমনকারণম্‌॥

"হে মহাভাগাগণ, তোমাদের শুভাগমন হউক। আমি তোমাদের কি প্রিয় সাধন করিব, তাহা বল। ব্রজে কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ত? তোমরা এরূপ ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছ কেন?

গোপীগণ লজ্জায় মন্দ হাসি হাসিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোর-সত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥

এই রজনী ঘোররূপা। হিংস্র জন্তুগণ এই বনে বাস করিতেছে।

তোমরা এখানে কেন? ব্রজে ফিরিয়া যাও। হে সুমধ্যমাগণ! রমণীগণের থাকিবার স্থান এ নহে।

গোপীগণ নিরুত্তর। শ্রীকৃষ্ণ পুনরপি বলিলেন :—

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥

"মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতি তোমাদিগকে না দেখিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছে। তাহাদিগের মনে কষ্ট দিও না।"

এই স্থলে ভগবান্ তাহাদিগকে ইহসংসারের আত্মীয়গণের কথা মনে করাইয়া দিলেন,—তাহাদিগের আত্মাবস্থা ও ভবিষ্যতে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পীড়ন-সম্ভাবনার কথা মনে করাইয়া দিলেন। তাহারা মায়ার জগতে কি না, পরীক্ষা করিলেন। গোপীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। এই পরীক্ষায় ঋষিপত্নীগণ গৃহে ফিরিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ নড়িল না— ইহ সংসারের কথায় তাহারা মুগ্ধ হইল না। তখনও তাহাদের প্রাণে সেই কৃষ্ণ-প্রেমের ডগমগি।

সেই রজনীর শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম জাগিয়াছিল,তাহা পার্থিব কি অপার্থিব, তাহাই পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুনরপি বলিতে লাগিলেন ;—

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশ-কর-রঞ্জিতম্।
যমুনানিল-লীলৈজত্তরু-পল্লব-শোভিতম্॥

যদি বনদর্শনের জন্য আসিয়া থাক, তাহা হইলে রাকাশশিকর-রঞ্জিত যমুনাস্পর্শি মৃদুমারুতের মন্দগতি দ্বারা ঈষৎ কম্পিত তরুপল্লব দেখিলে ত?

তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥

"এখন অচিরে গৃহে যাও। সাধ্বীগণ, গৃহে গিয়া পতির শুশ্রূষা কর। বালকগণ ক্রন্দন করিতেছে, তাহাদিগকে আনিয়া স্তন দাও। দোহনাভাবে গোবৎসগণ হাম্বারব করিতেছে। গৃহে গিয়া গো দোহন কর।"

গোপীগণ অশ্রুমুখী হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা একপদও অগ্রসর হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বেদের ধর্ম্ম—সামাজিক ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। কেন না, জন্মজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্ম কৃষ্ণপ্রেমে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে কিনা, পরীক্ষার আবশ্যক। যদি কর্ম্মবীজ বা গুণ সঞ্চিত থাকে, তবে অভেদের রাজত্বে প্রবেশ সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বস্ব লইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইতে পারিলে, তবেই তিনি গ্রহণ করিবেন। ভগবান্ বলিলেন :—

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগত্যা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ ॥

অথবা যদি আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে এবং সেই স্নেহে বশীকৃতচিত্ত হইয়া তোমরা এখানে আসিয়া থাক, সে তোমাদের উপযুক্ত বটে। কারণ আমি সকলের আত্মা। আত্মা সকল জীবের প্রিয়,—এবং আমি সেইজন্য সকলের প্রিয়।

তারপরে বেদের ধর্ম্ম—বেদের কর্ম্ম তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন :—

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গুকৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥

"কল্যাণীগণ, অকাপট্যে পতির এবং তদীয় বন্ধুবর্গের শুশ্রূষা ও পুত্র-কন্যাদিগের লালন-পালনই স্ত্রীলোকদিগের পরম ধর্ম্ম। যে সকল রমণী পতিলোক অভিলাষ করে, তাহাদিগের কর্ত্তব্য, অপাতকী পতি দুঃশীল, অথবা দুর্ভগ কিম্বা বৃদ্ধ অথবা জড় কিম্বা রোগী অথবা নির্ধন যে কোন অবস্থাপন্ন হউক, কদাপি পরিত্যাগ না করা। কুলাঙ্গনাদিগের উপপতি সংক্রান্ত সুখ, স্বর্গের অহিতকর, অযশের জনক, এবং অতি তুচ্ছ। দুঃখ-সম্পাদক ও ভয়াবহ ; অতএব ঔপপত্য সর্ব্বতোভাবে গর্হিত।"

এ উপদেশেও গোপীগণ নিরস্ত হইল না। তাহারা ভেদের কথা শুনিল না,—বেদের বিধি মানিল না। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন :—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

"শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান এবং কীর্ত্তনে যেমন সহজে আমার প্রতি ভাবোদয় হয়, আমার সন্নিকর্ষে তেমন হয় না, অতএব আবার বলি, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ঋষিপত্নীদিগকে বলিয়াছিলেন। গোপীদিগকেও সে কথা বলিলেন ;—

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥

একথা শুনিয়া ঋষিপত্নীরা গৃহে ফিরিয়াছিলেন, গোপীরা ফিরিল না। তাহারা সেই পুরাতন ধর্ম্মের দিকে চাহিল না—যে অনুরাগাত্মক ধর্ম্ম মর্ত্ত্যভূমে প্রচার করিতে ভগবান্ আবির্ভূত, তাহারা সেই ধর্ম্মে মজিয়া জগৎকে সেই ধর্ম্মে মজাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এতক্ষণে তাহারা কথা কহিল। অশ্রুমুখী গোপীরা ঈষৎ কম্পিত অধরে—ঈষৎ অভিমানের স্বরে বলিল :—

মৈবং বিভোঽহর্তি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং,
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্,
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥

"প্রভো! এ প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলা আপনার উচিত হয় নাই। আমরা সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূল সেবা করিতেছি। যেমন আদিপুরুষ দেব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আপনি আমাদিগকে সেইরূপ সম্বন্ধে গ্রহণ করুন, ত্যাগ করিবেন না।"

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ!
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে,
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

"হে কৃষ্ণ! ধর্ম্মবেত্তা আপনি, পতি-পুত্র, বন্ধু-বান্ধবগণের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম,যাহা বলিলেন, তাহা আপনাতেই বর্ত্তমান হউক; কেননা, আপনিই এই উপদেশের আশ্রয়, এই ধর্ম্মের চরম গতি—যে হেতু, তুমি পতি-পুত্রাদির অধিষ্ঠান। তাহার কারণ, আপনি ঈশ্বর,—

ঈশ্বর ব্যতিরেকে পতি-পুত্রাদি কিছুই সম্ভবে না। দেব! আপনি যে ঈশ্বর, তাহার প্রমাণ এই, আপনি দেহধারীদিগের আত্মা এবং প্রিয়তর ও বন্ধু; অতএব আপনি সর্ব্বাশ্রয়।"

যোগের—সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ। গোপীগণ সে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ঋষি—কত সাধনায়, কত তপস্যায় ভগবানের স্বরূপশক্তিত্ব লাভ করিয়া ভগবানের স্বজন হইয়াছিল। ভগবান্ কৃষ্ণ পূর্ণেশ্বর, তাহা তাহারা জানিত। ভগবান্‌ও গোবর্দ্ধন ধারণের দিন প্রকট হইয়াছিলেন। কাজেই গোপীরা বলিল,—তুমি আত্মা—আত্মপ্রীতি কাহার নাই? আত্মপ্রীতির জন্যই পতিপুত্রের উপরতি। তুমি যখন আত্মা—তখন তোমায় ছাড়িয়া সে কষ্ট কল্পনায় পড়িতে যাইব কেন? এই জন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন :—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

তাই আত্মতত্ত্বজ্ঞ গোপীগণ, সর্ব্বজীবের আত্মা—বিশ্বচরাচরের আত্মা—ভূর্ভুবস্বের আত্মা—পরমাত্মরূপী আনন্দময় ভগবান্‌কে বলিল :—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।
সব সমাপিয়া, একমন হৈয়া, নিশ্চয় হইনু দাসী॥
ভাবিয়া দেখিনু, এ তিন ভুবনে, আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ, শুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু, ওদুটি কমল-পায়।

না ঠেল না ঠেল, অবলা অমলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখি, যদি নাহি দেখি, তরাসে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাসে কয়, পরম রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

এমনি প্রেম, এমনি আত্মবিসর্জ্জন, এমনি আত্মপ্রীতি, এমনি ভগবৎ-সঙ্গ বাসনাতেই জীব চিদ্‌ঘনানন্দ প্রাপ্ত হয়। যখন জীবের শ্রীকৃষ্ণে রতি হয়, তখন তাহার গৃহে যাইতে ইচ্ছা হইবে কেন? গোপীরা তাই বলিতেছেন :—

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু,
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥

"হে সুন্দর! আপনি আমাদিগকে গৃহে যাইতে বলিলেন,—কিন্তু তাহাতে আর আমাদিগের শক্তি নাই। কারণ, আমাদিগের যে চিত্ত এতাবৎকাল সুখে গৃহব্যাপারে রত ছিল. তাহা আপনি হরণ করিয়াছেন। যে দুই কর গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, তাহাও অপহৃত হইয়াছে। আর আমাদের পদদ্বয় আপনার পাদমূল হইতে একপদও চলিতেছে না। আমরা কি প্রকারে ব্রজে গমন করিব;—এবং গিয়াই বা কি করিব?"

যখন জীবের চিত্তে আনন্দসুন্দর ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়, যখন জীব জানিতে পারে, আত্মাই আনন্দময়, আত্মাই সর্ব্বত্র, তখন তাহার গৃহকর্ম্মে মন যাইবে কেন? সে পতি-পুত্র বা স্ত্রী-পুত্র চাহিবে কেন? সে গৃহে ফিরিতে চাহিবে না। ঈশ্বরানুসন্ধানে—ঈশ্বরের

সৌন্দর্য্য-সম্ভোগে—পরমাত্মার সহিত মিলনানন্দ লাভ করিবার জন্যই ধাবিত হইবে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুন্দর দেখিয়া অঙ্গ-সঙ্গ লাভ কামনা করে নাই। তাঁহার সুখের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল। তাহারা চায় তাঁহাকে-তাহাদের ভালবাসা কেবল ভগবান্‌কেই আশ্রয় করিবে। অন্য আশা—অন্য লালসা সেখানে ছিল না।

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া,
দত্তক্ষণং কচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ,
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়াম॥

গোপীরা বলিলেন—আমাদের কাম নাই, পতিসঙ্গে প্রয়োজন কি? তুমি ঈশ্বর, তোমার সহিত অঙ্গ-সঙ্গেও আমাদের অধিকার নাই। এ শরীর-মন এখন সব তোমার। আমরা কি চাহি শুনিবে?

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেহঙ্ঘ্রিমূলং,
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিত-নিরীক্ষণ-তীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥

"দুঃখনাশন! আমাদের একমাত্র বাসনা তোমার উপাসনা। আমাদের অন্য কোন বাসনা নাই। আমরা যোগীর ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি,—আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আর যদিও তোমার মধুর হাস্য ও নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদের মনে তীব্র কামের উদয় হইয়াছে, এবং সেই কামে আমরা বিদগ্ধ হইতেছি, তথাপি আমরা তোমার অঙ্গ-সঙ্গ চাহি না। আমাদের

এ কামের উদ্দেশ্য তোমার দাস্য। অতএব তোমার দাস্য আমাদিগকে দাও।"

আর কথা আছে কি? গোপীরা কৃষ্ণের নিকট—ভগবানের নিকট—পরমাত্মার নিকট দাস্য চাহিয়াছিলেন, সেবানন্দ চাহিয়াছিলেন।

এতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের পরীক্ষা শেষ করিলেন। তাহাদিগের আত্মবিসর্জ্জন বুঝিয়া লইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবৎসঙ্গ।

শিষ্য। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলুন।

গুরু। গোপীদিগের শরীর মন সব যখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইল,—তাহারা যখন শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র অবলম্বন বলিয়া স্থির করিল,—তাহাদের কাম যখন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হইল,—তখন সে কাম প্রেম হইল। প্রেমের ভগবান্ গোপীগণকে সঙ্গ প্রদান করিলেন। গোপীদের আত্মা কৃতার্থ হইল।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥

গোপীদিগের ঐ সজল কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া হাস্য করিলেন, এবং আত্মারাম হইয়া গোপীদিগের সহিত রমণ করিলেন।

যোগেশ্বরের ঈশ্বর, এই কথা বলায় বুঝিতে পারা গেল, এই

ব্যাপারে যোগের একটা অনন্যজ্ঞাত, অননুভূতপূর্ব্ব গুহ্য ব্যাপার আছে। আর আত্মারাম হইয়া রমণ করিলেন,—ইহার একটা অন্তভাব আছে।

শিষ্য। সেই গুহ্য ব্যাপার ও গোপ্যভাব আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। তাহা উপাসনা-অঙ্গ। উহা বলিবার এ স্থান নহে। সময় ও সুবিধা হইলে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে এই মাত্র বলিব যে, সেই যোগের অনন্যজ্ঞাত কারণে এবং আত্মারাম হইয়া ভগবানের গোপীরমণে জগতে এক অপূর্ব্ব আনন্দধারা প্রবাহিত হইল। জীবে যাহার অস্বাদ না পাইয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত হইল। যে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সে ধর্ম্মের আস্বাদ জীবকণ্ঠে প্রদান করা হইল।

শিষ্য। কিন্তু এ স্থলে কিছু বলিবার আছে।

গুরু। কি ?

শিষ্য। আপনিই বলিয়াছেন, সূক্ষ্মতমভাবে যাহা গোলোকলীলা, স্থূলভাবে তাহাই বৃন্দাবনলীলা। গোলোকে এ লীলা করিয়া কি ভগবান্ জীবে এ আনন্দ প্রদান করিতে পারিতেন না ?

গুরু। না।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। কেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জীব স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম। তাঁহার সে লীলানন্দ জীবে পঁহুছিবে কেমন করিয়া ? তাই মানুষ হইয়া মানুষের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এ ভ্রম গোপীদিগেরও হইয়াছিল।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি॥

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যভাবে আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আহা! আমরা কি ভাগ্যবতী! ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ নারী এরূপ মান প্রাপ্ত হইয়াছে।"

গোপীদের অন্য কোন সুখ বা আনন্দ ছিল না। কৃষ্ণানন্দেই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু এ অভিমানে তাহাদের বাধ পড়িল,—কৃষ্ণে তাহারা যে অহৈতুকী ভক্তিরূপ আনন্দ অর্পণ করিয়াছিল,—তাহা জগতের জীবে—কেবল জীবে কেন, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সর্ব্ব পদার্থে তাহার অনুস্যূতি হইল। এখন আমি বলিয়া গোপীদের এ ক্ষুদ্রভাব কেন? জীবে জীবে—ফলে ফলে, পত্রে কাণ্ডে, অনলে অনিলে, তাহাদের সে হ্লাদশক্তির স্ফূর্ত্তি পাইল না কেন? কেন তাহাদের ক্ষুদ্র অভিমান?

ব্রজগোপীগণ ভগবানের আনন্দময় নিজ লীলার সঙ্গিনী হইতেন বলিয়া তিনি তাহাদিগকে অঙ্গ-সঙ্গ দান করিয়াছিলেন। এই অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা তাহারা ভগবানের আনন্দময়ী প্রভৃতি হ্লাদিনী শক্তি হইয়া জগতে আনন্দ বিস্তার করিবে। কিন্তু সে প্রকৃতিতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ থাকিবে না। সে প্রকৃতি সর্ব্বগত—সর্ব্বভূতে বিরাজিত। সে প্রকৃতি জ্ঞানের আলোকদ্বারা জগতের অন্ধকার নাশ করিতেছে। সে প্রকৃতি মধুর হইতে মধুরতর হইয়া জগতে আনন্দধারা প্রবাহিত করিতেছে। ভগবান্ সেই প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলিত হইয়া আলোক ও আনন্দের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করিতেছেন। প্রতিমিলনে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। প্রতিমিলনে ত্রিজগৎ আলোকিত হইতেছে। প্রতিমিলনে আনন্দ-চিন্ময় রসে ত্রিজগৎকে অভিষিক্ত করিতেছে।

কিন্তু গোপীদিগের সে অভিমান—সে মিলনানন্দের অভিমান—সে জগতে মিলনানন্দ প্রত্যর্পণের অভিমান স্বরূপ নহে। আরও এক কথা আছে। গোপীগণ তাঁহার নিজগণ বা লীলাপ্রকৃতি।

আমি পূর্ব্বে তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, ভগবানের শক্তি ত্রিবিধ,—ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবশক্তি, মায়াশক্তি ও চিৎশক্তি বা পরা শক্তি। ইঁহারা আবার তটস্থা, বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি আবার তিন অংশে বিভক্তা। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। শ্রীভগবান্ যে শক্তিযোগে সমুদায় দেশ-কাল-পাত্রের সহিত সংযুক্ত, তাহাকে সন্ধিনী, যে শক্তিযোগে জগতের সমস্ত ব্যাপার পরিজ্ঞাত, তাহাকে সম্বিৎ এবং যে শক্তিযোগে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাকে হ্লাদিনী কহে। এই হ্লাদিনী শক্তিই গোপী। শ্রীরাধা সেই গোপিকাকুলের শ্রেষ্ঠা এবং মহাভাবরূপা ও চৈতন্যরূপিণী।

এখন জগতে চিদ্ঘনানন্দ অর্পণ করিতে কেবল হ্লাদিনীশক্তি প্রেরণায় কার্য্য হইবে না। ভাব ব্যতিরেকে তাহা সংঘটন হয় না। চৈতন্য-তত্ত্ব অর্পণ না হইলেও তাহার সংসিদ্ধি ঘটে না। তাই এই রাসমণ্ডলে —মানুষীদেহে মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সঙ্গ প্রয়োজন। ভগবান্ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যরূপিণীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। তিনি গোপীদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্॥

"ভগবান্ সহসা অন্তর্হিত হইলে যূথপতির অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার অদর্শনে অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হইল।"

তখন তাহারা চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। বনে বনে খুঁজিতে লাগিল। বনের লতা পাতা, বৃক্ষ বল্লরী, পশু পক্ষী যাহাকে দেখে, তাহাকেই কৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল

তাহারা তখন পৃথিবীচুম্বিত বৃক্ষশাখা দেখিয়া ভাবিল, এই শাখাগণ নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছে—তাই ইহারা ভূমিতে শিরোনমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছে। ফুলের সৌরভ পাইয়া ভাবিল, কৃষ্ণসঙ্গ লাভ না করিলে ইহার এ মধুর গন্ধ কোথা হইতে আসিল। নবীন পত্রদামে কোমলতা দেখিয়া, কৃষ্ণস্পর্শের কোমলতা ও শ্যামলতা অনুভব করিল। তখন তাহারা সর্ব্বত্রই কৃষ্ণসঙ্গের লক্ষণ সকল দর্শন করিতে লাগিল। বিশ্বনাথকে তাহারা বিশ্বময় দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা কৃষ্ণাত্মিতা হইয়া পড়িল। হংস হইতে সোঽহং হইল—প্রকৃতির তখন পুংভাব উৎপন্ন হইল। তাহারা তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিতে লাগিল।

কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণ করিতে প্রবৃত্তা হইল। অন্য গোপী কৃষ্ণবৎ আচরণ করত তাহার স্তনপান করিতে লাগিল। অপর গোপী আপনাকে বালকবৎ করিয়া রোদন করিতে করিতে শকটাসুরের ন্যায় আচরণকারিণী অন্য গোপীকে পদদ্বারা আহত করিল। একজন গোপী আপনাকে তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় করিয়া অন্য যে গোপী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অভিনয় করিতেছিল, তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। কোন গোপী গোদিগের শব্দে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল। অন্য দুই দুই গোপী আপনাদিগকে রাম ও কৃষ্ণের ন্যায় করিল। আর কতকগুলি গোপী গোপীদিগের ন্যায় কর্ম্ম করিতে লাগিল। একজন গোপী বৎসাসুরের ন্যায় আচরণকারিণী অন্য গোপীকে বধ করিতে লাগিল। অন্য গোপী বকাসুরবৎ আচরণকারিণী গোপীর প্রাণনাশে রত হইল। অপর যদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে গাভী সকলকে আহ্বান করিয়া বংশী বাজাইতেন, একজন গোপী তদ্রূপ করিতে লাগিল। অপর গোপী কোন গোপীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবৎ হইয়া বলিতে লাগিল—

গোপাগণ,আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমার ললিত গতি অবলোকন কর। তোমরা ঝড়-বৃষ্টিতে ভয় পাইও না—এই আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিলাম। এই কথা বলিয়া সে তাহার উত্তরীয় বসন বামহস্তে ধারণ করিল। অন্য একজন গোপী আর এক গোপীর উপরে আরোহণ করিয়া আপনার চরণ দ্বারা তদীয় মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—দুষ্ট কালিয়, এখান হইতে দূর হ। অন্য কোন গোপীরা অপর এক গোপীকে নবনী-চোর বলিয়া বন্ধন করিতে লাগিল।

কিন্তু এ সুখ—এ তন্ময়তা—এ প্রেমের অপ্রাকৃত আস্বাদন অধিকক্ষণ থাকিল না। তাহাদিগের আবার হংসভাব ফিরিয়া আসিল। আবার তাহারা পূর্ব্ববৎ বনে বনে বনমালীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এবার তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ভক্তের— অন্য ভাগ্যবতীর প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি করিতে গমন করিয়াছেন। তাহারা তখন কৃষ্ণভাবময়—সুতরাং তাঁহার প্রতিকার্য্য অনুভব করিতে লাগিল।

শিষ্য। তাহারা কি যথার্থই অনুমান করিয়াছিল? না, তাহাদিগের ঈর্ষাজনিত ভ্রম মাত্র।

গুরু। জীবের চিত্ত যখন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। সেখানে ঈর্ষা বা ভ্রম নাই—তাহাতে সত্য বিষয়ই প্রতিভাত হয়।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া অন্য কাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন?

গুরু। মহাভাবরূপিণী শ্রীমতী রাধার সহিত।

শিষ্য। বাস্তবিক একথা শাস্ত্রসঙ্গত, না মনগড়া? কেহ কেহ রাধাপ্রসঙ্গ অস্বীকার করেন। যথা,—"ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের

মধ্যে "রাধা" নাম কোথাও পাই না। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধানাম প্রবিষ্ট। তাঁহারা টিকা-টিপ্পনীর ভিতর পুনঃপুনঃ রাধা-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ষার প্রমাণস্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, কোন একজন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্ষাজনিত ভ্রম মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন, এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অন্তর্হিত হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই।" *

গুরু। দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, ঐ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি হয় মূল ভাগবত পাঠ করেন নাই, আর না হয়, ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। আমি তোমাকে ভাগবতের ঐ স্থানটি শোনাইতেছি। তাহা হইলে ঐ উক্তির সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে। পুনরায় বলি, শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপীসঙ্গ গোপীদিগের ঈর্ষা-জনিত ভ্রম নহে—তাহা কঠোর সত্য, ভক্তজনবিদিত এবং মধুর ধর্ম্ম সংস্থাপনের কারণ।

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত; ১০।৩১।২১

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই পরমাত্মার পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইয়া বলিল,—"মহাত্মা নন্দনন্দনের এই সকল পদ-চিহ্ন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই,—ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম ও যবাদি চিহ্ন দ্বারা তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।"

* বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র, ১৬৫ পৃঃ।

তাস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০।৩১।২২

"পরে সেই সকল গোপী কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখিয়া বর্ত্ম অন্বেষণ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পদের সহিত অন্য রমণীর পদচিহ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে, দেখিয়া তাহারা কাতর হইয়া বলিতে লাগিল,"—

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্-হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০।৩১। ৩—২৪

"এসকল পদচিহ্ন কাহার? হস্তিনী যেমন হস্তীর সহিত যায়, তেমনি সেই সুভগা নন্দসুতের সহিত গমন করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্কন্ধে আপনার প্রকোষ্ঠ বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই রমণী নিশ্চয় ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছিল। * তাহা না হইলে কি হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করেন?"

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥

* রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে—পূজার্থে, যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনি রাধা বা রাধিকা। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবুও ইহা রাধাশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্‌॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০।৩১।২৫—২৬

"হে সখীগণ, এই সকল গোবিন্দ-চরণ-রেণু অত্যন্ত পবিত্র। ব্রহ্মা, শিব, রমা দেবী, ইহাঁরাও আপন আপন অঘ নাশের জন্য এই রেণু মস্তকে ধারণ করেন। আমরাও ইহা মস্তকে ধারণ করি। তাহা হইলে কৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইব। সেই আরাধিকার পদচিহ্ন আমাদের মনঃক্ষোভ জন্মাইতেছে। গোপীদের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা—সে একা তাহা হরণ করিতেছে।"

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলে গোপীদের ঈর্ষাজনিত ভ্রম বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তারপরে অতি স্পষ্ট কথা শোন :—

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্‌ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্‌॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০।৩১।৩০

"ভগবান্‌ স্বয়ং পরিতৃপ্ত এবং স্বক্রীড় ও নারীবিভ্রমে অনাকৃষ্ট হইয়াও কামীদিগের দৈন্য এবং অবলাজনের দুরাত্মতা প্রদর্শন নিমিত্ত প্রেয়সীর সহিত কেলি করিয়াছিলেন।"

ইহা গোপীদিগের উক্তি নহে। স্বয়ং শুকদেবের কথা। সুতরাং নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, ইহা গোপীদিগের ঈর্ষাজনিত ভ্রম নহে। তারপরে আরও স্পষ্ট—

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে॥

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০।৩০।৩১

"গোপীগণ এইরূপে পরস্পরকে দেখাইতে দেখাইতে বিমনা হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে—অন্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীকে নির্জ্জন বনে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনিও কৃষ্ণসঙ্গ লাভে আপনাকে স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। তাঁহার মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণ সকল গেপীকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল, আমি অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। কিছুদূর গমন করিয়া সেই আরাধিকা গোপী বলিলেন,—"কৃষ্ণ, আর ত আমি বলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা, এখন আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল।"

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০।৩১।৩২

কামীদিগের দৈন্য প্রকাশ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীকে বলিলেন ;—"তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" কিন্তু সেই গোপী যেই শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন, অমনি কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। আর তিনি ভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অনুতাপ-সাগরে নিপতিত হইলেন এবং—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত; ১০।৩১।৩৩

"হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা রমণ! হে মহাবাহো! কোথায় রহিলে? সখে! আমি অতি দীনা, তোমার দাসী; আমাকে দেখাও, আমি তোমার নিকটে কিরূপে যাব।"

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষ-মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥
তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত; ১০।৩১।৩৪—৩৫

"যে সকল গোপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্ম অন্বেষণ করিতে করিতে গমন করিতেছিল, তাহারা ঐ কর্ম্ম করিতে করিতে অদূরে প্রিয়-বিচ্ছেদমোহিতা দুঃখিতা সখীকে দেখিতে পাইল। পরে তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গজনিত মানপ্রাপ্তি এবং দুরাত্মতা নিবন্ধন অবমান শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইল।"

তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া কৃষ্ণান্বেষণে বনমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া পড়িলেন, এবং

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০।৩।৩৭—৩৮

"তন্মনস্ক, তদালাপ, তদ্বিচেষ্ট ও তদাত্মিক গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের গৃহাদির কথা কেহই স্মরণ করিল না এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিল এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমনার্থে আকাঙ্ক্ষান্বিত হইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহারই গান করিতে লাগিল।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যুগল-তত্ত্ব।

শিষ্য। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে অবগত হইতে পারিলাম, শ্রীকৃষ্ণ গোপীসকলের নিকট হইতে অন্য কোন এক গোপীর নিকট গমন করিয়াছিলেন ;—তাহা গোপীসকলের ঈর্ষাজনিত ভ্রম নহে, নিশ্চয় সত্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাহার নিকটে গমন ও যাহার সহিত রমণ করিয়াছিলেন, সে গোপী যে রাধা, তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা গেল না—সে গোপীর নাম যে রাধা, ভাগবতে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

গুরু। কেবল সে গোপীর নাম কেন, কোন গোপীর নামই উল্লেখ নাই। ভগবানের নিজজন গোপী সকলেই, সুতরাং নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিষ্য। তবে সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া যে একজন

গোপীর নিকট ভগবান্ গমন করিয়াছিলেন, সে গোপী রাধা না হইয়া চন্দ্রাবলীও হইতে পারে?

গুরু। তা হইতে পারে না। কোন একটা কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার কার্য্য স্থির করিতে হয়। রাসের উদ্দেশ্য ভগবানের সংস্থাপিত ধর্ম্মের অমৃতধারা জীবকণ্ঠে প্রেরণ করা। রাধা সেই রাস-মণ্ডলের শক্তিকেন্দ্র। মধ্যমণির অভাবে মণির মালা শোভাচ্যুত হয়। রাধা-অভাবে কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না,—কাজেই রাধা-সন্নিধানে গমন করিলেন।

শিষ্য। এ কথা কি প্রকারে জানিতে পারা গেল?

গুরু। কোন্ কথা?

শিষ্য। রাধা-অভাবে কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কথা?

গুরু। তবে এতক্ষণ যত কথা বলিয়া বকিয়া মরিয়াছি, তুমি তাহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম কর নাই। যাহা হউক, সংক্ষেপে আর একবার বলিতেছি, শোন।—

যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম করিয়া মানুষের অদৃষ্ট নাশ হয় না,—নিত্য সুখলাভ ঘটে না। যাহার নাশ আছে, তাহা লাভে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না। যজ্ঞাদিতে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়,—অদৃষ্ট বশতঃ মানুষ স্বর্গাদি লাভ করে—আবার অদৃষ্টবশে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জীবের সুখের আকাঙ্ক্ষা যায় না—ধন হউক, ঐশ্বর্য্য হউক, পুত্রাদি হউক, অধিক কি, স্বর্গসুখ হউক, সকলেরই ক্ষয় আছে। হাসির ধারে কান্না, জীবনের ধারে মরণ, আলোর ধারে অন্ধকার—ইহা আছেই আছে। যাহার নাশ আছে, তাহাতে সুখ নাই—বিনাশই দুঃখ। আত্মা বা ঈশ্বর অবিনাশী। ঈশ্বরপ্রাপ্তিই অবিনশ্বর সুখ। ধর্ম্ম সুখ-প্রাপ্তির উপায়। ধর্ম্ম ঈশ্বরপ্রাপ্তির দ্বার। কিন্তু এতদিনে জগতে যে ধর্ম্ম

প্রচারিত ছিল, তাহাতে পূর্ণভাবে ঈশ্বরপ্রাপ্তির সম্ভানা ছিল না। কারণ, কাম প্রেমে পরিণত না হইলে ঈশ্বর পাওয়া যায় না। কাম্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য একবার মহাযোগী মহাদেব কর্ত্তৃক কাম ভস্ম হইয়াছিল,—কাম তখন অশরীরী তীব্রজ্বালা হইয়া জীবে জীবে ঘুরিত, মরণ বিস্তৃতি - উন্নতি। কামের উন্নতি হইল। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে কাম হইল—কিন্তু নবীন মদন কৃষ্ণাশ্রিত—কৃষ্ণসন্তান।

মানবের কাম হৃদয়ভরা। কাম ধ্বংস হয় না—নিবৃত্তি হয়। স্বর্গাদি লাভ কাম-সম্ভূত। রাধিকা জীবের অগ্রণী—জীবের আনন্দদায়িনী এবং পরমেশ্বরের পরাশক্তি।

> দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
> সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

দ্যোতনময়ী, কৃষ্ণময়ী রাধিকাই পরদেবতা। তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা।”

> বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং,
> গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
> মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো,
> জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥

রাধাপ্রেম বৃদ্ধির শেষ সীমায় উপস্থাপিত,—বৃদ্ধির আর স্থান নাই। তথাপি তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধনশীল। রাধা-প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গুরু,—তথাপি তাহা গৌরববর্জ্জিত। রাধাপ্রেম নিত্যনির্ম্মল—তথাপি সর্ব্বদা বাম্য ও বক্রব্যবহার।

শিষ্য। রাধাপ্রেম বৃদ্ধির সীমাহারা, তথাপি তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধনশীল কেন ?

গুরু। ভরা গাঙ্গে তুফান উঠে,—বৃদ্ধির শেষ সীমায় উপস্থিত রাধাপ্রেম প্রতিমুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইয়া যে কম্পন তোলে—সে কম্পন জীবে জীবে ছড়াইয়া পড়ে। রাধা-প্রেমে যে মহানন্দ উঠে—তাহা জগতের জীব উপভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। বাতাসের প্রতি নিশ্বাস জীবের কাণে কাণে ডাকিয়া বেড়ায়—"প্রেম নিবি কে আয়।"

হরিরেব ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥

"হে মধুরাক্ষি! যদি কৃষ্ণ ও রাধা মথুরায় (মথুরা প্রদেশে) অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে জীবসৃষ্টি বিশেষতঃ কামের সৃষ্টি বিফল হইত।"

জীবের যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি,—জীব লইয়া ভগবানের যে আনন্দ-লীলা প্রকট করিবার বন্দুতা, তাহা বিফল হইত। কাম ভিন্ন প্রেম হয় না—রাধা-প্রেমের বাদাম উঠিয়াছে বলিয়া কামের কাষ্ঠতরণী প্রেমের সোণায় পরিণত হয়। রাধাকৃষ্ণের রাসলীলায় যে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছিল। জগতের সবিশেষ প্রয়োজন লইয়া, ভক্তির নিগূঢ় কর্ম্ম লইয়া রাসমণ্ডলে রাধাকৃষ্ণের রমণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, রাধা প্রাণাধিষ্ঠাত্রী—সচ্চিদানন্দ ভগবানের মিলন রাধার সঙ্গে হইলে জীবের প্রাণে প্রাণে সে আনন্দের কম্পন উত্থিত হয়,—জীব কাম ছাড়িয়া প্রেমের দিকে প্রধাবিত হয়।

ঈশ্বরকে জ্ঞানের পথে জানিতে পারা যায়, কিন্তু সে যেন জানি জানি, জানি না। পাই পাই, পাই না। ধরি ধরি, ধরি না। আর

প্রেমে তন্ময় হইয়া পড়িতে হয়। জ্ঞানে ভগবান্ অনুমানসাপেক্ষ। প্রেমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতিতে তিনি মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া প্রত্যক্ষ হন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই প্রত্যক্ষ।

সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি, সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমস্ত আশা ভরসা যুড়িয়া যদি তিনি আবির্ভূত হন, তবে মানুষ তৎসদৃশ না হইবে কেন? কৃষ্ণ-প্রাপ্তির এমন সুন্দর ধর্ম্ম আর কোথায়?

কামে মানুষে মানুষে বাঁধিতে পারে। কাম যদি প্রেম হয়, তবে যুগলে যুগল ভজনা করিতে পারে। কামকে প্রেমে পরিণত করিতে হইলে, মিথুনধর্ম্মী নরনারীর হৃদয়ে উদ্দাম, আকুল আত্মহারা কামের সর্ব্বাঙ্গে রাধা-কৃষ্ণপ্রেমের স্পর্শমণি স্পর্শ করাইতে হয়। তাহা হইলে কাম-লৌহ প্রেমরূপ স্বর্ণে পরিণত হয়।

তাহার উপায় সাধনা—সে সাধনা যুগলের। যুগলরূপ যুগলের উপাসনা। কামবীজ কামগায়ত্রী তাহার মন্ত্র, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন তাহার দেবতা, প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধা তাহার ঋষি, সে সাধনায় মানুষ নিত্যানন্দ লাভ করে।—কামের জ্বালা ভুলিয়া গিয়া প্রেমের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

এ সকল কামসাধনতত্ত্ব; সুতরাং অতি গুহ্য। সময় হইলে তোমাকে শিক্ষা দিব। তবে ইঙ্গিতে তোমাকে একটু বলিতে পারি যে, কৈশোর কালের কথা স্মরণ কর,—বাসন্তী সন্ধ্যার মলয়ার সুমৃদু সুখস্পর্শ চন্দ্রের রজতকিরণ-মাখা বাতাবী ফুলের গন্ধামোদিত পৃথিবীতলে তোমার সেই একখানি মুখ—সেই হিয়া দুরু-দুরু আনত আনন, লাজভরা দুটি আঁখি মনে কর। মনে কর, তখন তোমার কি অবস্থা হইয়াছিল—স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভুলিয়াছিলে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, নীতি, অনীতি মান, অপমান, জাতিকুল, গৃহ, পিতা,মাতা, ভাই, বন্ধু, সব ভুলিয়াছিলে,—আপনাকেও

ভুলিয়াছিলে—কেবল সে আর তুমি ছিলে। সে কি আনন্দ, সে কি ভাব স্মরণ কর।

কিন্তু সে কাম। কাম তাই সঙ্গ-মিলনে—মুহূর্ত্তমধ্যে—আসঙ্গ-পতনে সব ফুরাইয়া যাইত! প্রাকৃতিক পদার্থ কবিত্ব হারাইত, প্রেমের দেবী ঘৃণ্যা মানবী হইত—তুমি তাহা হইতে পৃথক্ হইতে। কেন হইতে জান কি,—তাহাকে লইয়া আত্মতৃপ্তির জন্য ক্রীড়া করিতে বলিয়া অযতনে অভিমানে এক পদার্থ ঝরিয়া পড়িত—সে অনুচৈতন্য। তাহাকে হারাইয়া সব যাইত। আবার পাতালের জলের মত তাহা আসিয়া দাঁড়াইত—কিন্তু কামের তাড়নায় তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া সব হারাইতে।

যদি রাধা কৃষ্ণের রাসলীলা বুঝিতে পারিতে—যদি সেই নব-কিশোর-কিশোরীকে তোমার সেই কামের সিংহাসনে বসাইতে, তবে সেই কিশোরানন্দ স্থায়ী হইত,—স্থায়িভাবে তোমার দুঃখ বিদূরিত হইত। কৈশোর যায়, যৌবন আসে, যৌবন যায়, প্রৌঢ়তা আসে, প্রৌঢ়তা যায়, বার্দ্ধক্য আসে,—কিন্তু সে অনুভূতি যায় না। সদ্‌গুরু পাইলে যে কোন কালে সে সাধনা হয়—অনুভূতি থাকিলে ক্রিয়া না হইবে কেন?

কিন্তু সফলকাম না হইলে জীব আবার জন্মে—আবার সময় আসে, আবার যায়—এইরূপে গতাগতি। জন্ম জন্ম ঘুরিতে ঘুরিতে কোন এক শুভলগ্নে—কোন জন্মে সদ্‌গুরু লাভ হইলে তবে জীব রাধা-কৃষ্ণের উপাসনায় নিযুক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থতা লাভ করে। তবে ইহাতেও অধিকারি-ভেদ আছে—পর পর উন্নতি আছে। এখন যে কথা বলিতেছি, তাহাই বলিব; সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে—কোন কথা বলিব না। সময় ও সুবিধা পাইলে তাহা তোমাকে শিক্ষা দিব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

শিষ্য। অতঃপর গোপীগণ এবং ভগবান্ কৃষ্ণ কি করিলেন, তাহা বলুন।

গুরু। গোপীগণ মিলিত হইয়া যমুনাপুলিনে গমন করিয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিল। তাহারা তখন জীবন্মুক্ত—মরজগতে থাকিয়াও প্রকৃতির বন্ধনবিমুক্ত। তখন গোপীরা ব্যষ্টিভাবের অতীত হইয়াছিল,—জীবপ্রকৃতি গোপী অতীতের গর্ভে—তাহারা তখন বিকারশূন্য—ভাবগাম্ভীর্য্য স্থির নিশ্চল প্রেমের অতল সমুদ্রে অবস্থিত। প্রত্যেক গোপী মিশিয়া এক হইয়াছে—এক উদ্দেশ্য, এক মন, এক প্রাণ,—সে প্রাণ, সে মন, বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের প্রাণ ও মনের সহিত এক-তান। এক সঙ্গীত সমগ্র বিশ্ব হইতে উত্থিত। সে সঙ্গীত কামবীজাত্মক। গোপীদিগের সত্তা সমষ্টিসত্তা। গোপীগণ ঈশ্বরের প্রকৃতি। গোপীগীত প্রণয়ের লহরী।

> প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং,
> বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
> রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ,
> কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥

"হে প্রিয়! সেই মধুর হাসি—প্রেমের চাহনি, সেই মিলন বিহার, যাহার ধ্যান মাত্রেই মঙ্গল হয়—আর নির্জ্জনে তোমার যে সকল সঙ্কেত-

মর্ম্ম,—যাহা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্তল স্পর্শ করিয়া আছে। বল দেখি, কুহকময়! এ সকলে আমাদিগের ক্ষুভিত হইতে হয় কি না।"

আমরা কিছু চাহি না। ব্রহ্মত্বও তুচ্ছ করি—চাহি তোমাকে, তুমি যে আমাদিগকে মজাইয়া ফেলিয়াছ। আমাদের আর কোন বাসনা নাই—লালসা নাই। দিবানিশি কেবল তোমাকেই দেখিতে চাহি, চক্ষুর পলক আমাদের শত যুগ।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥

"যখন তুমি দিবাভাগে বনে বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে প্রাণীদিগের সম্বন্ধে ক্ষণার্দ্ধও একটি যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কুটিলকুন্তলশোভিত তোমার শ্রীমুখ-সন্দর্শনকারী ব্যক্তিদিগের নেত্রে যিনি পক্ষ্ম রচনা করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড়।"

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥

"হে নাথ! হে কান্ত! যখন তুমি ব্রজ হইতে পশুচারণ করিতে করিতে বাহিরে যাও, তখন নলিন-সুন্দর তোমার পদ পাছে তৃণাঙ্কুর দ্বারা ব্যথিত হয়, এই ভাবিতে ভাবিতে আমাদের মন একান্ত অসুস্থ হয়।"

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥

"দিনক্ষয়ে নীলকুন্তলাবৃত ধূলায় ধূসর অলিমালাকুল পরাগচ্ছুরিত পদ্মতুল্য তোমার মুখখানি আমাদিগকে পুনঃপুনঃ দেখাইয়া আমাদের মনে কেবল রতি উৎপাদন করাও।"

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্॥

"হে বীর! সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন, নাদিত বেণু দ্বারা উত্তমরূপে চুম্বিত তোমার অধরামৃত একবার আমাদিগকে দাও। সে অধরামৃতের এমনি গুণ যে, মানুষ অন্য রাগ একেবারে ভুলিয়া যায়। বিষয়রাগ আর থাকে না। কেবল তোমাতেই অনুরাগ, রতি ও সুরতরূপ প্রেম বৃদ্ধি করায়।"

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে,
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং,
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্॥

"মনুষ্যরূপে তোমার যে অভিব্যক্তি, সে ব্রজবাসী মাত্রেরই দুঃখনাশের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য। তবে আমরা যে তোমাতে স্পৃহাময়—আমাদের হৃদ্রোগের ঔষধ তুমিই জান,—নাথ! সে ঔষধ দিতে কেন কুন্ঠিত?"

শিষ্য। দয়াল কৃষ্ণ তাঁহার স্বজনগণের এত অনুতাপেও কেন আসিলেন না? যাহাদিগকে লইয়া তিনি লীলা করিবেন—রাসের রস বিশ্বমঙ্গলে বিনিয়োগ করিবেন, সেই গোপীদিগকে কেন দুঃখ প্রদান করিতেছেন?

গুরু। ইহা দুঃখ নহে—আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণের এই অদর্শন গোপীদিগের প্রেম বর্দ্ধনের জন্য—আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য—আর বিশ্বের মঙ্গলের জন্য। কেন, তা বলিতেছি, শোন।

প্রেমের বৃদ্ধি হইলে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। যেমন ইক্ষুরস গুড়, খাঁড়, সার শর্করা, সিতা মিছরি ও শুদ্ধ মিছরি হয় এবং ইহা যেমন ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইয়া আস্বাদের বৃদ্ধি পায়, রতি প্রেমাদিও তদ্রূপ নির্ম্মলতা ও স্বাদবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই মহাভাব-উদ্দীপক প্রেম-সুধাপান যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনিই ইহার মধুরতা সম্যক্ উপলব্ধি করত কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। নতুবা বহির্ম্মুখের ভাগ্যে সূর্য্য-দর্শন-বিমুখ পেচকের সূর্য্যরশ্মি পরিজ্ঞানের ন্যায় উহা অজ্ঞাত থাকে।

বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে রসপুষ্টি হয় না। বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার;—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত। মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী বিরহের নাম পূর্ব্বরাগ। মিলনকালীন বিরহের নাম প্রেমবৈচিত্ত। মান ও প্রবাস মিলনের পরবর্ত্তী বিরহ। অদর্শনজনিত বিরহের নাম প্রবাস। আর একত্র বা পৃথক্ অবস্থিত এবং পরস্পর অনুরক্ত দম্পতির স্বাভীপ্সিত

আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদির নিরোধকারী যে বিরহভাব, তাহারই নাম মান। মান প্রেমের পরিপাকবিশেষ, প্রেমের স্বাভাবিক কৌটিল্য-বশতই কখন সামান্য কারণে, কখন বা বিনা কারণে মান উত্থিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সহেতুক মান সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর দ্বারা প্রশমিত হয়, নির্হেতুক মান আপনা আপনিই প্রশমিত হয়।

গোপীদের মান অহেতুক, কিন্তু মানে প্রেম বৃদ্ধি করে, তাই গোপীদের কামগন্ধশূন্য প্রাণেও মান হইয়াছিল,—সে মান ঈর্ষাজনিত নহে, আত্মতৃপ্তিজন্য— তাহাকে লইয়া কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন, এই জন্য।

যেখানে কাম নাই, সেখানে কৃষ্ণ অদর্শন কেন?—এ প্রশ্ন তুমি করিতে পার। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ স্বয়ংই গোপীদিগকে বলিয়া দিয়াছেন।

গোপীগণ যখন সর্ব্বপ্রকারে কৃষ্ণগতপ্রাণ হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর দূরে থাকিবেন কেন,—তিনি তাহাদিগকে দর্শন দান করিলেন,—কৃষ্ণহারা গোপীগণমধ্যে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। গোপী-গণের হৃদয়ে আনন্দের খরধারা প্রবাহিত হইল,—তাহারা কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং দর্শন স্পর্শন ধ্যান ধারণা ও সমাধি দ্বারা কৃষ্ণ-সঙ্গসুখ লাভ করিতে লাগিল। তৎপরে কাতরে—প্রেম-কুটিল-কণ্ঠে, করুণ-কম্পিত আবেগময় ভাষায় কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল,—

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ॥

"হে কৃষ্ণ, দেখিতে পাই, কেহ কেহ ভজনানন্তর ভজনা করে, অর্থাৎ যদি তাহাকে কেহ ভজনা করে, তবে সে তাহাকে ভজনা করে,—

আপনা হইতে করে না। আবার কেহ ভজনের অপেক্ষা করে না। অন্যে তাহার ভজনা করুক না করুক, সে অন্যের ভজনা করে। আবার এমন কেহ আছেন, তাঁহাকে তুমি ভজনা কর বা না কর, সে তোমাকে ভজনা করিবে না। ইহা হয় কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন :—

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥

"হে সখিগণ। যাঁহারা ভজনে পরস্পরের অপেক্ষা রাখেন, তাঁহাদের উদ্যম কেবলমাত্র স্বার্থের জন্য। বাস্তবিক তাঁহারা ভজনা করেন না, নিজের ভজনাই করেন। যেখানে কেবল উপকারের প্রত্যুপকার, সেখানে যথার্থ সৌহৃদ্য নাই, সুখ নাই, ধর্ম্ম নাই। সেখানে কেবল স্বার্থ।"

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥

"ভজনার অপেক্ষা না করিয়া যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারা করুণহৃদয়। পুত্রের ব্যবহার ভাল হউক, মন্দ হউক,—পিতা পুত্রকে স্নেহ করেন। এ ভজনে নিরপবাদ ধর্ম্ম আছে, সৌহার্দ্দও আছে।

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥

"আবার যাঁহারা অভজনকারীকে দূরে থাক্, ভজনকারীকেও ভজনা করেন না,—তাঁহারা আত্মারাম বা আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ অথবা গুরুদ্রোহী।"

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্,
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে,
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥

"আর সখিগণ! তোমরা যদি একথা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাক, তবে বলি শোন,—আমি এসকলের কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহি। আমি যে ভজনকারীকে ভজনা করি না,—(অর্থাৎ তোমাদের নিকটে অদর্শন হইয়াছিলাম), সে কেবল তোমাদের নিরন্তর ধ্যান-প্রবৃত্তির জন্য। যেমন ধনহীন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া সেই ধন হারাইলে, সেই ধনের চিন্তায় পূর্ণ হইয়া, আর তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা পর্য্যন্ত কোন জ্ঞান থাকে না,—সেইরূপ আমাকে পাইয়া হারাইলে ভক্তহৃদয় আমারই ধ্যানে পরিপূর্ণ হয়।"

সখিগণ, তোমাদের তাহা হইয়াছে, তাই আবার আসিয়াছি। ধ্যানে তোমরা কেবল হইয়াছ,—এখন রাসক্রীড়ার সময় হইয়াছে। বিশ্বের হিতের জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য, শত শত জন্মার্জ্জিত জৈবী অদৃষ্ট মুছিবার জন্য,—এস, আমরা রাসক্রীড়া আরম্ভ করি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাসক্রীড়া।

গুরু। গোপীগণের তন্ময়তা জন্মিল,—গোপীদিগের ইতররাগ সমস্ত বিদূরিত হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত রাস-ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

রাসোৎসবে সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥

মণ্ডলরূপে অবস্থিত দুই গোপীর মধ্যে একৈকরূপে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। ইহাতে প্রত্যেক গোপী মনে করিতে লাগিল,—"শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে রহিয়াছেন।" যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যোগের এই মহান্ প্রভাব দর্শনে দেবগণ আশ্চর্য্য হইলেন। পুলক-লোমাঞ্চভরে দেহ শিহরিয়া উঠিল। আকাশ দেববিমানে ছাইয়া পড়িল। যোগের প্রভাব, আর রাসের অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে ঔৎসুক্য হেতু অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সস্ত্রীক দেবগণ তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্॥

"অনন্তর দুন্দুভিসকল নাদিত হইতে লাগিল, পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং প্রধান গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণের অমল যশোগান করিতে লাগিল।"

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

"রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারকারিণী গোপীদিগের বলয়, পুর ও কিঙ্কিণীসমূহের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।"

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

"সুবর্ণ দ্বারা রচিত দুই দুইটি মণির মধ্যে এক একটি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ রাসমণ্ডলমধ্যে গোপীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্॥
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতিরমিশ্রিতা।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি॥
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥

"যাঁহাদিগের গীত দ্বারা এই বিশ্ব আবৃত হইয়াছে, নৃত্যপরায়ণা অনুরঞ্জিতকণ্ঠী রতিপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণসংস্পর্শে মুদিতা সেই সকল গোপী উচ্চৈঃ-স্বরে গান করিতে লাগিলেন। কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অমিশ্রিত স্বরসমূহ কেবল রাগময় করিয়া উন্নয়ন করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া 'সাধু সাধু' বলিয়া তাহার সম্মান করিলেন। অন্য কোন গোপী উক্ত স্বরসমূহের রাগময় উন্নয়নকে ধ্রুব (নিশ্চয়াত্মক) তালে সংযুক্ত করিয়া উন্নয়ন করিল। তখন তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বহু সম্মান দান করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ গান করিলেন, সেই গানের উপরে গোপীরা গান করিল। ভক্ত ও ভগবানের গানে জগৎ ভরিয়া পড়িল। আকাশে দেবতারা সে গানে শিহরিলেন, দেবীগণ মূর্চ্ছিত হইলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সেই ভক্ত ও ভগবানের মিলিত কণ্ঠের রাগাত্মক গান ধ্বনিত হইল,—স্থাবর-জঙ্গমের প্রাণে প্রেমের পুলকধারা প্রবাহিত হইল।

এই প্রেম পবিত্র—এই রাসলীলা ভক্তের জীবন স্বরূপ। এই রমণী-লীলায় জগতে মধুর ধর্ম্মের সংস্থাপন হইল।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না?

শিষ্য। অনেক কথা বুঝিতে আছে।

গুরু। এক একটি করিয়া বল।

শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্—তিনি ধর্ম্ম স্থাপন ও অধর্ম্মের বিনাশ জন্য অবতীর্ণ। পরস্ত্রী সম্ভোগ কেন করিলেন?

গুরু। ভাগবত শ্রবণকালে মহারাজা পরীক্ষিৎও এ সন্দেহ করিয়াছিলেন,—বুঝি মায়ার জগতের সমস্ত জীবই এ প্রশ্ন করিয়া থাকে—এ সন্দেহ সকলেরই হয়। কিন্তু সন্দেহের কিছুই নাই।

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥

"যদি নিয়ম্য নিরহঙ্কার জীবগণেরই পুণ্যপাপ সম্বন্ধ না থাকে, তবে তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবতারূপে অবস্থিত অখিল প্রাণীর নিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যে পাপপুণ্যসম্বন্ধ নাই, তাহা বলিতে হয় না।"

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা,
যোগপ্রভাববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥

"যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ সেবা দ্বারা নিবৃত্তবিষয়াভিলাষ এবং যোগপ্রভাবে নিবৃত্ত-সমস্তকর্ম্মবন্ধন মুনিগণও বদ্ধ না হইয়া মুক্তভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন,—ইচ্ছানুসারে স্বীকৃতদেহ সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কেন বন্ধন হইবে?"

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এব ক্রীড়নদেহভাক্॥

"যিনি গোপীদিগের এবং তৎপতিদিগের ও সমস্ত প্রাণীর অন্তরে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত, সেই সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ লীলার্থই দেহধারণ করিয়াছেন। অতএব গোপীদিগের বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সামান্য দৃষ্টিতেও কোন দোষেরই সম্ভাবনা দেখা যায় না।"

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ভক্তবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই মনুষ্যশরীর ধারণপূর্ব্বক বিবিধ লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ঐ সকল লীলাও আবার বহির্দৃষ্টিতে নিন্দনীয়রূপ প্রতিভাত হইলেও উহাদিগের শ্রবণে মুক্ত ও মুমুক্ষুর কথা দূরে থাক্, বহির্ম্মুখ বিষয়ী পর্য্যন্ত সকলকেই ভগবৎপরায়ণ করিয়া দেয়।"

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥

"যতগুলি গোপী, লীলাসহকারে তাবৎসংখ্যক প্রকাশমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও ঐ গোপীদিগের সহিত পৃথক্ পৃথক্ রমণ করিয়াছিলেন।"

এই লীলা ঈশ্বরের পূর্ণযোগলীলা। যোগেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে বহুধা স্বরূপ বিভক্ত করিয়া প্রতি গোপী-আত্মার সহিত লীলা করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি রমণেচ্ছায় রমণ করেন নাই—তিনি ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ের অতীত, তিনি আত্মারাম। যিনি আত্মারাম, তিনি নিজের

আত্মায় রমণ করেন। এদিকে গোপীদিগের আত্মা যখন জড়ের বাহিরে গেল—যখন তন্ময় হইল—যখন কৃষ্ণের স্বশক্তিতে পরিণত হইল, তখন তাহা ভগবানের নিজ আত্মা—সুতরাং আত্মারাম সে আত্মায় রমণ করিলেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার রমণ মধুর মিলন। তবে বলিতে পার, এ রমণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—কিন্তু মানুষ থাকিয়া ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে—প্রাণে প্রাণে—ভাবে ভাবে ঈশ্বরের সহিত মিলন, ইহাই এই মধুর ধর্ম্মের মহিমা। অন্য ধর্ম্মে ইহা হয় না। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বলি শোন।

দেহাদি আত্মা নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তথাপি দেহে আত্ম-জ্ঞান, আমি অমুক, আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি যে জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান,—উহাকে বিবর্ত্তজ্ঞান বলে। মায়া জ্ঞানের উৎপত্তিকারিণী সংসারবন্ধনকারিণী ; মায়া-মগ্ন জীবই ঐরূপ ভাবিয়া থাকে,—মায়োপ-হৃত জীবেরই ঐরূপ শরীরী জ্ঞান হয়। আর যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সংসারকে ও মায়াময়ী প্রকৃতিকে ব্রাহ্মবিবর্ত্ত মাত্র জানিয়া আত্মার যথার্থ তত্ত্ব লাভ করেন। গোপীগণ সব ভুলিয়া—পতিপুত্র, গৃহদ্বার সমস্ত ভুলিয়া কৃষ্ণচিন্তা করিত—তন্ময় হইয়া আত্মাকে কৃষ্ণরূপ জানিত।

কিন্তু জ্ঞানীর আত্মজ্ঞানে আর গোপীর আত্মজ্ঞানে কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জ্ঞানীর আত্মা বিবর্ত্তজ্ঞানে স্বরূপ লাভ করিলে দ্বৈতশূন্য হয়,—আর তাহার নিজ সত্তা একেবারে থাকে না। কিন্তু গোপীর আত্মার জীবন্মুক্ত অবস্থায় দেহাভিমান শূন্য হইয়াও কৃষ্ণের আত্মার সহিত স্বরূপতঃ অংশরূপে বা শক্তিরূপে আপনাকে পৃথক্ জ্ঞান করে, এবং ঐ ভাবে নিজ আত্মার সত্তাজ্ঞান বিদ্যমান থাকে।

গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ, শক্তিমান্ ও শক্তির মিলন—জল ও তরঙ্গের মিলন। সে মিলন মরীচিমালীর মরীচি-আকর্ষণ। সে আকর্ষণে

প্রগাঢ় চিদ্‌ঘনানন্দ বিদ্যমান। নিজ দুঃখ বর্জ্জিত হইয়া কেবল ও সুখলাভের জন্য এই গোপীভাবই একমাত্র অবলম্বন। মানুষ মানুষ থাকিয়া ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পর্কে এইরূপেই মিলিত হয়। মানুষের সহিত ঈশ্বরের প্রেমের পূর্ণবিকাশের এই পবিত্র পন্থা। মধুর লীলার ইহাই শারদীয় পূর্ণিমা,—এই শশিশোভনা, গতঘনা রাকা ভক্তজীবনের পূর্ণাদর্শ।

এ তত্ত্বকথা—এ প্রেমের প্রবল বন্যা বলিতে পারি না বলিয়া আমরা দোষী—গোপীগণ বা শ্রীকৃষ্ণ নহেন। যদি এ তত্ত্ব বুঝিতে চাও, তবে শ্রীগুরুসমীপে কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উপাসনা-পদ্ধতি শিক্ষা কর। মিথুন ধর্ম্মের বিবর্ত্তবিলাসের দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া রাসমণ্ডল-মধ্যস্থ নব কিশোর-কিশোরীর মধুর প্রেমের মধুরাস্বাদ গ্রহণ কর। মানব-জীবন সার্থক হইবে। মর্ত্ত্যভূমির গতাগতি বিদূরিত হইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-কথা।

গুরু। এখন আমরা কৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারি,—এখন আমরা রাধাকৃষ্ণ বলিতে পারি। রাধা হিন্দুর মহাপুরাণে আছেন, হিন্দুর তন্ত্রে আছেন, মন্ত্রে আছেন ;—আর ভক্তের প্রাণে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া আছেন। আর আছেন, বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে শ্যামসুন্দরের বামভাগে। কৃষ্ণ যখন রাধা-রঞ্জিত, তখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। রাধাশূন্য কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাত্র। বঙ্কিম বাবু বোধ হয় সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র না বলিয়া কৃষ্ণচরিত্র বলিয়াছেন।

আমি তোমাকে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বলিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এতক্ষণে তাহা বলা সমাপ্ত হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-লীলা ও দ্বারকা-লীলা ;—বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় মধুর ভগবান্। দ্বারকা লীলায় তিনি সর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বর। আর মথুরা-লীলায় তিনি এই উভয় ভাবের মধ্যবর্ত্তী।

প্রেমের লীলায় রাধা সঙ্গিনী—এই প্রেমের ধর্ম্ম সংস্থাপনই ভগবানের পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইবার মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু ভারহরণ ও অভিমানাদি হরণ না করিলে সেই ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন হয় না ; তাই মথুরাদি লীলায় সে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সে কার্য্য কি, তাহা অতি বিস্তৃত কাহিনী—এক সঙ্গে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে সময়ে তদালোচনা করা যাইবে।

রাধাপ্রসঙ্গ বর্ত্তমানে এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ভগবানের মর্ত্ত্যভূমিতে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াতেই রাধাদ্যুতি বিরাজিত। তবে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের সমালোচনা না করিলে, ভক্তহৃদয়ের চিন্তা লইয়া সে সকল কার্য্যের আলোচনা না করিলে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে এস্থলে আমরা রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের অন্য লীলার আলোচনা করিতে বসি নাই। শ্রীকৃষ্ণের সে সকল লীলাতেও যে, এই মধুর ধর্ম্মের সংস্থাপনা উদ্দেশ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে মথুরাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সকাম জগতের ঈশ্বর। জীবসকল কামনা লইয়া—আপনা লইয়া,—ভেদ লইয়া ব্যস্ত। কেহ ধন চায়, কেহ ঐশ্বর্য্য চায়, কেহ পুত্র চায়, কেহ পতি চায়,—ভগবান্ ভক্তের কল্পতরু—যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। কিন্তু অসুরদিগের বিনাশ, সাধুদিগের পরিত্রাণ আর এই প্রেম-ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়াছেন।

আর আমরা অধিক দূর অগ্রসর হইব না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রকট করিতে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত। রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন নিত্য হইতেছে। হৃদয় পবিত্র কর—হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া, ভেদের ভাবনা ভুলিয়া, হৃদয়-বৃন্দাবনে রসিক-শেখর রাস-রসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে রাধার সহিত নিত্য চিন্তা কর।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

সম্পূর্ণ।

দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

যোগতত্ত্ব-বারিধি।

ইহাতে যোগ সাধনার সরল উপায়, যোগ শিক্ষার সুগম নিয়ম, খুব সোজা কথায় লিখিত হইয়াছে। রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যোগের সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। বিষয় অনন্ত,—ব্যাপার বহুল। তবে নিম্নে আভাস মাত্র দেওয়া হইল।

তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা, জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব, অদৃষ্ট ও পুরুষকার, ধর্ম্ম ও তৎসাধনোপায়, নিত্যকর্ম্মবিধান, জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনা, প্রকৃত জ্ঞান-লাভ, জ্ঞান-যোগের সিদ্ধাবস্থা. ভক্তিযোগের সমুদয় অঙ্গ ও তৎসাধনা, যম, নিয়ম, কুণ্ডলিনী ও ষট্‌চক্র বিচার, ষট্‌চক্রভেদ, ব্রহ্ম-জ্যোতির্দর্শন, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, ত্রাটকযোগ, অষ্টৈশ্বর্য্য, বিভূতিলাভ, দৈহিক বলবৃদ্ধির উপায়, রোগ না হইবার ও বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্যের উপায়, কুম্ভকবলে জল, অগ্নি ও শূন্যমার্গে ভ্রমণের উপায়, অনাহারে দীর্ঘ দিন কাটানর উপায়, পর-শরীরে প্রবেশ, অন্যের চক্ষুর অদৃশ্য থাকার উপায়। তদ্ভিন্ন বহু আসন, মুদ্রা, ধৌতি, নেতি, বস্তি প্রভৃতি জগতে যোগসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার শুনিবার ও বুঝিবার আছে, তৎসমস্তই যোগতত্ত্ব-বারিধিতে লিখিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর যোগসম্বন্ধে যত গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল হইতে ইহাতে বহু বিষয় ও অনন্ত তত্ত্ব সংগ্রহ হইয়াছে। বিলাতীবৎ বাঁধাই, প্রকাণ্ড পুস্তক, সুলভ মূল্য ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল।০ চারি আনা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

পুস্তকাবলী।

পুস্তক			মূল্য
পুরোহিত-দর্পণ	...	...	২৲
দীক্ষা ও সাধনা	...	...	১॥০
ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা	...	...	১॥০
সাধনা	...	...	২৲
দেবতা ও আরাধনা	...	...	১॥০
জন্মান্তর-রহস্য	...	...	১॥০
সোণারকণ্ঠী	...	...	১॥০
লুকোচুরি	...	...	১॥০
জাহানারা	...	...	২৲
সোণার পারিজাত	...	...	১৲
ফুলওয়ালী উপন্যাস	...	...	১৲
কনকপ্রতিমা	...	...	১৲
কালীয়-দমন গীতাভিনয়	...	...	১৲
যোগরাণী উপন্যাস	...	...	১॥০
স্বপ্নসুন্দরী	...	...	১৲
সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন	...	...	৸৴
ভৈরবী	...	...	৸০
প্রেততত্ত্ব	...	...	॥০
প্রেততর্পণ	...	...	১॥০
মূলে ভুল	...	...	॥০
ভবানীর মঠ	...	...	১৲

এন. সি, দত্ত এণ্ড কোং।
৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা